সুচিত্রা ভট্টাচার্য

হলুদ গাঁদার বনে

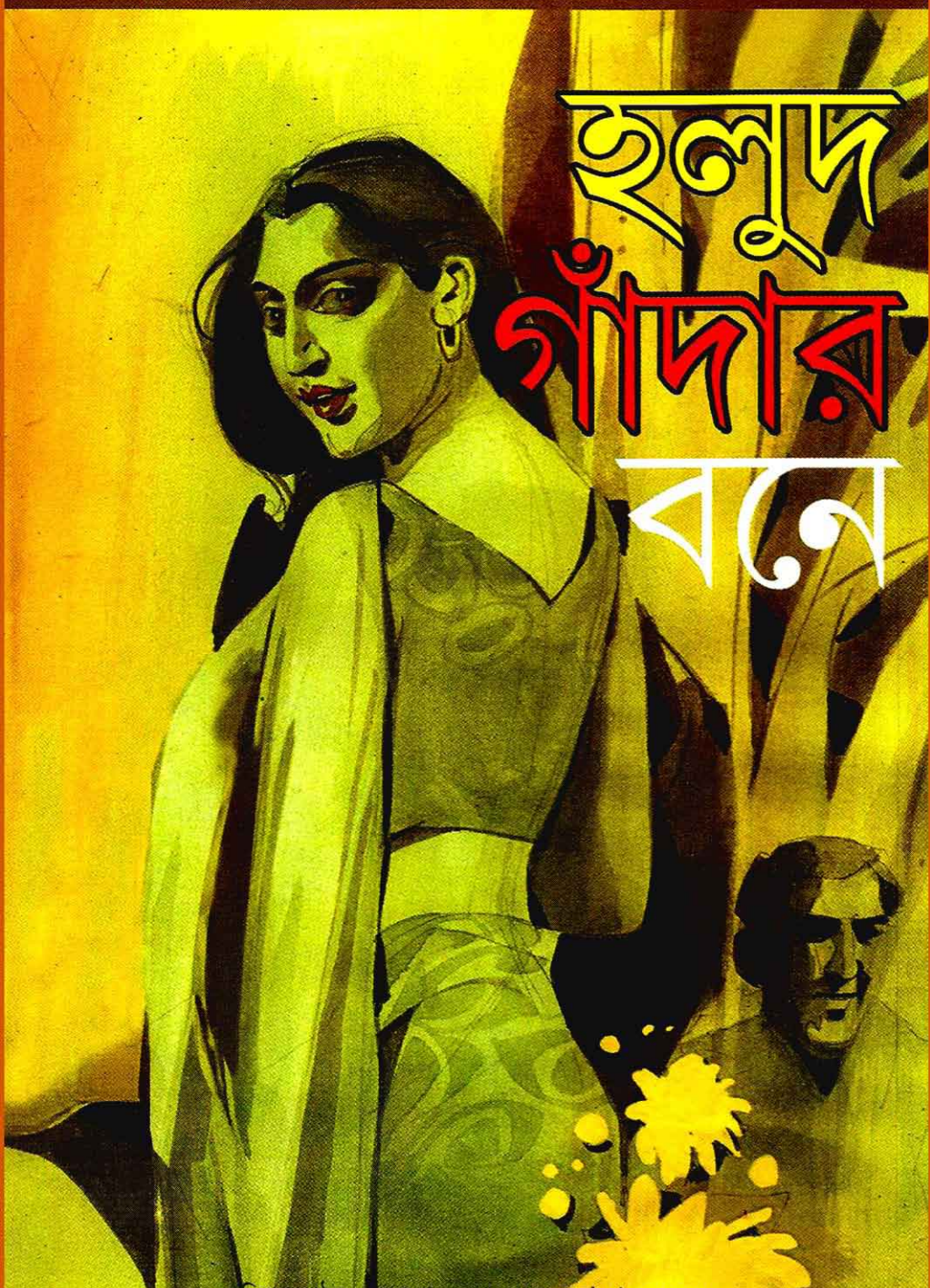

বাংলা সাহিত্যের জগতে বর্তমানে সুচিত্রা ভট্টাচার্য একটি অতি পরিচিত নাম। কিশোর সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি নানা দিকেই তাঁর লেখনীর স্ফূরণ ঘটেছে। কখনো পারিবারিক সাংসারিক জীবন, কখনো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, আবার কখনো বা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছনো কিশোর-কিশোরীর মানসিকতার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়।

তিনটি বড় গল্প—হলুদ গাঁদার বনে, অনিকেত এবং ভাঙা আয়না নিয়ে সংকলিত এই বই।

"মায়া কাটে না। মায়া বদলে যায়।" অথবা "ফুলের মৃত্যু"—এরকম সহজ অথচ সাবলীল প্রকাশভঙ্গি প্রথম গল্পটিকে অনায়াস দার্শনিকতায় ঋদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় গল্প 'অনিকেত'-এ বাড়ি বদলকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য, যা কিনা শেষ হয় এক অমোঘ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে। তৃতীয় গল্প 'ভাঙা আয়না'-য় সুচিত্রা ভট্টাচার্য সেই দাম্পত্যেরই এক বিপ্রতীপ প্রতিফলনকে দেখান আমাদের, যা এক অবৈধ প্রেমের টানাপোড়েনে বোনা।

হলুদ গাঁদার বনে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দীপ প্রকাশন □ কলকাতা ৭০০ ০০৬

সূচিপত্র

১
হলুদ গাঁদার বনে

৫৩
ভাঙা আয়না

১০৫
অনিকেত

হলুদ গাঁদার বনে

সকাল থেকে এই শব্দটুকুর প্রতীক্ষাতেই তো বসে থাকেন মনোময়।

শব্দ নয়, ছোট্ট একটা ধ্বনি। টুং। ওইটুকু ধ্বনিরই কী যে জোর! মনোময়ের বুকের ভেতরে, অনেক ভেতরে, কোন এক কুয়োতলায় পৌঁছে যায় শব্দটুকু। প্রতিধ্বনিত হয়ে ঝঙ্কার তোলে বারুবার। টুংটুং। টুংটুং।

মনোময় চোখ বুজে থাকেন। সেই কোন সকাল থেকে এ ভাবেই তো বসে থাকা এখন। বাইরের এই টানা বারান্দায়। কাকভোরে উঠে একটুখানি হাঁটা, পায়ে পায়ে তিলাইদিঘির পাড়, সূর্য আগুনের থালা হয়ে উঠলে ফিরে আসা, বাগান নিয়ে খানিক ডুবে থাকা, তারপর এই বেতের চেয়ার। এর মধ্যেই রামবিলাস সকালের নাস্তাপানি রেখে যায়, চা খবরের কাগজটাও। ধীরেসুস্থে জলযোগ সাঙ্গ করেন মনোময়, খবর পড়াও। তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে অলসভাবে চোখ বন্ধ করেন। খোলেন না আর।

এবার প্রতীক্ষা, যদি আজ আসে! যদি আসে!

বোজা চোখেই মনোময় টের পেলেন রোদ্দুরে ভিজতে ভিজতে ছোট্ট শরীরটা পৌঁছে গেছে তাঁর গেটে। হাঁপাচ্ছে। কচি মুখ তার টুকটুকে লাল, পাতলা ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে অল্প, এত্তটুকুন এক বুকের খাঁচা উঠছে নামছে জোর জোর। বাতাস নিচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে খুদে খুদে হাতে চেষ্টা করল আগল ছোঁয়ার। নাগাল পেল না। ডিঙ মেরে খানিক লম্বা করে নিল তিন ফুট দেহকাণ্ড। আঙুলের ডগায় ঠেলে টুক করে নামিয়ে দিল আগল। আর অমনি বেজে উঠল শব্দ।

টুং।

মনোময়ের একদম সামনে এসে রুমঝুম সুর করে বলল, আমি এসে ... এ ...এছি।

চোখের পাতা তবু বন্ধ মনোময়ের। বড় বড় শ্বাস টানছেন। ঘ্রাণ নিচ্ছেন বুক ভরে। আহা, কী অপরূপ এক শীতল সুরভি!

রুমঝুম বেতের চেয়ারটাকে পাক খেল কয়েকবার। হাতলে পড়ে থাকা মনোময়ের ডান বাহু ধরে নাড়ল,—ও দাদু, আমি যে এসে গেছি।

মনোময় সাড়া দিলেন না। পেশাদার অন্ধের মতো বাঁ হাতে বাতাস হাতড়াচ্ছেন,—কে এসেছে? কার গলা পাই?

—আমি গো, আমি।

—আমি আবার কে?

—রুমঝুম গো, রুমঝুম।

—কে রুমঝুম?

—সেই যে গো, যে হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকে।

—হাসপাতাল! ঝালুয়ায় আবার হাসপাতাল এল কোত্থেকে?

—মাগো, কি বলো! ঝালুয়ায় হাসপাতাল নেই!

প্রতিটি বাক্যে গো যোগ করে কথাকে বুঝি আরও পোক্ত করে রুমঝুম। ভারী মিঠে শোনায়।

মনোময় ইচ্ছে করে দু'চারটে ভাঁজ বাড়িয়ে দিলেন কপালের,—তা হাসপাতালটা কোথায়?

—ওই যে গো, এ রাস্তা ধরে সোজা গেলে শিমুলতলা, তার পাশে মা-শীতলার থান, তার গায়েই তো হাসপাতাল গো।

—হুঁউউম। মনোময় মিটিমিটি হাসছেন,—সেখানে রুমঝুম কী করে?

—ওমা, রুমঝুম আবার কী করবে গো! সে তো ছোট্ট। কাজ করে তো তার মা। রুমঝুম গালে হাত দিয়ে চোখ পিটপিট করল।

—রুমঝুমটা তাহলে কিছু করে না? মহা ফাঁকিবাজ?

—মোটেই না। মোটেই না। এতক্ষণে খেলায় হার মেনেছে রুমঝুম। অধৈর্য হাতে ঠেলছে মনোময়কে,—ও দাদু, চোখ খোলো না। আর কতক্ষণ বকবক করবে গো? আমরা কি আজ বাগান করব না?

দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে বুকে টেনে নিলেন মনোময়। একরত্তি মেয়েটার সঙ্গে নিত্যিদিনের খুনসুটি সেরে আর একটা নিত্যিদিনের কাজে নেমে পড়বেন এবার। নতুন সঙ্গিনীকে পাশে নিয়ে আবার এখন শুরু হবে বাগান পরিচর্যার কাজ। যতক্ষণ না রামবিলাস এসে স্নানে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। যতক্ষণ না সূর্যটা তেড়েফুঁড়ে ওঠে আরও।

বাগান বলতে অবশ্য তেমন বিশাল উদ্যান কিছু নয়, একতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়িটার সামনে বড়জোর কাঠাখানেক ফাঁকা জমি। ওই সামান্য জমিতেই বছরভর হরেক কিসিমের ফুল ফুটিয়ে চলেছেন মনোময়। গোলাপ, বেল, মল্লিকা, সূর্যমুখী, ডালিয়া, জিনিয়া, গাঁদা, ক্রিসেনথিমাম, পপি, লিলি, কী নয়! বছর আড়াই আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যখন বাড়িটা কেনেন মনোময়, তখন ছিল চারদিকে শুধুই ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল। রামবিলাস আর তিনি খেটেখুটে সাফ করেছেন

সব। সার ছড়িয়ে, কোদাল কুপিয়ে মাটি তৈরি করেছেন। ঝালুয়ায় তেমন উত্তম বীজ পাওয়া যায় না, রামবিলাসকে কলকাতায় পাঠিয়ে বীজ আনিয়েছেন ভাল। তাঁর হাতের গুণে আর কঠোর পরিশ্রমে বাগানটি ভারী মনোরম এখন। ছোট্ট হলেও চোখ জুড়োনো।

রুমঝুমের হাত ধরে বাগানে নামলেন মনোময়। ধুতিটাকে মালকোঁচা মেরে আকাশের দিকে তাকালেন একঝলক।

শরৎ এসে গেল। ফুঁ দিয়ে আকাশে শিমুলতুলো ওড়াচ্ছে এক অদৃশ্য জাদুকর। বর্ষা শেষের গাছ্গাছালি সবুজের বাহার মেলে ধরেছে রোদ্দুরে। রোদ কিন্তু খুশি নয়, তার মেজাজে এখনও বেশ রাগ রাগ ভাব।

মনোময় খুরপি হাতে উবু হয়ে বসলেন। দোপাটি গাছগুলো শুকিয়ে এসেছে, টেনে টেনে তুলছেন গাছগুলোকে।

মাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখ পাকাল রুমঝুম,—অ্যাই, তুমি গাছগুলোকে তুলে ফেলছ কেন গো?

—এরা আর ফুল দেবে না যে।

—কেন দেবে না গো?

—এদের ফুল দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এরা এখন বুড়ো।

—ও। বুড়ো হলেই বুঝি তুলে ফেলে দিতে হয়?

—তা হয় বইকি।

—তুমিও তো বুড়ো, তোমাকেও বুঝি কেউ তুলে ফেলে দিয়েছে?

মনোময় থমকালেন একটু। তারপর হি-হি হেসে উঠলেন, সে সুযোগ আমি কাউকে দিইনি রে ভাই। আমার বুড়িটা যেই মরল, অমনি নিজের শেকড়টাকে তুলে নিয়ে, সববাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—তোমার বুড়িটা মরে গেল কেন গো?

মনোময় ছোট্ট শ্বাস ফেললেন,—বোধহয় আমাকে জব্দ করার জন্য।

রুমঝুমও চুপ হয়ে গেছে। ভাবছে কী যেন। মাটিমাখা বুড়ো আঙুলটা ঘষছে নিজের গালে। হঠাৎ বিজ্ঞের মতো বলল, আমার মা-ও তাই বলে। বাবাও নাকি মাকে জব্দ করার জন্য মরে গেছে।

মনোময়ের বুকটা মায়ায় ভরে গেল। আহারে, এইটুকুনি মেয়ে কী দুঃখী! কী একা! মা'টা সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি করে, কখনও কখনও রাতডিউটিও থাকে নাকি তার, কত সময়ে মা-ছাড়া একা একাই থাকতে হয় মেয়েটাকে। কাজের মেয়েটা কত দেখে তা তো বোঝাই যায়। নইলে ওই শিশু হঠাৎ হঠাৎ এ ভাবে বেরিয়ে পড়তে পারে বাড়ি থেকে! হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে মনোময়ের

এই বাড়ি কম দূর তো নয়, এতটা রাস্তা ওই মেয়ে চলে আসেই বা কী করে! এল তো এল, ঘণ্টাভর তার খোঁজ করতেও আসে না কেউ।

হঠাৎই একদিন রুমঝুমকে চোখে পড়েছিল মনোময়ের। শীতের মরসুমি ফুলে তখনও সেজে আছে মনোময়ের বাগান, মনোময় প্রকাণ্ড এক গাঁদার পাশের ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়িগুলোকে ছেঁটে দিচ্ছিলেন। সহসাই চোখ গেটের দিকে। সবুজ গ্রিলের ফাঁকে কচি মাথাখানা গলিয়ে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে রুমঝুম। মাঘের কনকনে হাওয়ায় তার ঝুরো চুল উড়ছে ফরফর।

কৌতূহলী মুখে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে হাত নেড়ে ডেকেছিলেন মনোময়। তারপর ওই কটকটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমতে আর কতক্ষণ!

—তুমি গাছটাকে কেটে দিচ্ছ কেন গো?

—গাছ তো কাটিনি, কুঁড়ি ছাঁটছি। ছোট কুঁড়িগুলি ছেঁটে দিলে বড় ফুল আরও বড় হয়।

—কুঁড়ি মানে কী গো?

—কুঁড়ি হল গিয়ে ফুল ফোটার আগের স্টেজ। বলেই হেসে ফেলেছিলেন মনোময়,—বুঝলে না তো? কুঁড়ি হচ্ছ গিয়ে তুমি। কুঁড়ি থেকেই ফুল ফোটে।

রুমঝুমের ঠোঁট অমনি ফুলে উঠেছে। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল,—তুমি কুঁড়িদের কাটছ কেন? তুমি কি দুষ্টু লোক?

মনোময় অপ্রস্তুত। আপস চালাবার চেষ্টা করছেন রুমঝুমের সঙ্গে,—বেশ বাবা, বেশ। আর কাটব না। এ বার বলো তো ছোট্ট কুঁড়িটা একা একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কেন?

—পড়েছে। কুঁড়ির একটু বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

—কুঁড়ির তো খুব সাহস! কেউ যদি রাস্তা থেকে কুঁড়িকে তুলে নেয়?

—পারবেই না। কুঁড়ি এক ছুট্টে পালিয়ে যাবে।

—তা কুঁড়ি এখন রাস্তায় ঘুরছেই বা কেন? কুঁড়ি বুঝি স্কুলে যায় না?

—যাবে। আগে বয়সটা ফাইভ প্লাস হোক। ঝালুয়ার স্কুলে তো ফাইভ প্লাস ছাড়া নিচ্ছেই না।

পাঁচ মিনিটও সময় লাগেনি, মেয়েটার ঠিকুজি-কুষ্ঠি সব জেনে গেলেন মনোময়। সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন একটা অন্য সুইচও টিপে দিচ্ছিল তাঁর বুকে। ফিকে হয়ে আসা এক গৃহের স্মৃতি আলগা দোল খাচ্ছিল হিমেল হাওয়ায়।

মায়া। বড় মায়া।

মনোময় খুরপি হাতে আড়চোখে রুমঝুমকে দেখলেন! সার সার গাঁদার চারা লকলকিয়ে উঠছে। উমনো ঝুমনো চুল মুখে ফেলে তাদের গোড়ার তলতলে

মাটি ঘাঁটছে মেয়েটা। ছিট ছিট ফ্রকের এখানে সেখানে ছোপ ছোপ কালো কাদা। বাড়ির থেকে রোদ মাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে, পায়ে একটা চটি পর্যন্ত নেই। হাঁটুতেই বা ও কিসের দাগ? ছড়ে গেছে নাকি?

বাড়ির লোক কি একটুও নজর করে দেখে না মেয়েটাকে!

আহা রে শিশু।

মনোময়ের গলার কাছে একটা ডেলা দলা পাকাচ্ছিল।

মায়া কাটে না। মায়া বদলে যায়।

—তোর ওপর আমার বড় মায়া পড়ে গেছে রে বকুল।

—আহা ঢং। কত মায়া সব আমার জানা আছে।

—সত্যি বলছি। মাইরি। তোকে দেখে আজকাল আমার সব কেমন ভুলভাল হয়ে যায়। সেদিন মাইতিদের চিঠি মিত্তিরদের দিয়ে এলাম।

বকুল আবার চোখ টিপে বলল,—ঢং।

বকুলের ঢং বলার কায়দায় নরেন হাসছে টিপিটিপি। খপ করে বকুলের একটা হাত চেপে ধরে বলল,—রোজ তা হলে কাজকম্ম শিকেয় তুলে তোর কাছে এসে বসে থাকি কেন বল? এই সক্কালটা ভর?

বকুল হাত ছাড়িয়ে নিল না। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করল। হাসির মতো। বলল,—মায়ায় আসো না ছাই। আসো তো তেষ্টা মেটাতে। চিঠি বিলি করতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যায়, তাই দুদণ্ড জিরোতে আসো।

নরেন বিহ্বল চোখে তাকাল,—এতদিনে আমাকে তুই এই চিনলি?

বকুল ঠোঁট বেঁকাল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সব পুরুষমানুষই চেনা হয়ে গেছে আমার। তোমাদের নোলা সাঙ্ঘাতিক। মিঠে আমটিও চাই, টক তেঁতুলটিও চাই। বলতে বলতে চোখ ঘোরাল বকুল,—তাও যদি তোমার হাঁড়ির খবর না জানতাম।

নরেন হাতটা ছেড়ে দিল। ছলাত্ ছলাত্ করে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলল গোটা কয়েক। তারপর বলল,—আমার দুঃখ এ পৃথিবীতে কেউ বুঝল না।

বকুল এবার মজা পাচ্ছিল। বাইরের ঘরে পাতা চৌকিতে বসে পা দুলিয়ে নিল খানিক। দু'হাত কোলের ওপর জড়ো করল। নতুন করে আবার দুলতে দুলতে বলল,—তোমার কিসের দুঃখু এত পিওনবাবু? ঘরে তোমার অমন টসটসে বৌ...

—কেন রোজ এক খোঁচা দিস বকুল? ওই খান্ডারনি মেয়েছেলেকে কি বৌ বলে? হাতে একটা লাঠি ধরিয়ে দিলে পুরো ঝালুয়া থানার কনস্টেবল।

বকুল খিলখিলিয়ে হেসে উঠল,—আবার বুঝি বৌ ধরে পিটিয়েছে জোর?

—তাহলে আর বলছি কী?

খাকি জামার বোতাম খুলে ডান কাঁধটা দেখাল নরেন। নীল কালশিটে পড়ে আছে। একটু যেন ফুলেও আছে জায়গাটা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে শিউরানো শব্দ করল বকুল,—ও মা, এ যে সত্যি সত্যি মেরেছে গো। কী করছিলে তুমি?

—কিছু করতে হয় নাকি? আমাকে না মারলে মহারানির রাতে খিদেই হয় না।

বকুল সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—তা বললে কি হয়! নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছিলে। এমনি এমনি কি মেয়েছেলেরা সোয়ামির গায়ে হাত তোলে?

—তোলে রে, তোলে। সন্দেহে পুড়লে মেয়েছেলেরা সব পারে। তখন আর তাদের ডান বাঁ জ্ঞান থাকে না। মিছিমিছি কাল নতুন খুন্তিটাকে বেঁকিয়ে দিল।

বকুল কথাটা বিশ্বাস করল না। কার্তিকের সঙ্গে ঘর করার সময়ে বকুলও কি কম সন্দেহ করেছে তাকে। সন্দেহগুলো তো খুব ভুলও ছিল না। তা বলে কি বকুলের কখনও সাহস হয়েছে কার্তিকের গায়ে হাত তোলার! অবশ্য কার্তিক অনেক তাগড়াই জোয়ান ছিল, সারাদিন ট্যাক্সি চালিয়ে এসেও একটুও ধুঁকত না। ছিপি খুলে ঢকঢক চুল্লু ঢেলে উল্টে বকুলকেই গোবেড়েন দিত। নরেনটা ভারী রোগাসোগা মানুষ, তার জন্যই কি পেটাতে পারে বৌ!

নরেন একদৃষ্টে দেখছে বকুলকে। মোড়া ছেড়ে উঠে এসে বকুলের কাঁধে হাত রাখল,—মাইরি বলছি, আমি কাল কিচ্ছু করিনি। সন্ধেবেলা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল, দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছিলাম। তখন কি ছাই দেখেছি পাশের বাড়ির ঊর্মিলা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে আছে! হঠাৎ ডাইনিটা এসে হিড়হিড় করে আমায় ঘরে টেনে নিয়ে গেল। কি, না আমি নাকি ঊর্মিলার সঙ্গে চোখে চোখে ইশারা করছি। তারপর ...। ওই মার খেলে চোর সিধে হয়ে যেত রে। আর আমি কিনা তাও চুরি করে করে তোর কাছে আসি।

বকুলের বলতে ইচ্ছে করল, তা অমন বৌ নিয়ে ঘর করার দরকার কি তোমার? ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলেই পারো। মুখ ফুটে বলতে পারল না কথাটা। মেয়েমানুষকে স্বামী তাড়ালে তার যে কী হাল হয়, সে তো বকুলের নিজের চোখেই দেখা। শুধু দেখা কেন, হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াও বটে। কার্তিক যে সোনারপুরের ওই ধুমসি মাগিটার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই পিরিত চালাচ্ছে, এ কথা কি জানত না বকুল! জানত। কিন্তু লোকটা যে তার সঙ্গেই ঘর করার জন্য তাড়াবে বকুলকে, তা কেইবা ভেবেছিল! তাড়ানোর অছিলায় শুধু শুধু চাট্টি বদনাম ছড়িয়ে দিল বকুলের নামে। বকুল নাকি বাঁজা। বকুল মুখরা! বকুল কার্তিককে সুখ দিতে পারেনি! আরও কত কি!

নরেনের বৌটার তো ছেলেপুলে নেই, তাকে যদি নরেন তাড়ায় কখনও, ওইসব বদনাম দেবে কি?

নরেনের দুব্‌লা হাতটা আস্তে করে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল বকুল। উদাস গলায় বলল, ব্যথা হয়েছে খুব? একটু মলম লাগিয়ে দেব?

মাটিতে থেবড়ে বসে চৌকিতে হেলান দিল নরেন, মলম লাগবে না, তুই শুধু একটু হাত বুলিয়ে দে।

বকুলের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক। পুরুষমানুষের প্রেম পিরিতের কত যে রূপ! কখনও পাগল, কখনও দানব, কখনও শিশুটি! হয়তো রাতে ব্যথায় কোঁকাবে, কিন্তু এখন বকুলের হাতের ছোঁয়াতেই বেশি সুখ পাবে মানুষটা। থাক, অত সুখে কাজ নেই।

বৌদির ড্রয়ার-থেকে মলম বার করে নরেনের পাশে বসল বকুল। টিউব থেকে একদলা জেলি টিপে থুপে দিল মানুষটার কাঁধে। চেপে চেপে ঘষছে।

চোখ বুজে আছে নরেন। বকুলের হাতের চাপে মুখ মাঝে মাঝে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার, তবু রা'টি কাড়ছে না। হঠাৎ দু'হাতের বেড়ে বকুলের কোমর জড়িয়ে ধরল।

বকুল নিজেকে ছাড়ানোর ভান করল,—আহ, কী হচ্ছে কি? রোসো দেখি একটু, মলমটা আগে লাগিয়ে নিই।

নরেন আরও জোরে চেপে ধরেছে বকুলকে,—আর লাগবে না। ব্যথা সেরে গেছে।

বকুল বাধা দেওয়ার জোর পেল না। দু'মিনিটেই উস্তম পুস্তম ঘেঁটে বকুলকে কাহিল করে দিল নরেন। ব্লাউজ খুলে গেছে, শাড়ি আলুথালু, আগুন বেরোচ্ছে গা দিয়ে।

মা গো মা, শরীরে এত তাপও থাকে!

নরেনকে ঠেলেঠুলে জোর করে উঠে দাঁড়াল বকুল। আঙুল চালিয়ে চুলটা খানিক ঠিক করল। বেশবাসও। ত্বরিত পায়ে বারান্দায় গেল একবার।

নরেন ছটফট করছে, যাস কোথায়?

বকুল উত্তর দিল না। কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দম নিল কয়েক ঢোঁক। হাসপাতাল-চত্বরের এক্কেবারে কোনার দিকে নার্সদের কোয়ার্টার। মাঝে কিছু বড় বড় গাছপালা আছে। সারবন্দি। শিমুল, ঘোড়ানিম, শিরিষ আর শিশুগাছের মিছিল। তাদের টপকে হাসপাতালের মেন-বিল্ডিং এখান থেকে ভাল দেখা যায় না। ওখানেই এখন আছে বৌদি, ঘুরছে ওয়ার্ডময়। সেদিক পানে কয়েক পল তাকিয়ে থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল বকুল। সন্ত্রস্ত মুখে বাইরের রাস্তায়

উঁকিঝুঁকিও মারল একটু। নাহ্, এত তাড়াতাড়ি ফিরবে না রুমঝুমও।

বকুল তবু ঘরে ফিরে হালকা তাড়া দিল নরেনকে। শরীরকে কোনও বিশ্বাস নেই। নিজেরও। পরেরও।

নরেনের ওঠার নাম নেই। হাত ছড়িয়ে লম্বা হাই তুলল, তুই মাইরি হেভি সেয়ানা আছিস। রোজ সকালে দিব্যি কায়দা করে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিস মেয়েটাকে।

না ভাগিয়ে উপায় আছে বকুলের। ঘরে যা ডাকাত হামলায় রোজ! একদিন যদি ওই মেয়ে নরেনকে দেখে ফেলে, তাহলে আর রক্ষে আছে, ঠিক মাকে কটকট করে গপ্পো করে দেবে। বকুলকে কি কম সামলেসুমলে চলতে হয়। আশপাশের কোয়ার্টারের দিকে নজর রাখো, হুট করে কেউ এসে পড়ল কি না খেয়াল করো, পথে বেরিয়ে মেয়েটা কোথায় গেল, কী করছে, সে চিন্তাও রাখো মাথায়। ভাগ্যিস রুমঝুম এক দাদু জুটিয়ে নিয়েছে, নইলে কি আর নরেনকে নিত্যদিন ঘরে ডাকতে পারত বকুল। তাও তো হ্যাপা কম যায় না। ওই আক্কুটে মেয়ে রোজ তাল তাল কাদা মেখে ফিরছে, তাকে স্নান করাও ভাল করে। জামা থেকে কাদামাটি ঘষে ঘষে তোলো। কম হ্যাঙ্গাম! মেয়ের জামায় কাদার ক দেখলে বকুলকে কি ছেড়ে কথা বলবে বৌদি!

বকুল অবশ্য এত কথা বলল না নরেনকে। মুখ গোমড়া করে খানিকটা গাম্ভারি ভাব আনল গলায়,—আমি পাঠাই না। ও মেয়ে নিজেই যায়। ফিরে এসে আবার সেয়ানার মতো বলে, আমি যে একা একা অত দূরে যাই, মাকে যেন বলে দিও না মাসি।

নরেন খ্যাক খ্যাক হাসছে, দাদু নাতনিতে খুব জমেছে বলছিস?

—হুঁ। খুব পিরিত। মেয়ে তো প্রায় নেশার মতো ছোটে।

নরেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার কব্জা করল বকুলকে,—তুই যেমন আমার নেশা, তাই তো?

বকুল নির্বিবাদে খানিকটা আদর খেয়ে নিল। গোমড়া ভাব মুখে আহ্লাদি স্বর ফিরে এসেছে,—কটা বাজে খেয়াল আছে? এর পর তো ঝালুয়ার লোক চিঠিপত্র না পেয়ে পোস্টঅফিসে ঝামেলা করবে।

—করুক। সব চিঠি আমি নর্দমার জলে ফেলে দেব।

—হুঁউউহ্, বৌয়ের কাছে মার খাওয়া বরের যে খুব সাহস!

—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিস?

—না গো না, যেতে বলছি।

কথাটা বলেই কী যেন মনে পড়ে গেল বকুলের। রোগা মানুষটার কবল থেকে

নিজেকে ছাড়াল আস্তে করে। ভেতর দরজার কাছে গিয়ে বলল,—এক মিনিট। দাঁড়াও। যাওয়ার আগে সরবতটা খেয়ে যাও। এসেই বড় মুখ করে খেতে চেয়েছিলে।

—সে যখন বলেছিলেম, তখন বলেছিলেম। এখন কি আর সরবতে আমার তেষ্টা মিটবে রে? নরেনের স্বরে প্রায় আর্তনাদ,—তোর জন্য পিপাসায় আমার ছাতি ফাটেরে বকুল।

বকুল শুনেও শুনল না।

রান্নাঘরে গিয়ে ঝটপট লেবু কাটল। কালো কুঁজোয় জল ভরল গ্লাসে, চিনি মেশাল, নুন দিল, লেবু চিপল প্রাণপণে। তারপর পানসে সবুজ টকমিষ্টি জলটার দিকে মোহিত হয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।

মনে মনে বলল,—ওই তেষ্টাটা তোমার থাক পিওনবাবু। সব তেষ্টা মিটে গেলে আর কি তুমি বকুলের কাছে আসবে।

পাঁচটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরোচ্ছিল কবিতা, হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সি কেস এসে গেল। অ্যাক্সিডেন্ট কেস। ঝালুয়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে ঘটেছে দুর্ঘটনাটা। মোটর সাইকেলে এক দম্পতি যাচ্ছিল, কোত্থেকে এক লরি এসে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিয়েছে দুজনকে। ছেলেটার অবস্থা বেশ খারাপ, স্কাল ইনজুরি হয়েছে, বাঁচবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটার তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়নি, কবজির হাড় ভেঙেছে, কোমরেও চোট খেয়েছে জোর।

কবিতা সাধারণত ইমার্জেন্সি ডিউটি করে না। করতে ভালও বাসে না। আজ বাধ্য হয়েছে। কোয়ার্টারে ফেরার জন্য বেরিয়েই পড়েছিল প্রায়, ডক্টর ঘোষ হঠাৎ পাকড়াও করে নিলেন। কবিতা, ইমার্জেন্সিতে কিছুক্ষণ থেকে যাও আজ। সুষমা ওখানে একা পড়ে গেছে।

কবিতার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। আট বছর ধরে সে নার্সের চাকরি করছে, এমনটা তার হওয়ার কথা নয়, তবু কী যে একটা হচ্ছে শরীরের ভেতর। অস্থির অস্থির লাগছে।

সুষমা জিজ্ঞাসা করল,—তোকে এরকম লাগছে কেন রে? কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?

কবিতা মুখে উত্তর দিতে পারল না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল শুধু।

সুষমা কবিতার অনেক দিনের বন্ধু। আগের হাসপাতালে দুজনে একসঙ্গে কাজ

করেছে। কবিতার সমস্ত কথাই জানে সুষমা। বলল,—বুঝেছি। তুই ডক্টর ঘোষকে বলে বাড়ি চলে যা। আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি।

কবিতা ইমার্জেন্সি রুমের বাইরে এসে দাঁড়াল! ওফ, পেশেন্টটার দিকে কেন যে তাকাল কবিতা!

চোখের সামনে একটাই ছবি ভেসে উঠছে বার বার। বড় বীভৎস ছবি। একটা থেঁতলানো শরীর নির্বিকার শুয়ে আছে মর্গের টেবিলে।

সেদিন ওভাবে দুর্দম গতিতে স্কুটার চালানোর কী দরকার ছিল সুপ্রতিমের? ওভাবে উন্মত্তের মতো মৃত্যুর দিকে ছুটে যাওয়াকে কী বলে! অবিমৃষ্যকারিতা! দায়িত্বজ্ঞানহীনতা! অপরিণামদর্শিতা! নাকি স্রেফ নিয়তি!

রুমঝুমের কথাও একবার ভাবল না সুপ্রতিম!

সুষমা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে,—কীরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে? গেলি না ডক্টর ঘোষের কাছে?

কবিতার গলা কেঁপে গেল,—আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—জানি না।

—ঠিক আছে, দাঁড়া। বলেই সুষমা চলে গেল। ফিরে এসে হাসিমুখে বলল,—যাহ্, ডক্টর ঘোষ তোকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। কোয়ার্টারে ফিরে মুখেচোখে ভাল করে জল দে আগে।

কবিতা কৃতজ্ঞ চোখে বান্ধবীর দিকে তাকাল। কাছের লোকদের সহানুভূতি কুড়িয়ে কুড়িয়েই তো এখন তার বেঁচে থাকা।

সুষমা বলল,—তোকে একটা কথা বলব?

—বল।

—দু'বছর তো হয়ে গেল, এখন কি ঘটনাটাকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না?

মুছতে চাইলেই যদি মুছে ফেলা যেত! কবিতা ম্লান হাসল,—ভুলেই তো গেছি রে। নাহলে ওই একরত্তি মেয়েটাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম?

সুষমা হাত রাখল কবিতার কাঁধে,—রাগ যদি না করিস তো আর একটা কথা বলি।

—কী?

—এখনও অনেক দিন তোকে বাঁচতে হবে, বহু সময় পড়ে আছে, নিজেকে নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা কর।

—কী ভাবব?

—জীবনটাকে নতুন করে স্টার্ট কর।

—স্টার্ট তো করেই আছে রে। দিব্যি গড়গড় চলছে।

—এটাকে মোটেই চলা বলে না।

—কী বলে তাহলে? থেমে থাকা?

সুষমা কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। ঠোঁট উল্টে বলল,—দ্যাখ, আমি কী বলতে চাইছি, তুই খুব বুঝতে পারছিস। এখনও রুমঝুম ছোট আছে, ওর চোখে তেমন কিছু ঠেকবে না। মানিয়ে গুনিয়েও নিতে পারবে। বলতে বলতে গলাটা হঠাৎই নরম করেছে সুষমা,—আমাদের সোসাইটি এখনও একা একটা মেয়েকে সুস্থভাবে বাঁচতে দেয় নারে।

বাঁচতে যে সত্যিই দেয় না, কবিতা কি তা টের পাচ্ছে না! সুপ্রতিম মারা যাওয়ার পর থেকেই ঘাড়ের কাছে বিন বিন করছে অজস্র হিতাকাঙ্ক্ষীর দল। আহা কবিতা, তোমার কী কষ্ট! আহা কবিতা, তোমার কথা ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না। আহা কবিতা চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি। বারাসাতের কোয়ার্টারে তো রাত দুপুরে টোকা পড়তে শুরু করেছিল দরজায়। সারা রাত মেয়ে কোলে কাঁটা হয়ে থাকত কবিতা। ঝালুয়া জায়গাটা ঢের ভাল, এখানে শেয়াল কুকুরের উৎপাত নেই। তবে চিল শকুন উড়ছে প্রচুর। যখন তখন ডানা মেলে হাসপাতালের বড়বাবুটি নেমে আসছেন গায়ের কাছে, ফিস ফিস করছেন। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো পাখিটা স্নেহ দেখানোর ছল করে টুকটাক ছুঁয়ে নিচ্ছে কবিতাকে। শ্রাবণ মাসে ডক্টর রায় বৌকে বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল, তারপর রাত অবধি নিজের কোয়ার্টারে কবিতাকে ডেকে নিয়ে ডাক্তারের সে কী গল্পের বহর! এর পরও আছে রাত ডিউটি, ছোকরা ডাক্তার ...।

তা এরা না হয় অনাত্মীয়, উনত্রিশ বছরের আধাবেওয়ারিশ বিধবাটাকে নিয়ে এরা তো একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইবেই। কিন্তু নিজের আত্মীয়রা! আপন মেজ জামাইবাবু ষোলো মাইল রাস্তা পেরিয়ে হঠাৎ হঠাৎ সন্ধেবেলা চলে আসছে ঝালুয়ায়। কবিতার কোয়ার্টারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে যাচ্ছে। শতবার শোনা পারিবারিক যত ঘোঁট হাজার বার করে শুনিয়ে নিজেই নিজের রসবোধে হাসছে। আর ঘড়ি দেখছে মাঝে মাঝে। এত রাত্রে বাসে করে ফেরাটা কি ঠিক হবে কবিতা? যদি পথে বাস খারাপ হয়ে যায়! আমি বরং আজ থেকেই যাই!

কী ঘেন্না। কী ঘেন্না। বকুলটা আবার শোনে এসব কথা। কীভাবে কে জানে!

এইসব চিল শকুনদের তাড়ানোর রাস্তা একটাই। বিয়ে। কবিতা জানে। তবে জানা আর কাজটা সেরে ফেলার মধ্যে দুস্তর ফারাক। ভাবতে গেলে কবিতার কান্না পায়। মাঝে মধ্যেই চোখের পাতা এক হয় না, মাঝরাতে উঠে বসে থাকে

বিছানায়। শরীর জুড়েও তখন কী যে এক জ্বালাপোড়া! পাশে ঘুমন্ত মেয়েটার কথাও মনে থাকে না তখন। ঝালুয়ার অন্ধকারে বেপরোয়া হাত-পা ছুঁড়তে থাকে কবিতা। অদৃশ্য এক সুপ্রতিমকে কিল চড় লাথি ঘুষি মেরে যেতে থাকে। সুপ্রতিমের কিছুই হয় না। সে এখন একজন সুখী মৃত মানুষ। চোয়াল কষে সংকল্প করে বিনিদ্র কবিতা, ওই মানুষটাকে একটা কড়া শাস্তি দিতে হবে এ বার। একটাই শাস্তি। বিয়ে। কবিতা আবার চুটিয়ে ঘরসংসার করবে, আর অন্তরীক্ষ থেকে জ্বলে-পুড়ে মরবে সুপ্রতিম।

দিনের আলো ফুটলেই সংকল্পটা টলে যায়। কেন যে টলে! আলো কি মানুষের সাহস কমিয়ে দেয়!

না হলে মহীতোষকে কেন বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছে কবিতা!

মহীতোষ অবশ্য সোজাসুজি কিছু বলেনি কবিতাকে। লোকটা যেন কেমন ধারার! মন্দ তাকে বলা যাবে না, বরং একটু বেশিই ভালমানুষ। হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফেরার পথে প্রকাণ্ড শিশুগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে মহীতোষ। প্রায় প্রতি বিকেলেই। ঝালুয়ার দক্ষিণ কিনারে কাঠ চেরাইয়ের কল আছে মহীতোষের, তারই কাজে তাকে নাকি রোজ আসতে হয় বাজারপাড়ায়।

কবিতাকে দেখে সন্তর্পণে এগিয়ে আসে মহীতোষ,—আপনার ডিউটি শেষ হল?

মাথার শুভ্র আবরণী থেকে ক্লিপ খুলতে থাকে কবিতা। একটু বুঝি হাসেও।

মহীতোষ খানিক চুপ থেকে বলে,—ঝালুয়ায় আপনার ভাল লাগছে?

কবিতা বিস্মিত হয়। অথবা বিস্ময়ের ভান করে। বলে,—কেন লাগবে না?

—না। জায়গাটার তো তেমন কিছু নেই।

—কে বলল নেই। থানা আছে, হাসপাতাল আছে, সিনেমা হল আছে, বাজার আছে, অত বড় একটা তিলাইদিঘি আছে, গাছপালা আছে ...

—তা আছে। কিন্তু আপনার বারাসতের মতো তো আর জমজমাট নয়।

—কে বলল আপনাকে আমার জমজমাট জায়গা ভাল লাগে? মুহূর্তে চল্লিশ বছরের মহীতোষের চোখ উজ্জ্বল হয়ে যায়,—আপনার ভিড় ভাল লাগে, না আপনার নির্জনতা ভাল লাগে?

উত্তর দেয় না কবিতা। বুঝি বা আবার একটু হাসে।

এরপর মহীতোষ অনেকক্ষণ নীরব হয়ে যায়। শিশুগাছের নীচে একটা হাওয়া খেলে সেই সময়। তক্ষুনি আচমকা গাছের ডালে কিচমিচ করে ওঠে পাখিরা। তাদের ভাষা বড় স্পষ্ট শোনায় কবিতার কানে। তারা বলে, মহীতোষের বৌ পালিয়েছে আজ থেকে ন'বছর আগে। বৌটা ছিল কলকাতার মেয়ে, ঝালুয়ার নির্জনতায় এতটুকু মন বসেনি তার। মহীতোষ এখন একা, ভীষণ একা।

কবিতা নরম গলায় প্রশ্ন করে,—আপনার শরীরটা এখন কেমন?

—ভাল। বেশ ভাল।

—পেটের ব্যথাট্যথাগুলো আর আসে না তো?

—না। ঝালুয়া হাসপাতালে চিকিৎসার গুণ আছে।

কবিতা আচমকাই প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে একটু,—শুধু চিকিৎসারই গুণ আছে? সেবার নেই?

কাঁচা পাকা উশকো খুশকো চুলের চৌকোমুখ ধুতিপরা গাট্টাগোট্টা মানুষটা বেশ লজ্জা পায়। ডান হাত দিয়ে আড়াল করে বাঁ হাতটা। বাঁ হাতের তিনটে আঙুল নেই মহীতোষের। নিজের হাতে কাঠ চেরাই করতে গিয়ে যন্ত্রকরাতে উড়ে গেছে।

লাজুক মুখে বলে মহীতোষ,—সেবাও তো চিকিৎসা, নয় কি?

—খিধেটিদে হয় ঠিক মতন?

—হয়। কিন্তু বড় বেখাপ্পা সময়ে হয়। সকালে পেট পুরে খেলাম, দু'ঘণ্টার মধ্যে আবার খিদে পেয়ে গেল। আবার কোনওদিন কাজের চাপে খাওয়া হল না, খিদেও পেল না। তবে খিদেটা যখন পায়, বড় কষ্ট হয়।

—পাশেই তো আপনার বাড়ি, গিয়ে খেয়ে এলেই পারেন?

—বাড়ি। আবার নীরব হয়ে যায় মহীতোষ। আবার ওঠে হাওয়াটা। একটু ঘূর্ণির মতো ঘোরে মহীতোষ আর কবিতাকে ঘিরে। তবে পাখিরা তখন আর শব্দ করে না। বুঝি নির্জন নীরবতা বুকে নিয়ে ঝালুয়ার সেই শেষ প্রান্তে ফিরে যায় মহীতোষ।

শিশুগাছের নীচে এসে কবিতা আজ থমকাল সামান্য। মহীতোষ আজ নেই। কী হল মানুষটার? এসে ফিরে গেল?

দু'দণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কবিতা আবার হাঁটা শুরু করল। কোয়ার্টারে ফিরে দেখল রুমঝুমের টিউটর এসে গেছে, বাইরের ঘরের চৌকিতে বসে পড়াচ্ছে রুমঝুমকে।

ঝালুয়ার এই কোয়ার্টারটা খুব বড় নয়। দুটো মাত্র ছোট ছোট ঘর, ছোট বারান্দা, একফালি খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘর, বাথরুম। একটু জোরে কথা বললে এ ঘরের কথা ও ঘরে শোনা যায়।

কবিতা গলা নামিয়ে বকুলকে প্রশ্ন করল,—মাস্টারমশাইকে চা দিয়েছিস?

বকুল আস্তে কথা বলার ধার ধারে না, চেঁচিয়েই উত্তর দিল,—চিনি ছিল না! নিয়ে এলাম। এইবার দেব।

—আমাকেও দিস্ তবে।

দুধসাদা পোশাক ছেড়ে একটা ফিকে নীল শাড়ি পরল কবিতা। চুল খুলে ছড়িয়ে দিল পিঠে। পাখার নীচে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। ও ঘরে রুমঝুম রাইমস্ পড়ছে, কলি ভেসে আসছে এ ঘরে। টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর ...

ছেলেটা খুব যত্ন নিয়ে পড়ায় রুমঝুমকে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে, মুখটা বড় মায়াবী। সামান্য ষাট টাকা করে পায়, তার জন্য সাত দিনই আসে। ওই কটা টাকাতে এত মনোযোগ দিতে পারে কী করে!

বাইরের ঘর ভেদ করে বারান্দায় এল কবিতা। প্রান্তে বসে পা ঝুলিয়ে দিল সিঁড়িতে।

রাত গাঢ় হতে শুরু করেছে ঝালুয়ায়। কবিতা আঁধারে চোখ মেলল। পলকে ইমার্জেন্সিতে শুয়ে থাকা যুবকটির মুখ ভেসে উঠেছে চোখে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ক্ষতবিক্ষত মুখও। সুপ্রতিমের। লাশকাটা ঘরে সুপ্রতিম শুয়ে আছে নির্বিকার।

কবিতা দ্রুত দৃশ্যটাকে চোখ থেকে মুছে দিল। অন্ধকারে শিশুগাছটার দিকে তাকাল। দূরের গাছটা এখন নিরেট কালো। যেন তুলি দিয়ে আলকাতরা বুলিয়ে গেছে কোন শয়তান।

কবিতার বুকটা ডুবডুব করে উঠল।

মহীতোষ আজ এল না।

কেন?

ঝালুয়ায় আঁধার ঘন হলে তুলসীদাসী রামায়ণখানা নিয়ে বসে রামবিলাস। নিজের ঘরের মেঝেতে বাবু হয়ে সুর তুলে যায় একটানা। একই জায়গা পড়ে যায় রোজ। হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করেছেন রাম, জনকরাজার দেশ থেকে অযোধ্যায় ফিরছেন রামচন্দ্র, সঙ্গে তাঁর সীতামাঈ।

লছমি ঘরে ঢুকে একটুক্ষণ কান পেতে শুনল অংশটা। মুখে আঁচল চেপে ফিক করে হাসল,—আপ কভি আগে নেহি বাড়েঙ্গে কেয়া?

রামবিলাস চোখ থেকে চশমা নামাল। বেশ কিছুকাল ধরে কাছের জিনিস ঝাপসা দেখছিল রামবিলাস, ঝালুয়ায় আসার পর মনোময় তাকে একটা চশমা করিয়ে দিয়েছেন।

পঞ্চাশ বছরের কপালে দুটো অতিরিক্ত ভাঁজ ফেলে রামবিলাস বলল,—এঁহি তক্ পড়নেমে আচ্ছা লাগতা হ্যায় রে। ইস্‌কে বাদ্ মন নেহি করতা।

লছমি বলল,—কেন?

—বাকি সবই তো দুখ্‌ভরা কহানি। এরপরই তো রামজিকে বাপ বনবাসে পাঠাবে। তারপর রাবণ, সীতামাঈকে হরণ, যুদ্ধ...

—তারপর সীতাকে ত্যাগ ...। লছমি লোটা থেকে ঢকঢক জল খেল।

কথাটা বিধঁল রামবিলাসকে। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

লছমি একদম বদলে গেছে। আগে কত দুবলি ছিল, ডরপুক ছিল। ঝালুয়ায় আসার পর গায়েগতরে অনেক ভারী হয়েছে লছমি, বাতও ফুটেছে। রামবিলাসের ভাবতে ভারী আশ্চর্য লাগে, জওয়ানিতে যে অউরত অত কালোকুষ্টি, চালিশ পেরোনো দেহে তার অত চেকনাই আসে কোথ্‌থেকে! কালো বলে কালো! পুরো চটা ওটা আবলুস কাঠ কা মাফিক ছিল লছমি। বড়া বড়া দাঁত! ঢিপি ঢিপি কপাল! শাদির সময়ে একবার দেখেই রাগে দুঃখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল রামবিলাস। ওই বৌ নিয়ে, সে কিছুতেই এক খাটিয়ায় শোবে না। সম্পর্কই রাখবে না বৌয়ের সঙ্গে। বাপ বহুত দহেজ নিয়ে ওই বহু ঘরে এনেছে, বাপই বুঝুক ওই বহু নিয়ে কী করবে!

যে কথা, সেই কাজ।

বিশ বছরের হাট্টাকোট্টা জোয়ান রামবিলাস তেজ দেখিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। আর কখনও দেশে যাবে না। মনোবাবুর বাড়িতে সে তখন পুরানা নোকর, সেই বারো বছর বয়সে তাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেছে এক দেশওয়ালি চাচা, বাবু মাঈজিও নিজের লড়কার মতো পেয়ার করে তাকে, তার কিসের চিন্তা? দেশ থেকে একটার পর একটা খত আসে, রামবিলাস জবাব দেয় না। মুলুক থেকে লোক এসে ঘরে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করে, রামবিলাস তাদের ফিরিয়ে দেয়। শেষে দু সাল পর বাপের অসুখের মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মুঙ্গেরে নিয়ে যাওয়া গেল রামবিলাসকে।

সে বারই রামবিলাস দ্বিতীয় শাদি করে ফিরল। এ বার বৌ খুবসুরত হয়েছে, হাঁটাচলায় ছমকছল্লু ভাব, রামবিলাসের মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। মনোময়ের বাড়িতেই কাজ করে, বছর বছর মুলুক যায়, মাহিনাভর থেকে আসে। রামবিলাসকে একে একে আটটা বালবাচ্চা দিল সরবতিয়া, রামবিলাস খেতিজমি বাড়াল। রামবিলাসের বালবাচ্চারা এখন সবাই সেয়ানা। লেড়কিদের শাদি হয়ে গেছে, এক লড়কা খেতিবাড়ি দেখে, দুই লড়কার জুট মিলে কাজ, আর দুজন এখনও পড়াশুনো করছে।

বছর চারেক আগে হঠাৎ মারা গেল সরবতিয়া। দেশে তার ক্রিয়াকরম্‌ সারতে গিয়েছিল রামবিলাস, তখনই কে যেন খবরটা দিল তাকে। লছমির নাকি এখন খুব খারাপ হাল। ভাইভাবিদের সংসারে ভইষের মতো খাটতে হয়, নোকরানির

থেকে বুরা দশা হয়েছে তার। শুনে কেমন চলকে গেল রামবিলাস। যে লছমিকে সাতাইশ্ বছরে একবারও মনে পড়েনি, তাকে দেখতে সোজা রকিব-গঞ্জ চলে গেল। লছমির ভাইরা চোটপাট করতে এসেছিল, তাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে লছমিকে নিয়ে চলে এল মুঙ্গের।

রামবিলাস অপরাধী মুখে লছমিকে বলল,—তোকে আমি বহুত তকলিফ দিয়েছি, নারে?

লছমি জামাকাপড় ভাঁজ করছে। বলল,—ভগবান আমার নসিবে যা লিখেছেন, তাই হয়েছে। এ নিয়ে এখন আর দুখ্ করে কি লাভ?

—তাহলে সীতামাঈকে ত্যাগ করার কথা বললি কেন?

লছমির মুখে ছায়া নামল,—কিছু ভেবে বলিনি জি। মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

—মনের কথাই তো ভুল করে জবানে এসে যায় রে লছমি।

লছমি চুপ।

রামবিলাস বলল,—আমি দুখ্ দিয়েছি, আমার বেটারা দুখ্ দিয়েছে ... মুঙ্গেরে তোকে এক সালও টিকতে দেয়নি ওরা।

—তো কি আছে! ওরা তো আমারও বেটা। বেটা মাকে দুখ্ দিলে, মাকে মন খারাপ করতে নেই।

রামবিলাসের বুকটা কেমন গলে গলে যাচ্ছিল। রামায়ণ বন্ধ করে লছমির পাশে উঠে এল। এই মেয়েকে পঁচিশ বছর ধরে পচিয়েছে সে! এই মেয়ের গোটা জওয়ানি কেটেছে শুধু মোষের পিঠ ডলে ডলে।

রামবিলাসের গলা কেঁপে গেল। আড়াই বছর ধরে বহু বার বলা কথাটা আউড়ে ফেলল আবার,—আমি খুনি। আমি পাপী। আমার সাজা হওয়া উচিত।

লছমির চোখে কোনও সৌন্দর্য নেই। ভাষাও ফোটে না। তবুও কি একটা যেন ঝিলিক দিয়ে গেল। বলল,—আপনাকে বারণ করেছি না, ও কথা একদম নয়! ঝালুয়ায় এসে আমি সব ভুলে গেছি।

গলার কাঁপন এ বার ছড়িয়ে যাচ্ছে দেহে। রামবিলাস মোটা মোটা আঙুলে লছমির কাঁধ খামছে ধরল,—তুই ভুলেছিস, আমি কেন ভুলতে পারি না রে লছমি?

সোহাগের এই পূর্বলক্ষণগুলো চেনা হয়ে গেছে লছমির। সে তড়িৎ গতিতে সরে গেল,—আভি নেহি! বাবুকে খানা দিতে হবে।

কলকাতার বাড়ির মতো দেওয়ালঘড়ি নেই এখানে, আউট-হাউসের ঘরে তাই একটা টাইমপিস রেখেছে রামবিলাস। ঝালুয়াতেই কেনা।

রামবিলাস টাইমপিসের দিকে চোখ রাখল,—বাবুর এখনও খাওয়ার টাইম হয়নি। নটা বাজতে এখনও বিশ মিনিট বাকি।

লছমি ঘুরে তাকাল,—বাবু এত টাইম মেপে খায় কেন?

—এ আর কি টাইম মাপা দেখছিস? কলকাতার বাড়িতে বাবুকে তো দেখিসনি! দেখলে বুঝতিস। এক মিনিট টাইম ইধার উধার হত না। ছটার সময়ে চা, আটটায় নাস্তাপানি, বারোটায় দুপুরের খানা, দুটোয় ফল। ঝালুয়ায় এসে বাবু আর সে বাবু নেই। বহুত চেঞ্জ হয়েছে। ঘড়ি আর মানে কই, বাগিচা নিয়েই পড়ে আছে দিনভর।

আউটহাউসের সামনেই মনোময়ের ফুলবাগান। ঘরের আলো আঁধারকে তরল করে দিয়েছে অনেকটা, দিব্যি দেখা যাচ্ছে ফুলেদের। বাগান আলো করে ফুটে আছে বেল মল্লিকা গোলাপ। হালকা সুগন্ধ ভেসে আসছে লছমির ছোট্ট ঘরে।

লছমি বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল,—ফুল কখনও দাগা দেয় না। ফুল নিয়েই থাকা ভাল। বাবু ভাল আছে।

—তা আছে। রামবিলাসও বাগানে চোখ ফেলেছে,—বাবুর তবিয়ত এখন অনেক ভাল। মাঈজির স্বর্গবাসের পর কী যে হাল হয়েছিল বাবুর। দিন বুখার। দিন খাঁশি। এখানে কখনও বিমারিতে পড়তে দেখেছিস বাবুকে? জিন্দা গুড়িয়াটাকে পেয়ে বাবু যেন আরও ভাল হয়ে গেছে।

লছমি অন্যমনস্ক ভাবে শুনছিল। কিংবা শুনছিল না। হঠাৎ রামবিলাসের কাছে ঘেঁষে এল,—এক বাত কঁহু?

—কেয়া?

—দেশে ফেরার মতলব আপনি বিলকুল ছেড়ে দিন জি! কী হবে ফিরে?

লছমিকে কথাটা মাঝে মাঝে বলে রামবিলাস। কিন্তু নিজের মনেই ঠিক যেন জোর পায় না। এত দিন ধরে সে দেশছাড়া, এখন দেশে পাকাপাকি ভাবে গেলে আর কি সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়ানো যাবে? মাটি একবার ছেড়ে এলে মাটিও পর হয়ে যায়। দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের বালবাচ্চাদেরই কেমন অচেনা অচেনা লাগত রামবিলাসের! পড়োশিরা যখন এসে দেশগাঁয়ের কথা বলত, এ-বাড়ি ও-বাড়ির গল্প শোনাত, কিছুই যেন তেমন ভাবে মাথায় ঢুকত না। আপনা মুলুকের খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে গিয়েও কখনও কখনও কী অস্বস্তি। আবার যেই ট্রেন থেকে হাওড়া স্টেশনে, শরীর মন বিলকুল চাঙ্গা। এই যে আড়াই বছর দেশে যায়নি রামবিলাস, তাতেই বা কি এমন মন খারাপ হয়েছে তার!

তবু একবারে লছমির পরামর্শ মানল না রামবিলাস। ক্ষীণ প্রতিবাদ জুড়ল, —বলিস কি লছমি? নিজের ঘরে নিজে ফিরব না? আপ্না খেতিবাড়ি দেখব, আপ্না গাঁওমে মরব ...

লছমি ভুরু কুঁচকে দেখল রামবিলাসকে। বলল,—এ আপনার দিল কি বাত নয়, আমি জানি। দেশে গিয়ে আপনি খালি বাবুর কথা বলেন। বুড়াবাবুকে ছেড়ে আপনি থাকতেই পারবেন না।

রামবিলাস হেসে ফেলল। লছমিকে যত বোকা ভাবে তত বোকা তো নয়। সত্যিই বাবু তার দিমাগে ঢুকে গেছে। বাবু বেঁচে থাকতে সে যাবে কোথায়!

হাসতে হাসতে রামবিলাস বলল,—আমি কি আভি যাওয়ার কথা বলেছি? বাবু বুড়ো হচ্ছে, বাবুর যদি কিছু হয়ে যায়, তখন কী করব? কোথায় যাব?

—কেন, আমরা এই মকান পাহারা দেব।

—এই মকান বাবুর ছেলেরা থোড়ি রাখবে! কলকাতায় অত বড় মকান ছিল, সেখানেই কেউ থাকল না। যে যার মতো আলাদা হয়ে গেল। বাবু মরে গেলে ছেলেরা এই মকান জরুর বেচে দেবে।

—তো?

—তো আবার কি? চলো মুসাফির আপনা ঘর। লছমি আবার কী যেন ভাবল। বলল—এক কাম করেন তাহলে। আপনার তো কিছু রুপিয়া আছে, বাবুর কাছ থেকে কিছু উধার নিন, তারপর ঝালুয়াতে একটা ঘর তুলে বসে যান। চাই তো এখানে একটা দুকানও খুলে দিতে পারেন।

কথাটা এ ভাবে কখনও ভেবে দেখা হয়নি! রামবিলাস আগে মরলে লছমির কী গতি হবে। মুঙ্গেরে তো ঠাঁই নেই লছমির।

রামবিলাস শব্দ করে হাসল,—বুদ্ধিটা মন্দ দিসনি।

লছমি টেরচা চোখে দেখছে রামবিলাসকে,—আমি এই ঝালুয়াতেই মরব, হাঁ।

রামবিলাস রসিকতা করল,—এত পেয়ার হয়ে গেল ঝালুয়ার সঙ্গে?

লছমি ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাল। নটা বাজছে। আর কথা নয়, এ বার খানা দিতে যাবে বাবুকে।

রামবিলাস পিছু ডাকল,—কি, বললি না যে, ঝালুয়া কেন এত ভাল লাগল?

লছমি দরজার চৌকাঠে দাঁড়াল একটু। চোখটা হঠাৎ বুজে ফেলে বলল,—আপ্ যো এঁহি মুঝে মিলা জি।

লছমি কথাটা বলেই ছুটে চলে গেছে। রামবিলাসের মন এক বিচিত্র পুলকে ভরে যাচ্ছিল। কথাটা বলার সময়ে কুৎসিত মেয়েটা কেমন এক পলকে সুন্দর হয়ে গেল। ঠিক যেন ম্যাজিক।

একেই কি পেয়ার বলে।

সরবতিয়ার গর্ভে আটটা বালবাচ্চা হয়েছে রামবিলাসের, কই সরবতিয়াকে দেখে কখনও তো ঠিক এই অনুভূতি আসেনি মনে!

ঝালুয়ার আকাশে এখন অনেক তারা। চাঁদ ওঠেনি বলে তারারা যেন আরও বেশি চমক মারছে। রামবিলাস একটা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে এল। অনেক রকম এতাল বেতাল চিন্তা ঘুরছিল তার মাথায়। চারদিন পরে মহালয়া, তারপর ঝালুয়া জুড়ে পুজোর বাজনা বাজবে। পুজোর পরে বাবুর ছেলেমেয়েরা আসবে বিজয়া করতে। প্রতিবারই আসে। দু'চার দিন থেকেও যায়। জোর হল্লাগুল্লা চলে বাড়িতে। পুজোর আগেই ঘরগুলো সব ভাল করে সাফ করতে হবে। পিছনের ঘর দুটো বহু দিন বন্ধ পড়ে আছে, লছমিকে সঙ্গে নিয়ে কাল থেকেই নেমে পড়বে কাজে। কুয়োর কপিকলটার দড়ি ছিঁড়ে গেছে, জল তুলতে কষ্ট হচ্ছে বলে, কাল বাজার থেকে মনে করে দড়ি কিনতে হবে। গাঁদার চারা লাগানোর জমিটাতেও আরেক বার নিড়েন দেওয়া দরকার।

হঠাৎই একটা বেখাপ্পা ভাবনা ধেয়ে এল রামবিলাসের মনে। লছমির একটা বাচ্চা হলে বেশ হয়। সরবতিয়ার সঙ্গে তো চিরকাল দূর থেকেই সংসার করেছে, বালবাচ্চা নিয়ে রামবিলাসের সেভাবে ঘর করা হল কই।

লছমির বাচ্চা খেলে বেড়াবে রামবিলাসের ঘরে। বসে বসে দেখবে বুড়ো রামবিলাস। খেলতে খেলতে বাচ্চাটা ছুটে আসবে রামবিলাসের কাছে। আধো আধো গলায় জিজ্ঞাসা করবে,—ঝালুয়া তোমার এত পেয়ারা কেন বাবুজি?

বুড়ো রামবিলাস হাসবে মাথা নেড়ে। বলবে,—আপ্ যো এঁহি মুঝে মিলা জি।

তিলাইদিঘি পুরো একটা পাক দিলে পাক্কা এক মাইল। পূর্ণেন্দু হিসেবটা জানে। কিন্তু এই পথটুকু কিছুতেই আড়াই মিনিটের কমে ঘুরে আসতে পারছে না সে। আরও গতি বাড়াতে হবে। আরও। আড়াই মিনিটটাকে দু'মিনিটে নামাতে হবে। হবেই।

বড় পিপুল গাছটার পাশে এসে পূর্ণেন্দু সাইকেলটা আরেক বার ভাল করে পরখ করে নিল। চাকার পাম্প ঠিকই আছে, কিন্তু এ তো আর রেসিং সাইকেল নয় যে পেশাদারি নিপুণতায় সাঁই সাঁই ছুটবে। এ হল গিয়ে অফিস কাছারি করা কেরানি সাইকেল, বাবার রিটায়ারমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যেও কেমন নিরাসক্ত ভাব এসে গেছে। প্যাডেলে চাপ মেরে যতই হাঁটু অবশ করে ফেলো, চাকা দুটো নিজের খেয়ালেই ঘুরবে। সাইকেলটাও এখন বোধহয় ঘরে বসে পেনশন খেতে চায়।

উপায় নেই, এই সাইকেল নিয়েই পূর্ণেন্দুকে লড়ে যেতে হবে। চাইলেই বা রেসিং সাইকেল সে এখন পাবে কোথায়? অন্তত ঝালুয়ায় তো পাবে না। পঞ্চাশ মাইলের রেসে গোটা ঝালুয়া থেকে পূর্ণেন্দু ছাড়া আর কেই বা নাম দেয়!

মিলিটারি চেহারার এক বুড়ো পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বুড়োটাকে চেনে পূর্ণেন্দু। মনোময় সরকার না সরখেল কী যেন নাম। খুব বেশি দিন আসেনি ঝালুয়ায়। কালীপুজোয় চাঁদা চাইতে গেলে এককথায় মোটা চাঁদা দিয়ে দেয়। কথাও বলে হেসে হেসে। কিন্তু প্যান্ডেল মাড়ায় না। একটু যেন খিটকেল ধরনের! রোজ ভোরে পূর্ণেন্দু যখন সাইকেলে চক্কর দেয়, কেমন কটকট করে তাকিয়ে থাকে লোকটা!

পূর্ণেন্দুকে পার হতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল বুড়ো,—কী হে, তুমি থেমে পড়লে যে?

পূর্ণেন্দু সাইকেল স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে পিছনের চাকার স্পোকে চাপ দিচ্ছিল। বনবন ঘুরছিল চাকাটা। ডাক শুনে তাকাল,—আপনি আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ তুমি। তুমি ছাড়া এখানে আর আছে কে? হঠাৎ থামলে যে আজ?

কৈফিয়ত চায় নাকি! বাড়িতে কৈফিয়ত, রাস্তাঘাটে কৈফিয়ত, বন্ধুবান্ধবদের কাছে কৈফিয়ত, টিউশনি বাড়িতে কৈফিয়ত, শেষে এখন এই বুড়োকেও কৈফিয়ত দিতে হবে! যথেষ্ট বিরক্ত হলেও রাগটা দেখাল না পূর্ণেন্দু। ঝালুয়ার ভোরে তিলাইদিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রেগে ওঠা মানায় না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল সাইকেলটা একটু টেস্ট করছিলাম। কেন বলুন তো?

—তোমার দৌড়ের সঙ্গে আমার হাঁটার একটা সম্পর্ক আছে যে। তোমার আট পাক ঘোরা হলে আমার মর্নিংওয়াক শেষ হয়। তুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলে আমাকে বেশি হাঁটতে হবে না?

পূর্ণেন্দু হেসে ফেলল,—সরি। আমি দাঁড়িয়ে পড়লে অন্যের অসুবিধে হয়, জানা ছিল না। এ বার থেকে মনে রাখব।

—হ্যাঁ। মনে রেখো। আর শোনো, চক্কর মারতে মারতে হঠাৎ থেমে গেলে দমে ঘাটতি পড়ে। নতুন করে মাসল্‌গুলো বুস্টআপ করতে অনেক সময় লেগে যায়। এমনিতেই তোমার পায়ের মাসল্ তেমন পাওয়ারফুল নয়, দমে টান পড়লে তো এ বার ফিফথ্ পজিশানও জুটবে না।

পূর্ণেন্দু অবাক,—আপনি আমার গত বারের রেস দেখেছেন?

ঘাড় দুলিয়ে হাসছে বুড়ো,—বাহ্, তুমি ঝালুয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছ, দেখব না? তোমার আরেকটা ডিফেক্ট আছে। চালানোর সময়ে বডিটাকে অত বেন্ড্ করো কেন? লং ডিস্ট্যান্সে ওতে কোমরে স্ট্রেন পড়ে। বডিটাকে খানিকটা আর্চ

করো। ধনুক হয়ে যাও। হাতের প্রেসারটা এমনভাবে হ্যান্ডেলে রাখো যাতে অটোমেটিকালি তোমার পা আরও জোরে ঘুরতে চায়।

ফাঁকতালে বুড়ো দিব্যি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণেন্দু প্রশ্ন করল,—আপনিও সাইক্লিং করতেন নাকি?

—পূর্বাশ্রমের কথা নিয়ে আমি আলোচনা করি না। যা বললাম শোনো। দেওয়ালির দিন উপকার পাবে। ঘাড় গোঁজ করে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে অন্যদের হাসি দেখতে হবে না।

বুড়ো আবার হাঁটা শুরু করেছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োকে দেখল পূর্ণেন্দু। ঠিক উপদেশ নয়, আরও কিছু যেন আছে বুড়োর কথায়। অনেকটা যেন পূর্ণেন্দুর নিজেরই অন্তরের কথা বলে গেল বুড়ো।

পূর্ণেন্দু সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিল। রডের সমান্তরাল বডিটাকে ঝুঁকিয়েও কী ভেবে খানিকটা সোজা হয়ে নিল, শরীরের ভর ছাড়ার চেষ্টা করল হ্যান্ডেলে। সত্যিই তো, পায়ের চাপ অনেকটা কমে গেল যেন! সাইকেলও ছুটছে বাঁইবাঁই!

এক পাক পূর্ণ করে পূর্ণেন্দু ঘড়ি দেখল। পুরো আট সেকেন্ড টাইম কমে গেছে!

চোখে দেখেও পূর্ণেন্দুর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। এত দিন ধরে প্র্যাক্টিস করছে সে, দশ সেকেন্ড টাইম কমাতে এক মাস লেগে যায়। আর আজ হঠাৎ বুড়োর একটা কথাতেই একেবারে আট সেকেন্ড! ধুস্, বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও তো শক্তি একটু বেশি সঞ্চয় হয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় পাক ঘুরে পূর্ণেন্দু আরও অবাক হল। আরও তিন সেকেন্ড কমেছে! একি ভোজবাজি নাকি!

তৃতীয় পাক ঘুরল পূর্ণেন্দু। চতুর্থ পাক। পঞ্চম পাক। না, সময় আর কমানো যাচ্ছে না, তবে শরীরটা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক ঝরঝরে লাগছে আজ। সপ্তম পাক দেওয়ার সময়ে বুড়োটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য খুঁজল পূর্ণেন্দু। নেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। কুছ পরোয়া নেই, কাল তো আবার আসবেই।

তিলাইদিঘির জল থেকে একটা ভাপ উঠছে। দিঘির বুকে হালকা কুয়াশা কুয়াশা ভাব। এখানে কাপড়চোপড় কাচা হয় না, ঝালুয়ার লোকজন শুধু স্নান করতে আসে এই জলে। জলটিও ভারী টলটলে। নরম এক সবুজে আভা লেপটে থাকে গায়ে। চার পাশ ঘিরে ঝালুয়ার যত অফিস। সরকারি অফিস। বেসরকারি অফিস। থানা। ব্যাঙ্ক। ভোরে এখন ঘুমোচ্ছে বাড়িগুলো, আরও কয়েক ঘণ্টা পরে প্রাণচঞ্চল হবে পাড়াটা।

কুড়ি পাকের পর থেকে একটু একটু করে ক্লান্ত হচ্ছিল পূর্ণেন্দু। হাঁটুতে নয়, ফুসফুসে। কিন্তু এখন থামা যাবে না। পঁচিশ পাক তার আজকের শিডিউল। প্রত্যেক দিনই একটা করে পাক বাড়াচ্ছে সে। এমনভাবে চার্ট তৈরি করেছে, যাতে কালীপুজোর পাঁচ-সাত দিন আগেই টানা পঞ্চাশ পাকে রপ্ত হয়ে যায় শরীর। তারপর একদিন বিশ্রাম, একদিন পঞ্চাশ পাক। একদিন বিশ্রাম, একদিন পঞ্চাশ পাক।

ব্যস্, মহড়া শেষ। পূর্ণেন্দু প্রস্তুত।

ফেরার পথে আশপাশের অফিসগুলোর দিকে একবার হিংস্র চোখে তাকিয়ে নিল পূর্ণেন্দু। এই সব অফিসের একটাতেও ঠাঁই হয়নি তার। বি.এ. পাশ করার পর প্রতিটি দরজায় ঘুরে ঘুরে জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেছে, একটা চাকরি জোটেনি। এদের ওপর প্রতিশোধ নিতেই এবারকার রেসটা জিততেই হবে পূর্ণেন্দুকে। ফার্স্ট প্রাইজটা পেলেই জীবনের গতিপথ বদলে যায় পূর্ণেন্দুর। ফার্স্ট প্রাইজটা কম নয়, অনেক টাকা। দশ হাজার। ওই টাকায় পূর্ণেন্দু লটারির দোকান দেবে একটা। ঝালুয়ায় লটারি-ব্যবসার এখন খুব রমরমা, ফেলে ছড়িয়ে হাতে দেড় দু'হাজার টাকা থাকবে প্রতি মাসে। শুধুমাত্র গোটাকতক টিউশনির টাকায় আর টানতে পারছে না পূর্ণেন্দু।

বেলা বেড়েছে।

পূর্ণেন্দু বাড়ি ফিরে সাইকেলটা রাখল বারান্দায়। আড়চোখে দেখে নিল বাবা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে, রোজকার মতোই কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে পূর্ণেন্দুকে দেখে নিল একবার,—কী, বাবুর কসরত শেষ হল?

পূর্ণেন্দু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল,—হল।

—আমার কথাটা মনে আছে?

—কী কথা?

—বাহ্, ভুলে মেরে দিয়েছ? কোথায় যে মন থাকে! তোমাকে একবার সান্যালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম না?

—আমার অত সময় হবে না। দুপুরে টিউটোরিয়াল হোমে ক্লাস নিতে হবে।

—তা সময় হবে কেন? টিউশনিতে গেঁথে গেলে আর কি চাকরির চিন্তা মাথায় থাকে।

—সান্যালবাবুর কাছে গেলেই চাকরিটা হবে?

—গিয়ে দেখতে দোষ কি?

পূর্ণেন্দুর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। চাকরির চেষ্টায় তার ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু এ কথা বাবাকে বলা মানেই কুরুক্ষেত্র আহ্বান করা। বাবা দুটো চিমটি কাটবে,

সেও দুটো পটকা ছুঁড়বে, ঘরের ভেতর থেকে ভাইবোনেরা খিকখিক হাসবে, মা সিঁটিয়ে থাকবে রান্নাঘরে, এ-ই তো এখন এ বাড়ির দৈনন্দিন চিত্র। পেটে আগুন জ্বলছে, এখন এসব কি ভাল লাগে?

চটপট কুয়া থেকে জল তুলে স্নান সেরে নিল পূর্ণেন্দু। মা আজ তার জন্যে জলখাবারে একটা ডিমসেদ্ধ রেখেছে। গোটা ছয়েক আটার রুটি, আলুর তরকারি আর ডিমটা খেয়ে পূর্ণেন্দু বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বাদামতলার দিকে এগোচ্ছিল পূর্ণেন্দু। বাদামতলা ঝালুয়ার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, বাজার হাসপাতাল পেরিয়ে আরও খানিকটা যেতে হয়। ক্লাস সেভেনের একটা ছাত্র আছে বাদামতলায়, তাকে দিয়ে শুরু হয় পূর্ণেন্দুর টিউশনির দিন।

বড় রাস্তায় এসে হঠাৎ ওপারে চোখ আটকে গেল পূর্ণেন্দুর। রুমঝুমের মা না!

হাতে একটা ভারী ব্যাগ নিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে কবিতা। থেমে থেমে। দেখেই বোঝা যায় হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

পূর্ণেন্দু দ্রুত রাস্তা পার হল,—আপনি বাজারে এসেছিলেন আজ?

কবিতা চমকে তাকাল,—ও, মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ ... মানে ... আপনাকে দেখতে পেলাম। পূর্ণেন্দু সামান্য তোতলাল, —আমি তো এ দিকেই থাকি। শিবমন্দিরের পাশের গলিতে।

—জানি। কবিতা একটু হাসল,—বকুলের শরীরটা ভাল নেই। আমাকেই বাজারে আসতে হল।

—দিন। থলিটা আমার হাতে দিন।

—না না, ঠিক আছে। আমি, পারছি।

—দিন না। আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি। এগিয়ে দিই একটু।

কবিতার হাত থেকে ব্যাগটা প্রায় কেড়েই নিল পূর্ণেন্দু। পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। কথা বলছে টুকটাক।

কবিতা জিজ্ঞাসা করল,—আপনার ছাত্রীর প্রগ্রেস কেমন দেখছেন? কিছু শিখবে টিখবে বলে মনে হয়?

—কেন শিখবে না? রুমঝুম খুব ভাল মেয়ে। এখনই কার্সিভ রাইটিং বেশ ভাল পারছে।

—পারলেই ভাল। যা চঞ্চল। সব সময়ে ছটফট করছে।

পূর্ণেন্দু আবার বলল,—না না। রুমঝুম খুব ভাল মেয়ে।

কবিতা চুপ করে গেল। বেশ খানিকক্ষণ নীরব। হঠাৎই আনমনে বলল,— মেয়েটার জন্য সেভাবে তো ঠিক সময় দিতে পারি না। সারা দিন কাজের লোকের কাছে থাকে ...

পূর্ণেন্দু বলল,—ওটা মনে হয় রুমঝুমের অভ্যেস হয়ে গেছে।

—তা হয়েছে। ওর জন্মের আগে থেকেই তো কাজ করছি আমি। তবু ... কী একটা যেন বলতে গিয়েও কবিতা থেমে গেল।

পূর্ণেন্দু কবিতাকে দেখছিল। কবিতার চোখ দুটো খুব বড় নয়, তবে ওই চোখে সব সময়ে একটা ভাষা ফুটে থাকে। ভাসানোর দিন দুর্গাপ্রতিমার চোখে যে ভাষা থাকে, ঠিক যেন তেমনটাই। পূর্ণেন্দুর কেমন গা ছমছম করে। কী একটা হতে থাকে ভেতরে! কী যেন! মাজা রং, ছোট্টখাট্টো চেহারা, পানপাতা মুখ, ওই মহিলার এক গোপন দ্যুতি একলক্ষ চুম্বকের মতো টানতে থাকে পূর্ণেন্দুকে। কবিতার সঙ্গে তার কথা হয় খুব কম। রুমঝুমকে যখন পড়ায় পূর্ণেন্দু, কবিতা ফেরে ক্লান্ত হয়ে। কোনও দিন বা দাঁড়িয়ে একটু কথা বলল পূর্ণেন্দুর সঙ্গে, কোনও দিন বা খেয়ালই করল না পূর্ণেন্দুকে। না করুক, ওই যে একবার রোজ শুভ্র বিষাদ শরীরে মেখে পূর্ণেন্দুর সামনে দিয়ে হেঁটে অন্দরে চলে যায়, তাতেই এক অদ্ভুত দুঃখী মোহে জারিত হতে থাকে পূর্ণেন্দু।

কবিতার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে পূর্ণেন্দুর। পৃথিবীর সব আনন্দ জড়ো করে যদি কবিতার হাতে তুলে দিতে পারত!

কিন্তু পারবেই বা কী করে? পূর্ণেন্দু নিজেই এত অক্ষম!

পূর্ণেন্দু খুব নিচু গলায় বলল,—আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কবিতা একবার চোখ তুলে দেখল পূর্ণেন্দুকে। ম্লান হাসল,—রুমঝুমের কথা বাদ দিন। আপনার কথা বলুন। গত মাসে কলকাতায় যে ইন্টারভিউ দিতে গেলেন, কোনও খবর এল?

—নাহ্। পূর্ণেন্দু জোর করে হেসে উঠল,—চাকরি বাকরি আমার কপালে নেই। ঝালুয়াতেই কিছু জোটাতে পারলাম না ...

—একটা ব্যবসা-ট্যবসা শুরু করে দিন না। চারদিকে কতরকম স্কিম টিম হচ্ছে...

—ওসবের জন্যও অনেক তদ্বির তদারকি লাগে। লোককে তেল মেরে মেরে আমার তেলের স্টক ফিনিশ, নতুন করে আবার তেল ঢালা পোষাবে না। পূর্ণেন্দুর স্বর দৃঢ় হল,—তবে ব্যবসাই করব ঠিক করেছি। আশা করছি একটা জায়গা থেকে টাকা পেয়েও যাব।

—হুঁউ?

কবিতা কি বিশ্বাস করল না কথাটা?

আবেগের মাথায় হঠাৎ উচ্ছল হল পূর্ণেন্দু,—টাকাটা আমি পাবই। এ বার আমাকে কেউ হারাতে পারবে না।

কবিতা অবাক হয়ে তাকায়,—কীসে হারাতে পারবে না?

—আপনি জানেন না? ও, আপনি জানবেনই বা কী করে? আপনি তো গত বছর ঝালুয়ায় আসেননি। দেওয়ালির দিন ঝালুয়ায় একটা সাইকেল রেস হয়। বড় রেস, পঞ্চাশ মাইলের। তিলাইদিঘিকে ঘিরে পঞ্চাশ পাক। অনেক জায়গা থেকে কম্পিটিটর আসে। কলকাতা থেকেও।

—ও।

পূর্ণেন্দু কবিতার অনাগ্রহ লক্ষ্যই করল না। তুমুল উৎসাহে বলেই চলেছে,—কম্পিটিশনে ঝালুয়ায় মাত্র একজনই থাকে। আমি। জানেন, গত বারে আমি ফিফ্‌থ হয়ে গেলাম। চল্লিশ পাক অব্দি আমিই লিড করছিলাম, তারপর ... । প্রাইজমানিটা খুব ভাল। দশ হাজার। ওটা এ বার আমাকে পেতেই হবে।

কবিতা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

পূর্ণেন্দু নিজের ঘোরে ডুবে যাচ্ছিল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে তার লটারির দোকানটাকে। ঝালুয়ার বাজারে জ্বল জ্বল করছে নাম। গুড লাক। দোকানের ঝাঁপ ফেলার আগে রোজ একটা করে টিকিট সরিয়ে রাখবে পূর্ণেন্দু। প্রতিটি লটারির। যত্ন করে পকেটে রেখে দেবে টিকিটগুলো। তারপর একদিন ছুটতে ছুটতে কবিতার সামনে গিয়ে ফেলে দেবে একটা টিকিট। এই দেখুন, ভাগ্য ঘুরে যায়। এই দেখুন, আপনার নাম করে কেটেছিলাম। এই দেখুন, আমি আপনার ভাগ্য ঘুরিয়ে দিলাম।

পূর্ণেন্দুর হঠাৎ খেয়াল হল কবিতা অনেকটা পিছিয়ে গেছে। আবার পাশে আসার পর বলল,—আপনি কখনও দেখেছেন সাইকেল রেস?

কবিতা দু'দিকে মাথা নাড়ল।

—ভাবতে পারবেন না, ঝালুয়া জুড়ে সেদিন কী এক্সাইটমেন্ট! হাজার হাজার দর্শক দিঘির পাড়ে ভিড় করে, বিশাল শামিয়ানা, মাইকে গান, নাটুদা, সমরদা সমানে রিলে করে চলেছে ...বলতে বলতে থামল পূর্ণেন্দু,—আপনি শুনছেন না?

—কই, শুনছি তো।

—না। আপনি শুনছেন না। দেখেননি তো কোনও দিন, তাই বুঝতে পারছেন না। দারুণ রোমাঞ্চকর। কুড়ি পঁচিশটা সাইক্লিস্ট সাইকেলের ওপর ঝুঁকে বনবন সাইকেল চালাচ্ছে, সাঁ সাঁ টার্ন নিচ্ছে, কেউ কাউকে জায়গা দিচ্ছে না, এ ওকে কাটিয়ে বেরোচ্ছে ... দুজন তো গত বার ধাক্কা খেয়ে পুকুরের জলে ছিটকে গেল। আমি নেহাত স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম ...।

—হয়েছে, চুপ করুন। কবিতা আচমকা গলা উঠিয়েছে,—আমার স্পিড ভাল লাগে না মাস্টারমশাই।

পূর্ণেন্দু চুপসে গেল। কী বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না। খানিকটা দিশেহারার মতো বলল,—সাইকেল রেস আপনার ভাল লাগে না?

—আমার কোনও রেসই ভাল লাগে না। হাসপাতালের গেট এসে গেছে, পূর্ণেন্দুর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল কবিতা, আসি।

পূর্ণেন্দু মরিয়া হয়ে বলল,—আপনি আমার রেস দেখতে যাবেন না?

কবিতা আলগা ভাবে বলল—দেখি। এখনও তো দেরি আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চলে আসবেন। রুমঝুমকে আনবেন, ওর ভীষণ ভাল লাগবে। রোজ ভোরবেলা উঠে প্র্যাক্টিস করি, আপনারা কেউ যদি দেখতে না আসেন...

—বেশ। সে নয় দেখা যাবে। মায়াবী ছেলেটিকে এক ফালি হাসি উপহার দিল কবিতা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল শিশুগাছটার পিছনে।

পূর্ণেন্দুর বুকে একটা দ্রিম দ্রিম ধ্বনি বাজছিল। কবিতা আসবে। কবিতা পূর্ণেন্দুর জয় দেখতে আসবে। মন থেকে সমস্ত দুঃখ গ্লানি মুছে যাচ্ছে পূর্ণেন্দুর।

পূর্ণেন্দু নিজেকেই নিজে বলল,—আমি কিন্তু সেদিন শুধু রুমঝুমের মাস্টারমশাই থাকব না। সেদিন আমি পুরোদস্তুর পূর্ণেন্দু হয়ে যাব।

প্রাণেশ্বরী বকুলবালা, বহু কাল কাটিয়া গেল তোমার কোন সংবাদ পাই না। আশা করি ওঁ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। অনেক কষ্ট করিয়া তোমার বর্তমান কাজের বাড়ির সাকিন জোগাড় করিয়াছি। বেলঘরিয়ায় তোমার দিদি জামাইবাবুর বাড়ি গিয়াছিলাম, উহারা তোমার খবর দেন নাই। খুঁজিয়া(২) তোমার আগের কাজের বাড়ি গিয়াছিলাম, তাহারাও তোমার হদিশ দিতে পারিল না। উল্টে বলিল তুমি নাকি দুই শত টাকা অগ্রিম নিয়াছিলে, ফেরত দেও নাই। উহারা আমার নিকট টাকাটা দাবি করিয়াছিল। আমি দিই নাই। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কেন দিব বলো?

উঁউউহ্ প্রেমের একেবারে ধুচুকুনি! বাড়ির থেকে পাছায় লাথি মেরে বার করে দিয়ে এত দিন পর ধানাই পানাই! ব্যাটার মতলবটা কী? নরেন বিকৃত মুখে চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রাখল। হেলান দিয়ে বসল বালিশে। রমলারও কি এই সময়েই ঘরে না এলে চলছিল না?

রমলা টেরচা চোখে দেখছে নরেনকে,—কী লুকোলে বালিশের তলায়?

—ও কিছু না। অফিসের চিঠি। আমাকে দিয়েছে।

—অফিসের চিঠি তো লুকোবে কেন?

—লুকোইনি তো। রেখে দিলাম। তুমি ঘরে এলে, তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি।

রমলার চোখে তবু কুটিল সন্দেহ,—কী আছে তোমার চিঠিতে?

—এইই, ভাল ভাল কথা। নরেন ঝটপট বানিয়ে বলল,—আমার কাজ দেখে সরকার খুব খুশি। ঝালুয়ার লোক রিপোর্ট করেছে, আমার মতো কাজের পিওন তারা নাকি আর দেখেনি। সরকার ভাবছে আমাকে কোনও ইনক্রিমেন্ট দেওয়া যায় কি না। ইনক্রিমেন্ট মানে অনেক টাকা, বুঝলে? যদি পেয়ে যাই, প্রথম মাসে তোমাকে একটা নাকছাবি করিয়ে দেব। তোমার কত দিনের শখ ...

—না না, নাকছাবি করে পয়সা নষ্ট করতে হবে না। রমলা কিছুটা গলল যেন,—তুমি বরং আমাকে একটা দামি শাল কিনে দিও। কাশ্মীর থেকে শালওয়ালারা আসে, কী সুন্দর সুন্দর নকশা করা শাল থাকে ওদের কাছে। ঝুমার মা একটা কিনেছে। মাসে মাসে টাকা দিতে হয়। গায়ে লাগে না।

—তাও কেনা যায়। তবে নাকছাবিটা তোমাকে মানাত ভাল। নরেন উশখুশ করছে,—তোমার রান্নাবান্না হল?

—ডিমের ঝোল বসিয়ে এসেছি। এ বার রুটি করব। রমলা বাক্স খুলেছে। একটা পাতলা কাঁথা বার করে খাটে ছুঁড়ে দিল।

—এটা কী হবে?

—গায়ে দেবে।

—এখনও কাঁথা গায়ে দেওয়ার মতো ঠাণ্ডা পড়েনি।

—কে বলেছে? ভোরের দিকে বেশ শীত শীত করে। ঝালুয়ায় ঠাণ্ডা তাড়াতাড়ি পড়ে।

—পড়ে। কিন্তু এ বার পড়েনি। নরেন গাঁইগুঁই করল,—রাতে পাখাটা কমিয়ে দিলেই হয়।

—যা বলছি শোনো। তক্কো কোরো না। তোমার ঠাণ্ডার ধাত, কালও রাত্তিরে খ্যাকর খ্যাকর করে কাশছিলে।

ওটা তো বিড়ির কাশি।

—তাহলে বিড়িও খাবে না। রোগাভোগা মানুষ, যা বলছি তাই শুনবে। আগের বারের মতো বিছানায় শুয়ে পড়লে ভুগবেটা কে?

হুবহু ঝালুয়া থানার মেজ দারোগার গলা। একটা ছেলেপুলেও যদি হত, এত হুকুমদারি মেজাজ থাকত না মেয়েছেলেটার। নরেনের অবরে সবরে মায়াও আসে বাঁটার ওপর। স্বামী ছাড়া রমলার ঘরকন্নায় আর আছেই বা কী?

এই মুহূর্তে অবশ্য মায়া আসছিল না নরেনের। তার অন্য কাজ আছে। অনেক

জরুরি। রমলাকে ভাগানোর জন্য জোরে জোরে নাক টানল,—ডিমের ঝোল কি লেগে গেল না কি! কেমন যেন গন্ধ বেরোচ্ছে!

পড়িমরি করে ছুটল রমলা।

নরেন বিছানা থেকে চেঁচাল,—রুটি হলে আমাকে হাঁক দিও। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব।

দরজার দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে নিয়ে আবার চিঠিটা বার করল নরেন। হাতের লেখাটা বেশ কায়দার আছে। পেটে খানিকটা বিদ্যে আছে বলে মনে হয়। না কি নিজে লেখেনি? কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে? পোস্টাপিসের সামনে তো চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য লোকজন বসেই থাকে আজকাল। ঝালুয়া পোস্টাপিসেও গোপাল বলে একটা ছেলে আছে, বি.এ. ফেল, বসে বসে লোকের চিঠি মানি অর্ডার লিখে দেয়। গোপালের হাতের লেখাটা মুক্তোর মতো, এই লেখা তত সুন্দর নয়।

নরেন আগে এগোল। ...যাহাই হউক, শেষমেশ তোমার ভাঙন-খালির বাড়িতে গিয়া তোমার মায়ের হাতে পায়ে পড়িয়া ঠিকানা জোগাড় করিয়াছি। তাও তিনি সহজে দিতে চান নাই। আমাকে অনেক গালমন্দ করিয়া তবে দিয়াছেন। আমি মনে কিছু করি নাই। সত্যই তো আমি দোষী। আমি তোমার উপর অবিচার করিয়াছি। আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। যে কালনাগিনীর মায়ায় ভুলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিলাম, সে অতি নচ্ছার। তাহাকে আমি এক জোড়া বালা (রূপার), একটি সোনার চেন (এক ভরি), এবং একটি টিভি (সাদাকালো) কিনিয়া দিয়াছিলাম। সে সব কিছু লইয়া গত আষাঢ় মাসে চম্পট দিয়াছে। আমি ভুলেও জানিতে পারি নাই এক ইলেকট্রিক মিস্তিরির সহিত তাহার তলে তলে পিরিত চলিতেছিল। জানিলে আমি তাহাকে পূর্বেই দাউ দিয়া কাটিয়া দু'টুকরা করিয়া রাখিতাম। যাহাই হউক, উহারা এখন রাজপুরে ঘর বাঁধিয়াছে। লোক মুখে শুনিতেছি নাগিনী সুখে নাই। সে আবার আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে চায়। আমি তাহাকে ফিরত নিব না। কেন নিব বলো? সে আমার নামে অনেক বদনাম দিয়াছে। আমি নাকি আঁটকুড়া। আমি শয়তান। আমার তাহাকে সুখ দিবার মুরোদ নাই। তুমি আমাকে জানিতে, বিচার করিয়া বলো কথাগুলি কি মিথ্যা নয়?

নাহ্, রমলা কিছুতেই মন দিয়ে চিঠিটা পড়তে দেবে না। আবার ঘরে আসছে। চায়টা কী?

নরেন চিঠি লুকিয়ে কেঠো হাসি হাসল,—আবার কী বার করতে এলে?

রমলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল,—সত্যি বলো তো কী পড়ছ তুমি?

—কী আবার? চিঠি।

—চিঠি তো দেখতেই পাচ্ছি। কোমরে হাত রেখে নরেনের সামনে এল রমলা,—আবার কারুর প্রেমপত্তর সরিয়েছ না কি?

নরেনের এই অভ্যেসটি আছে। মোটা খামের চিঠি দেখলেই নাম ঠিকানা খুঁটিয়ে দেখে, গন্ধ শুঁকে প্রেমের চিঠি কি না শনাক্ত করে নেয়। প্রেমপত্র হলে আগে নিজে বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ে নেয়, তারপর আমার খামের মুখ এঁটে পরের দিন পৌঁছে দেয় যথাস্থানে। এক আধ বার রমলাকেও পড়ে শোনানোর চেষ্টা করেছে, বেরসিক রমলা দু'এক লাইন শোনার পরই কানে আঙুল দেয়। খরখর করে বলে,—ছি ছি। এই সব অসভ্য কথা তুমি পড়ছ বসে বসে?

একবার মোক্ষম বিপদেও পড়েছিল নরেন। মগরায় পোস্টেড থাকার সময়ে সেখানকার লালু ডাক্তারের ছেলে রজতেন্দ্রকে চিঠি লিখেছিল তার নতুন বৌ শীলা। বাপের বাড়ি থেকে। নতুন বৌয়ের চিঠি বেশি রগরগে হয়, খুব উৎসাহ নিয়ে নরেন চিঠিটা এনেছিল বাড়িতে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর যেই না খাম খোলা, অমনি রমলা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে। একটুখানি উল্টে দেখেই সে কী চিৎকার! শীলা কে? সে এক কেচ্ছার একশেষ! রাত দুপুরে বাসন ছুঁড়ছে! শাঁখা ভাঙছে ঠুকে ঠুকে! কয়লা ভাঙার হাতুড়ি নিয়ে তাড়া করেছে নরেনকে!

নরেন আজ পর্যন্ত ভেবে পায়নি, যে ছেলের নাম অত সুন্দর, রজতেন্দ্র, যার ডাকনাম বিলু, তাকে তার বৌ কোন হিসেবে 'আমার নরেনসোনা' বলে সম্বোধন করে! কত কষ্টে যে সেবার খামটার ওপর রজতেন্দ্রর নাম দেখিয়ে টেখিয়ে সামলাতে পেরেছিল রমলাকে।

নরেন আজ একটু চালাকি করতে চাইল। নির্বিবাদে বলল,—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। এটা অফিসের চিঠিটা নয়, এটা লাভলেটার। কে এক কার্তিক কোন্ এক বকুলবালাকে লিখেছে।

রমলার সন্দেহটা নিভল। টেবিলে রাখা পানের বাটা থেকে পান বার করে সাজছে। মুখে পুরে বলল,—থাকে কোথায় সেই বকুলবালা?

নিপুণ অভিনেতার মতো খামটা তুলে ঠিকানা জোরে জোরে পড়ল নরেন,—বকুলবালা দাসী। কেয়ারঅপ্ কবিতা মজুমদার। কোয়ার্টার নম্বর জি টু। ঝালুয়া হাসপাতাল ...

রমলা শুনল, কি শুনল না, বোঝা গেল না। বলল,—রুটি হয়ে গেছে। খাবে চলো। বলতে বলতে দরজায় গিয়ে ফিরে তাকিয়েছে,—তোমার এই নোংরা অভ্যেসটা আর গেল না।

নরেন খুক খুক হাসল,—অভ্যেসটা আছে বলেই তো রাতের বেলা ভাল লাগে আমাকে।

রমলা ঝপ করে বলে উঠল,—ছাই লাগে। একটা বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা নেই...

—সে কি আমার দোষ? নরেনেরও আঁতে লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে, ভগবান যদি না চায়, আমি কী করতে পারি?

—ভগবানের দোহাই দিও না। কত বার বলেছি, ডাক্তারের কাছে চলো। একবার দেখিয়ে আসি।

—ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? হওয়ার হলে এমনিই হবে। নরেন মুখ খিঁচোল—বাচ্চা হলেই বা সংসারে কী এমন সুখ উথলে পড়বে, শুনি?

—তোমরা পুরুষমানুষ, তোমরা কি বুঝবে? বাইরে বাইরে আছ, আড্ডা ফূর্তি মারছ ...

—তুমিও যাও না, পাড়া বেড়াও। কে বারণ করেছে?

—আমার ভাল লাগে না।

রমলা মুখ কালো করে চলে গেল।

নরেনেরও মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। তাবিজ, কবজ, মাদুলি, এই থান, ওই মন্দির, কিছুই বাদ রাখেনি রমলা। শুধু ডাক্তারই বাকি। নরেনই এড়িয়ে গেছে। কেঁচো খুঁড়তে কোন্ সাপ বেরোয়! সংসারে কিছু কিছু গোপন থাকাই ভাল। অশান্তি বাড়ে না।

নরেন চিঠিটা বার করেও রেখে দিল। ভাল লাগছে না। দাওয়ায় এসে দাঁড়াল চুপচাপ। খানিক দূরে পূর্বপল্লির দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল, দত্তদের ফাঁকা জমিতে। লক্ষ্মীপুজো হয়ে যাওয়ার পরও বাঁশের কাঠামোটা রয়ে গেছে। দেখতে বড় শুনশান লাগে। কেমন একটা হাহাকারের মতো।

খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরে একটা পান মুখে দিল নরেন। রান্নাঘর থেকে বাসনকোসনের শব্দ আসছে, রাতেই সব ধুয়ে মুছে রাখে রমলা। রান্নাঘর ধোয় দু'বার করে। শুচিবাই।

নরেন অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিটা খুলল। নিশির ডাকের মতো টানছে চিঠিটা। ... বকুলবালা, আমি ভুল করিয়াছি। তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমার শত অত্যাচারেও আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইতে চাও নাই। অন্য পুরুষের প্রতিও তোমার মন যায় নাই। তবু আমি তোমাকে তাড়াইয়াছি। আমি মহাপাতকী। জানি বলিবার মুখ নাই, তবু বলি। তুমি আবার ফিরিয়া আইস। আশা রাখি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ তুমি দিবে। দিবে না, বকুলবালা? ইতি। তোমারই প্রাণেশ্বর শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র নস্কর। পুনশ্চ। তোমার উত্তর পাইলে আমি তোমাকে আনিতে যাইব। আমার ঠিকানা বদলায় নাই।

চিঠিটা মুড়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল নরেন। তারপরই পেট গুলিয়ে হাসি

উঠে এসেছে। শালা কার্তিক চন্দ্র জানেই না, বকুলের লাভার বকুলের হাতে পৌঁছে না দিলে এ চিঠি কোনও দিনই পাবে না বকুল। আর একবার যখন নরেনের জিম্মায় এসে গেছে, তখন এ চিঠি পৌঁছবেও না। শালা, দিব্যি সুখে নরেন একটা আশনাই চালাচ্ছে, তাকে কি না ব্যাগড়া দেয় কোন্ সোনারপুরের কার্তিক।

মৌজ করে একটা বিড়ি টেনে নরেন শুয়ে পড়ল। নিশ্চিন্তে। শেষ রাতে এক আজব স্বপ্ন দেখল নরেন। পোস্ট অফিসের সিঁড়িতে গোপালের সামনে উবু হয়ে বসে আছে সে। চিঠি লেখাচ্ছে। মুক্তোর অক্ষরে। প্রাণেশ্বরী রমলাবালা, আমার শত অনাচারেও আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাও নাই। অন্য পুরুষের প্রতিও তোমার কখনও মন যায় নাই। তবু আমি তোমাকে তাড়াইয়াছি। তুমি আবার ফিরিয়া আইস। আমাকে কি তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ দিবে না, রমলাবালা? চিঠি শেষ করে আবার পুনশ্চ লেখাল নরেন। ... আমি বকুলবালাকে ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই।

ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে খুব এক চোট হেসে নিল নরেন। কী খিটকেল স্বপ্ন রে বাবা! মাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়া নরেন চিঠি লেখাচ্ছে গোপালকে দিয়ে! রমলা তাকে ছেড়ে গেছে। বকুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই! মাইরি আর কি।

পোস্ট অফিস থেকে চিঠির ঝোলা নিয়ে নিত্যকার মতো চলে এল নরেন। হাসপাতাল কোয়ার্টারে। ঘোড়ানিমের কাছে এসে হাঁটু কেঁপে গেল। বাচ্চা মেয়েটা বারান্দার সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে! তার পাশে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে বকুল!

নরেন এগোবে, কি পিছোবে ভাবছে, বকুল নেমে এল তরতর, পালাও কেন গো পিওনবাবু?

নরেন আমতা আমতা করল,—খুকি যে আজ বসে আছে?

—আর বোলো না। ওর সেই দাদুর বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছে। দাদুর ছেলে, ছেলের বৌ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি। দাদুর এখন রুমঝুমের দিকে তাকানোর সময় কোথায়? দেখছ না মেয়ে কেমন ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে?

—হ্যাঁ, আপনজন এসে গেলে কে আর পরকে মনে রাখে। ঠিক আছে। আমি তবে যাই।

—যাই-যাই করছ কেন? দু'দণ্ড বোসো না। ঘরে না হয় না-ই হল, বারান্দাতেই বসলে!

নরেন গোমড়া হল,—তা ওই বুড়োর বাড়ির লোকজন কত দিন থাকবে?

—সে আমি কী করে বলব? বকুল ঘুরে দেখে নিল রুমঝুমকে,—শহর থেকে

এসেছে তো, নিশ্চয়ই দু'চার দিনের বেশি ঝালুয়ায় মন টিকবে না।

—দু'চার দিন! সে তো অনেক সময় রে বকুল! এতদিন আমার কাটবে কী করে?

—কেন, চিঠি বিলি করে। সেটাই তো তোমার কাজ গো। বকুল চপল হাসছে,—আজ তোমার খুব বেশি তেষ্টা মনে হয় পিওনবাবু?

নরেনের রাগ হয়ে গেল,—ঠাট্টা করতে হবে না। যাচ্ছি আমি।

—আহা, রাগো কেন? এসো, আজ নয় মনে মনে কথা বলি।

—আমি বারান্দায় বসব না। কে কোথায় দেখবে ...

—কোয়ার্টারের পিছনে আমগাছ তলায় চলো তবে। ওখানে কেউ দেখবে না। বকুল উচ্ছল হাসছে,—দাঁড়াও, রুমঝুমকে বলে আসি।

ছাইগাদার পাশে কোয়ার্টারের পিছনে একটা বেঁটে কলমের আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ ঘন পাতা গাছটার। ছায়া ভারী সুশীতল। গায়েই হাসপাতালের পাঁচিল। উঁচু। নির্জনতাই নির্জনতা এখানে।

গাছতলায় বসেছে দু'জনে। বেশ খানিকটা তফাত রেখে।

বকুল বলল,—কী হ'ল, এখনও মন খারাপ?

নরেন হাসল,—তোকে দেখলে মন খারাপ আরও বেড়ে যায় রে।

—কেন?

—কি জানি! মনে হয় আজ আছিস, কাল হয়তো থাকবি না।

—মরে যাব বলছ?

—আরও কত কী তো হতে পারে।

—কী রকম?

—ধর্ তুই এখান থেকে চলে গেলি।

—না বাবা, এ বৌদি খুব ভাল। এ বাড়ির কাজ এখন ছাড়ছি না।

—যদি তোর বৌদি বদলি হয়ে যায়?

—সবে তো এল, এত তাড়াতাড়ি হবে না।

—ধর্, হঠাৎ যদি বদলি হয়েই যায়?

—কখ্খনো হবে না। কেন কু ডাকছ?

নরেন পাঁচিলের দিকে তাকাল। তারপর মজা করার সুরে বলল,—ধর, এমন যদি হয়, তোর বর তোকে নিতে চলে এল?

—কে বর?

—তোর বর?

—তোর বর। কার্তিক।

বকুল হি হি হেসে উঠল,—আহা, আমার কি আর সেই কপাল হবে গো?

নরেন সামান্য ধাক্কা খেল,—বর এসে ডাকলেই চলে যাবি?

—বারে, সোয়ামি নিজে নিতে এলে তাকে না বলে দেব? বকুলের হাসি বাড়ছে।

—সেই লোকটা তোকে মারধর করত, তোকে তাড়িয়ে দিল, অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করে, তারপরও তুই...। নরেনের গলায় কথা আটকে গেল।

—সে তো পুরুষমানুষরা করেই। বকুল হাসিতে দুলছে,—তুমিও তো তোমার বৌকে ঠকাও, সেটা বুঝি অন্যায় নয় পিওন-বাবু?

হুট করে রাত্তিরে স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল নরেনের। জোর করে মন থেকে সরাতে চাইল স্বপ্নটাকে,—তুই আমাকে ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারটার সঙ্গে তুলনা করলি? আমি একটা লেখাপড়া জানা লোক, সে একটা মোদো মাতাল....!

তো কী? হাসির দমকে গোটা শরীর কাঁপছে বকুলের—তার শরীর স্বাস্থ্য কত ভাল! তুমি তো আমাকে বেড়েই পাও না!

ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হল নরেন। যা ভাঙবে, তা ভাঙুক। পকেট থেকে খাম খোলা চিঠিটা বার করে ছুঁড়ে দিল বকুলের কোলে।

বকুলের হাসি স্তব্ধ হল,—কী এটা?

—তোর কার্তিকের চিঠি। কাল পোস্টাপিসে এসেছে।

কেউ যেন ব্লটিংপেপারে বকুলের মুখ থেকে রক্ত শুষে নিল,—কী আছে ওতে?

—নিজেই পড়ে দ্যাখ।

—আমি অত পড়ালেখা জানি না। তুমি তো পড়েছ, তুমিই বলো না।

—তোর কার্তিক তোকে আবার ফেরত নিতে চায়। সেই মেয়েছেলেটা তাকে ছেড়ে পালিয়েছে।

শুনল বকুল। পাথরের মতো নিশ্চুপ। ডান হাতে সজোরে চেপে আছে খামটা।

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে ভূতগ্রস্তের মতো হাসল,—আর কি। তোর তো এবার সুখের দিন। কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিস, কার্তিক এসে তোকে নিয়ে যাবে।

নরেন ফিরে যাচ্ছে। এক একটা পা যেন এক এক যোজন পথ। ঘাসভরা মাঠ রুক্ষ পাহাড়ের মতো এবড়ো খেবড়ো।

পিছন থেকে ডাক শুনে চমকে তাকাল নরেন।

বকুল কাছে আসছে,—দাঁড়াও পিওনবাবু।

চোয়াল শক্ত করল নরেন,—কী বলবি?

—রোজ চিঠি না দিয়ে তেষ্টা মেটাতে আসো। আজ হাতে করে আমার জন্য চিঠি আনলে, একটু সরবত খেয়ে যাবে না?

বকুলের স্বরে কি বিদ্রুপ? বকুল মজা করছে নরেনকে নিয়ে?

নরেন বলল,—আমার আর তেষ্টা নেই। আমি আর আসব না।

—বকুলের কাছে আসতে না চাও, এসো না পিওনবাবু। বকুল কারুর পথ চেয়ে থাকবে না। তা বলে যেন চিঠির দোহাই দিও না কখনও।

চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ছে বকুল। ভাসিয়ে দিল শূন্যে। নবীন হেমন্তের রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে কাগজের টুকরো। উড়ছে ঝালুয়ার বাতাসে।

উড়ছে। ভাসছে।

অবনীর ছায়া পড়ল দরজায়,—মহীদা, আপনি কি একবার অফিসে আসবেন?

মহীতোষ বিছানায় শুয়েছিল। চোখ বুজে। শেষ বিকেলে এই সময়টায় একটা ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মৌতাত আসে মহীতোষের। কদিনেই আবার অভ্যেসটা খারাপ হয়ে গেছে।

মহীতোষ পাশ ফিরল,—কেন রে?

—ঝালুয়া ফার্নিচার্সের গোবিন্দবাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

—তুইই কথা বলে নে। আমার আর বেরোতে ভাল লাগছে না।

—গোবিন্দবাবু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চান। বোধহয় কোনও অর্ডার টর্ডারের ব্যাপার। অবনী মাথা চুলকোল,—ওই ব্যাপারটাতেও হতে পারে।

—হুঁ। দু-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল মহীতোষ। উঠে বসল বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে উঠেছে মাথাটা। উফ্, দুর্বলতাটা কিছুতেই যাচ্ছে না। বলল,—ঠিক আছে, এখানে পাঠিয়ে দে। আর শোন, বাড়ি যাওয়ার আগে কারখানা ভাল করে বন্ধ করে যাস।

অবনী চলে গেল।

আলো বেশ কমে এসেছে। উত্তরের হাওয়াটাও পৌঁছে গেছে ঝালুয়ায়। পাতলা সুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে মহীতোষ ভাবল ঝালুয়ায় এবার কড়া ঠাণ্ডা পড়বে।

মহীতোষের ঘরের গায়েই কাচঘেরা বিশাল গোল বারান্দা। রঙিন কাচ। এলোমেলো চেয়ার পাতা আছে কয়েকটা। কাঠের। বেতের। একটা পুরোনো মলিন আরামকেদারা গড়াগড়ি খাচ্ছে পাশে। বারান্দার মধ্যিখানে আস্ত এক শুকনো চা গাছের ওপর প্রকাণ্ড এক গোল কাচ। সেটাই টেবিল। এখানে বসেই বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথা সারে মহীতোষ।

মহীতোষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, গোবিন্দ পালিত এল। একটা চেয়ার টেনে বসেছে,—কি হে, তুমি আর সুস্থটুস্থ হবে না নাকি?

মহীতোষ মৃদু হাসল,—কেন কাকা, আপনার আবার কী হল? আপনার মালটাল তো ঠিকই যাচ্ছে! আমি আপনাদের রেগুলার খবর রাখি।

—কিছু খবর রাখো না। তোমার লোক একরকম অর্ডার নিয়ে যায়, আর একরকম সাপ্লাই দেয়। নিজে একটু না দেখলে চলে? গত সপ্তাহে গামার কাঠের একটা অর্ডার দিয়েছিলাম, ছ সিএফটি মাল কম। তোমার অবনীকে বললাম, সে শুধু জিভ কাটে।

মনে মনে হাসল মহীতোষ। অবনী ঠিকই আন্দাজ করেছিল। নালিশের পর এবার বোধহয় রেটের ব্যাপারে চাপ দেবে।

বিনয়ী মুখে মহীতোষ বলল,—হ্যাঁ কাকা, ওটা আমি অবনীর কাছে শুনেছি। বিলে অ্যাডজাস্ট করে দেব।

—টাকাটা বড় নয় মহীতোষ, আসল হল গুডউইল। তোমার বাবার যেটা ছিল। গোবিন্দ পালিত মাথা নাড়ছে,—রণতোষদা কোথ্থেকে কোথায় উঠেছিল, সে তো আমি জানি। সবই তো গেছে তোমার, অন্তত এইটা সামলাও।

এ কথা আর কত শুনবে মহীতোষ? তার বাবার জীবনটাই তো গুডউইল। ছিল সামান্য এক ব্যাঙ্কের কেরানি, ব্যাঙ্ক ফেল করতে ব্যবসা ধরল। তারপর থেকে যাতে হাত দিয়েছে, তা-ই সোনা। স'মিল দিয়ে শুরু, তারপর লেটারপ্রেস, দার্জিলিং টি'র হোলসেলার, রেডিমেড পোশাকের দোকান, কী না করেছে! পার্টনারশিপে একটা কোল্ডস্টোরেজও বানানো শুরু করেছিল বাবা। আর মহীতোষ? বউ পালানো, ঘরকুনো, সর্বস্ব খোয়ানো এক মূর্তিমান ব্যর্থতা। স'মিলে আঠেরো জন লোক খাটত আগে, এখন কমে কমে সাতজন।

কী করবে মহীতোষ? তার যে ইচ্ছে-গুলোই অন্যরকম। তার আলপথ দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগে, নিশীথ রাতে তিলাইদিঘির পারে একা একা শুয়ে থাকতে ভাল লাগে, রাত জেগে কবিতার বই পড়তে ইচ্ছে করে, এগুলো কি তার অপরাধ?

পাতলা শ্বাস ফেলল মহীতোষ,—বাবার কথা বাদ দিন কাকা। তিনি ছিলেন কর্মী-পুরুষ, ক্ষণজন্মা মানুষ, আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান।

—তা কেন? তুমিও খুব ভাল ছেলে। ঝালুয়ার সবাই তোমার খুব সুখ্যাতি করে। শুধু আলসেমিটা একটু ঝেড়ে ফেলতে পারলে তুমিও চড়চড় করে উঠে যাবে।

সান্ত্বনা? মহীতোষ এবার শব্দ করে হাসল,—কিছু ভাববেন না কাকা, এবার সব ঝেড়ে ফেলব, ঝানু ব্যবসাদার হয়ে যাব। দেওয়ালিটা যাক, আর চার-পাঁচ দিন জিরিয়ে নিই।

—হ্যাঁ, শরীর একদম সুস্থ করেই বেরোও। ঝালুয়ার ম্যালেরিয়া খুব খারাপ। শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়। ষাটোর্ধ্ব মানুষটার গলায় অভিভাবকের সুর,—তোমার বাবার মতো শরীরের দিকে নজর না রেখেও খাটার কোনও মানে হয় না। আমরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলাম রণতোষদা ওভাবে ধুপ করে স্ট্রোকে মারা যাবে!

বারান্দা ঘরটায় আলো প্রায় নেই এখন। মহীতোষ উঠে আলো জ্বেলে দিল।

গোবিন্দ পালিত দম নিয়ে বলল,—তোমার কথা অবশ্য আলাদা। একার জীবন তোমার, কার জন্যই বা আর খাটতে ইচ্ছে করবে? কতবার বললাম আবার একটা বিয়ে থা করো, সংসার করলে ব্যবসাতেও মন লাগত।

মহীতোষ হা হা হাসল,—বললাম তো কাকা, আমি ঝানু ব্যবসাদার হচ্ছিই। আপনার আর কোনও কমপ্লেন থাকবে না, দেখবেন।

—আর হয়েছ। যার নয়ে হয় না, তার নব্বইতেও হয় না।

—তাহলে আর বলেন কেন কাকা? বোঝেন তো আমি বেশ আছি। চলে তো যাচ্ছে।

—ওই তোমার দোষ। যা ভাববে, তাই করবে। এই একটা ব্যাপারে তোমাদের বাপ ছেলেতে তফাত নেই। গোবিন্দ পালিত উঠেছে,—চলি। দেওয়ালির দিন তিলাইদিঘিতে আসছ?

—সে তো যেতেই হবে। ঝালুয়ার সম্মান বলে কথা।

গোবিন্দ পালিত চলে যাওয়ার পর ঝুম হয়ে চেয়ারে বসে রইল মহীতোষ। কেন যে বার বার তেতো কথা কচলায় মানুষ? কী সুখ পায়? বোঝে না কথাগুলো কোথায় বেঁধে মহীতোষকে?

মাঝেমধ্যেই মহীতোষের এক অদ্ভুত কথা মনে আসে। জীবনের খেলা কী বিচিত্র। বাবার সঙ্গে তার এত তফাত, তবু কোথায় যেন একটা চোরা মিলও রয়ে গেছে! মহীতোষের মা যখন মারা যায়, বাবার তখন মাত্র একত্রিশ! রঞ্জনাও মহীতোষকে ছেড়ে গেছে মহীতোষের একত্রিশ বছর বয়সেই। অথচ প্রায় একই ঘটনা দুজনকে দুদিকে ঠেলে দিল। মারা যাওয়ার পর মার গয়না বেচে ব্যবসা শুরু করল বাবা, কোন চূড়ায় পৌঁছে গেল তার ঠিকঠিকানা নেই। গাড়ি বাড়ি সুখ আরাম সব মিলিয়ে ঝালুয়ার এক জীবন্ত কিংবদন্তি। আর রঞ্জনা যখন গেল, তখন মহীতোষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কী যে কুহকে জড়িয়ে ফেলেছিল রঞ্জনা! তাকে তোয়াজ করতে গিয়ে একটার পর একটা ব্যবসা চলে গেল, শেষে আধতৈরি কোল্ডস্টোরেজের অংশটাও বেরিয়ে গেল হাত থেকে। কি, না সল্টলেকে জমি কেনা হবে, বাড়ি তোলা হবে। এই ম্যাটমেটে ঝালুয়ায় কি থাকতে পারে রঞ্জনা?

হলও সব। রঞ্জনার নামে। আর সেই জমি বাড়ি সব গুছিয়ে নিয়ে কলকাতার নিউ আলিপুরের মেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝালুয়ার আঙুল কাটা মহীতোষকে।

ডিভোর্স ফাইল করার আগে রঞ্জনা অবশ্য একবার এসেছিল ঝালুয়ায়। বলেছিল, মহীতোষ যদি চায় জমিবাড়ির ভাগ নিতে পারে। নগদ টাকায়। ডিভোর্সের পর রঞ্জনার তথাগত এসে দিয়ে যাবে টাকাটা।

ছিহ্। ওই টাকা ছুঁলে মহীতোষ কি আর নিজের কাছে মহীতোষ থাকত? তিলাইদিঘির জলে নিজের মুখের ছায়া আর দেখতে পেত কোনওদিন?

মাথাটা ধরে গেছে। একটু চা পেলে মন্দ হত না। রান্নাঘর বেশ খানিকটা দূরে, ঘরেই তাই স্টোভ রাখা আছে। মহীতোষ স্টোভে চায়ের জল চাপাল। কাজের লোক বিকেলের মধ্যে রান্নাবান্না সেরে চলে যায়, ইচ্ছে হলে নিজেই চা করে নেয় মহীতোষ।

গ্রিলের গেটে শব্দ হচ্ছে একটা। কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। একটা বাচ্চা কলকল করছে না?

মহীতোষ বারান্দায় এসেই ভীষণ চমকেছে,—কী কাণ্ড, আপনারা! হঠাৎ!

কবিতা কথা বলার আগে রুমঝুম চেঁচিয়ে উঠেছে,—তুমিই বুঝি ভাল কাকু গো?

কবিতা ঝটপট বলে উঠল,—মাস্টারমশাই আজ আসবেন না বললেন, ওকে নিয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। স'মিলটা দেখে মনে হল ...

—মোটেই না। রুমঝুম ভুরু পাকাল,—তুমি তো বেরোনোর সময়ই বললে আমাকে আজ একটা ভাল কাকুর কাছে নিয়ে যাবে!

বারান্দাঘরে ঢুকেই ছোটাছুটি শুরু করেছে রুমঝুম। এক কাচের জানলা থেকে অন্য কাচের জানলায় যাচ্ছে। দৌড়ে মহীতোষের ঘরে ঢুকে গেল। ঘর থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ছে,—স্টোভে কী করছ গো ভাল কাকু?

উত্তরটা কবিতাকে দিল মহীতোষ,—চা বসিয়েছি। খাবেন?

আলতো ঘাড় নাড়ল কবিতা,—আপনি বানাচ্ছেন?

—আমার সবই সেলফহেলপ। চা'ও ভালই বানাই। বারান্দার চেয়ারগুলোকে ব্যস্তভাবে ঠিকঠাক করে দিল মহীতোষ,—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

রুমঝুম মহীতোষের ঘর ভেদ করে ভেতরে চলে গেছে। দৌড়ে ঘুরে এল,—মা, মা, দেখে যাও কত বড় উঠোন।

রুমঝুম টানাটানি করছে কবিতাকে, মহীতোষ হেসে বলল,—যান না, দেখে আসুন না।

মহীতোষের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল কবিতা। দেখছে ঘরদোর। মেয়ের মুহুর্মুহু ডাকে গেল ভেতরে।

মহীতোষ চা ছাঁকছিল। কবিতা কেন এসেছে আজ? কপালে আজ একটা ছোট্ট কালো টিপ পরেছে কবিতা। একদম অন্যরকম লাগছে কবিতাকে। হাসপাতালের সেবিকা নয়, যেন অন্য কেউ। ঝালুয়ার লোকজনের দৌলতে মহীতোষের অতীত নিশ্চয়ই কবিতার এখন অজানা নয়। মহীতোষের কাহিনী শুনে আজ সরেজমিন করতে এল?

কবিতা রুমঝুমকে নিয়ে ফিরল। বসেছে বারান্দা ঘরে। রুমঝুম রঙিন কাচে চোখ লাগিয়েছে।

কবিতা বলল,—আপনার বাড়িটা তো ভারী অদ্ভুত! এত বড় বাড়ি, কিন্তু একতলা।

মহীতোষ চা নিয়ে এল,—বাবার খেয়াল। বাবার একতলাই পছন্দ ছিল।

—ওপাশেও একটা এরকম ধরনের বারান্দা দেখলাম না?

—সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখার নেশা ছিল বাবার। এইখানে বসে সূর্যোদয় দেখতেন বাবা, আর ওইখানে বসে সূর্যাস্ত। দেখেছেন তো ভেতরটা কেমন ইউ শেপ! এদিকে পুব...ওদিকে পশ্চিম...

—ভারী মজার খেয়াল তো!

—হ্যাঁ। বাবা বলতেন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত না দেখলে একটা দিন যে চলে গেল বোঝাই যায় না। আর দিন চলে গেল অনুভূতিটা না থাকলে পরের দিনের কাজের স্পৃহাটা আসবে কোত্থেকে?

কবিতা চোখে ঢেউ তুলল,—তা আপনি এদিকটা বন্ধ করে দিয়েছেন কেন? সূর্যোদয় দেখেন না?

মহীতোষ জবাব এড়িয়ে গেল,—চা কেমন হয়েছে?

কাপে চুমুক দিল কবিতা,—ভালই তো। আমার এরকম হালকা চা'ই পছন্দ। কী সুন্দর ফ্লেভার!

—বাবা অভ্যেসটা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। দার্জিলিং টি ছাড়া বাবা খেতেই পারতেন না।

কবিতা আড়চোখে টেবিলটা দেখল,—এটাও বুঝি বাবার শখ?

—ঠিক ধরেছেন। মহীতোষ হেসে ফেলল,—জলপাইগুড়ির চা বাগান থেকে বাবা এনেছিলেন। বাবার গল্প তো শুনেছেন নিশ্চয়ই। ঝালুয়ার দার্জিলিং টির হোলসেলার ছিলেন বাবা।

কবিতাও হেসে উঠেছে,—আপনার বাবার কথা থাক। নিজের কথা বলুন। আপনি এতদিন ছিলেন কোথায়? এই টানা এক মাস? পুজোর সময়েও আমাদের ওদিকে গেলেন না একবারও...?

মহীতোষের কৌতুক করতে ইচ্ছে হল। হঠাৎ শরীরটা যেন ঝরঝরে লাগছে। হাসি হাসি মুখে বলল,—আমার এক প্রিয়জন এসেছিল।

—ও।

—কে প্রিয়জন জিজ্ঞেস করলেন না? সে কিন্তু এখনও আমার কাছাকাছিই আছে।

কবিতা যেন সামান্য আড়ষ্ট হয়েছে আচমকা। ঘুরে ঘুরে দেখছে রুমঝুমকে।

মহীতোষ হাসতে হাসতে গলা চড়াল,—ম্যালেরিয়া হয়েছিল। খুউব ভোগাল এক মাস। যায় আসে, যায় আসে, ছাড়তে আর চায় না। অসুখের থেকে কে আর বেশি প্রিয়জন বলুন?

কবিতা বিস্মিত চোখে তাকাল,—তাই? আমি ভাবছিলাম...

—কী ভাবছিলেন?

—কিছু না। কবিতা চোখ নামিয়ে নিল,—ওষুধপত্র ঠিকমতো খাচ্ছেন তো? ব্লাড টেস্ট করাচ্ছেন?

—অসুখ শুনেই অমনি হাসপাতালের দিদিমণি হয়ে গেলেন? আরে বাবা, আমি এখন ভালই আছি। কয়েকদিন ধরে জ্বরটর আর আসছে না। মনে হয় প্রিয়জন এবার সত্যি সত্যি বিদায় নিল।

—তাও সাবধানে থাকবেন। এমনিই আপনার একটা বড় অপারেশন গেল...

—অসুখের কথা বাদ দিন তো। অন্য কথা বলুন। মহীতোষ হঠাৎ একটু প্রগলভ্ হয়ে উঠল, তারপর বলুন আপনাদের পুজো কেমন কাটল?

—ভাল। ভালই। আপনাদের ঝালুয়ায় বেশ সুন্দর পুজো হয়। হট্টগোল কম, সব পাড়ার পুজোতেই বেশ হোম্‌লি ভাব আছে ...

—এদিকে তো এবার রজত জয়ন্তী হল। এসেছিলেন?

—আপনাদের রবীন্দ্র নগরে তো? হ্যাঁ। মেয়ে কি আর ছাড়ে?

মহীতোষের বলতে ইচ্ছে হল, এখানে একবার এলেন না কেন? আমি যে গোটা পুজো আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

কবিতা যেন বুঝে ফেলল মহীতোষের মনের কথাটা। নিচু গলায় বলল,—ভেবেছিলাম আপনার খোঁজ করতে আসি, তারপর মনে হল আপনি হয়তো ঝালুয়াতেই নেই!

মহীতোষ বিমর্ষ মুখে বলল,—আমি ঝালুয়ার বাইরে যাই না। গত ন'বছরে আমি একটি বারও এই শহরের বাইরে পা রাখিনি।

কবিতা বুঝি ধাক্কা খেল একটু, চুপ হয়ে গেল।

রুমঝুম টেবিলের কাচের তলায় ঢুকেছে, টকটক টোকা মারছে চা গাছের কাণ্ডে। কাচের নীচ থেকে প্রশ্ন করল,—কাকু তোমার সব ঘরগুলোই তালা বন্ধ কেন গো?

—খুলতে গেলে হাঁপিয়ে যাই যে। মহীতোষ ঝট করে উঠে দাঁড়াল,—এ মা দেখুন, কী বিশ্রী স্বভাব আমার। আপনারা প্রথম দিন আমার বাড়িতে এসেছেন, তাও পুজোর পর, আমি কি না...। এক সেকেন্ড বসুন। বলেই প্রায় দৌড়ে ঘরে চলে গেছে মহীতোষ। ফ্রিজ থেকে একরাশ মিষ্টি বার করে বড় প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল,—আর কিছু খেতে চাইলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাব। নোন্‌তা কিছুই ঘরে নেই। তবে ডিম আছে, যদি খেতে চান তো ভেজে দিতে পারি।

রুমঝুম একটা সন্দেশ হাতে নিল,—ওমা, এ যে ঠাণ্ডা গো। মা, আমি কি ঠাণ্ডা মিষ্টি খাব?

কবিতা ভুরু জড়ো করল,—না, খাবে না।

—কেন খাক না। টাটকা মিষ্টি। আজই সকালে একজন দিয়ে গেছে।

—না না, সেজন্য নয়। সদ্য জ্বর থেকে উঠল তো।

—সেকি, কবে জ্বর হয়েছিল? ঠাণ্ডা লেগেছিল বুঝি?

—ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা। লক্ষ্মীপুজোর পর হঠাৎ তেড়ে জ্বর। তিন দিন ধরে টেম্পারেচার নামতেই চায় না। কবিতা মেয়েকে দেখে নিয়ে স্বর নামাল,—বোধহয় একটু মেন্টাল প্রবলেমও হয়েছিল।

—ওইটুকু মেয়ের মেন্টাল প্রবলেম?

—আর বলবেন না। কাকে যেন একটা দাদু পাতিয়েছে, আমি ডিউটিতে বেরোনোর পর রোজ সকালে তার বাড়ি চলে যেত। পাছে আমি বকাবকি করি, আমার কাছে সবই চেপে গেছে। তা সেই দাদুর বাড়িতে কারা যেন এসেছিল ... দাদু ভাল করে কথা বলেনি ... সেই অভিমানে মেয়ে ...। জ্বরের ঘোরে দাদু দাদু করে কাঁদছিল, তাই থেকেই তো জানতে পারলাম।

মহীতোষ কৌতূহলী হল,—দাদুটি কে? থাকেন কোথায়?

—ওই তো আমাদের ওখানে। শিমুলতলা ধরে একটু এগোলে বাগানঅলা একটা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি আছে, ওই অত দূর রোজ এই মেয়ে...

—বুঝেছি। দেবেনদের বাড়ি। বছর দু-তিন আগে বাড়িটা বেচে ওরা কলকাতায় চলে গেছে। যিনি কিনেছেন তিনি নাকি এক রিটায়ার্ড জাজ্‌।

—হতে পারে। তবুও দাদুরও মেয়ের ওপর খুব টান। বকুল গিয়ে খবর দিতেই দৌড়ে এসেছিলেন। দাদুকে দেখে মেয়েরও জ্বর ভ্যানিশ। কবিতা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল,—দাদু না এলে রুমঝুম আর দাদুর কাছে যেতই না, তাই না রে রুমু?

মহীতোষ আনমনে বলল,—কার সঙ্গে যে কীভাবে কার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

—হুঁ।

ছোট্ট এক ধ্বনি, তাতেই মহীতোষের বুক ছন্ করে উঠল। এতক্ষণের প্রগল্‌ভতা মুছে গেল নিমেষে। একটাও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আশ্চর্য, কথা না খুঁজে পেয়ে যেন বড় অস্বস্তি হচ্ছে মহীতোষের।

সহসা কবিতা মহীতোষের চোখে চোখ রেখেছে,—আপনি কবে আসছেন আমাদের বাড়িতে?

মহীতোষ চোখটাকে পড়তে চাইল। পারল না। বলল,—দেওয়ালির দিন যাব ভাবছি। পূর্ণেন্দুর রেসটা দেখতে বেরোব, তখনই...

—আপনার সাইকেল রেস ভাল লাগে?

—পূর্ণেন্দুকে ভাল লাগে। ছেলেটার কী জিদ! কী অধ্যবসায়।

—কি জানি বাবা। ওরকম একটা হিংস্র যান্ত্রিক দৌড়, এ ওকে পেছনে ফেলে এগোচ্ছে, সবাই এক সঙ্গে জিততে চাইছে...

—ওভাবে ভাবছেন কেন? এটা তো একটা খেলা।

—ওরকম মরিয়া খেলা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

—অন্যভাবেও ভাবুন। জেতা হারাটাই তো আর সব নয়, জয়ের চেষ্টা মানুষের মধ্যে একটা উইলফোর্স তৈরি করে।

—হবে।

—মানে? আপনি বলতে চান উইলফোর্সের কোনও মূল্য নেই?

কবিতা যেন কেমন ভাবে হাসল,—আপনার জেতার উইলফোর্স আছে?

মহীতোষ নিঃশব্দে বলল, নেই। আর নেই বলেই তো পূর্ণেন্দুকে দেখতে যাওয়া।

রুমঝুমকে কাছে টানল মহীতোষ,—কী গো, তুমি যাবে না মাস্টারমশাইয়ের রেস দেখতে?

—যাবে আবার না! যেদিন থেকে শুনেছে, সেদিন থেকে নাচছে।

—কিন্তু নিয়ে যাবে কে? তোমার মা তো যাবে না মনে হচ্ছে।

রুমঝুম কচি ভুরুতে কষ্ট করে ভাঁজ ফেলল,—কেন, তুমি নিয়ে যাবে।

—আমার সঙ্গে যাবে তুমি?

রুমঝুম পলকের জন্য মাকে দেখল, ক্ষণকাল মহীতোষকে। হঠাৎ মহীতোষের দু'হাত আঁকড়ে ধরেছে, যাব গো, যাব। মা না গেলে তুমি আর আমি যাব।

কাটা আঙুলের স্থানটিতে একটা শিরশিরে ভাব ছড়িয়ে পড়ছিল মহীতোষের। কবিতারা চলে যাওয়ার পরেও ভাবটা রয়ে গেল।

রাতে বিছানায় শুয়েও মহীতোষের বুকে অভিনব এক বোধ চারিয়ে যাচ্ছিল। কষ্ট নয়, আনন্দও নয়, এ তার থেকেও গহীন অনুভূতি। যেন তার কাটা আঙুলগুলো ফিরে এসেছে আবার। জোড়া লেগে গেছে। দিব্যি তাদের নাড়তে পারছে মহীতোষ।

মহীতোষের অন্ধকার ঘরে মথ উড়ছিল রাশি রাশি। তাদের ডানা ঝাপটানি শুনতে পাচ্ছিল মহীতোষ। ভাবছিল, এরা মথ, না প্রজাপতি?

মহীতোষের চোখ ভিজে যাচ্ছিল। বহু কাল পরে।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল রুমঝুম। ছুটতে ছুটতে কোয়ার্টারে ঢুকল,—ও বকুলমাসি, এসেছে গো এসেছে।

বকুলমাসি বাইরের ঘরে বসে ব্লাউজের হুক সেলাই করছিল। রুমঝুমের ঝাপটায় হাতে ছুঁচ ফুটে গেল তার। বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল,—অত লাফানোর কী আছে? কে এসেছে?

—মাস্টারমশাই গো মাস্টারমশাই।

—অ। তাই বলো। আমি ভাবলাম কে না কে।

এতদিন পর মাস্টারমশাই আসছে, মাসির যেন কোনও হিল্-দোলই নেই! রুমঝুমের রাগ হয়ে গেল। মার মতো কড়া মুখ করে বলল,—তুমি এখন এ ঘর থেকে যাও তো। মাস্টারমশাইয়ের জন্য চা করে আনো।

বকুলমাসি উঠে দাঁড়াল—হুঁহ্, খালি পাকা বুড়ির মতো কথা! চা আমি মাস্টারমশাইকে ঠিক সময়েই দেব।

—না। এক্ষুনি দাও। খাবারও দেবে। মাস্টারমশাই কত দিন পরে এল...

—এহ্ ভারী তো সাত দিন আসেনি, তার জন্য মেয়ে একেবারে হেদিয়ে গেল।

বকুলমাসিটার যেন কী হয়েছে। মুখে একফোঁটা হাসি নেই।

কটমট করে মাসিকে দেখে আবার লাফিয়ে দরজায় গেল রুমঝুম। মাস্টারমশাই বারান্দায় চটি ছাড়ছে, রুমঝুমের সেটুকুও তর সইছে না। এত এত প্রশ্ন কিলবিল করছে মনে, কোন্ প্রশ্নটা যে আগে করে রুমঝুম?

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে চৌকিতে বসেছে। বলল,—যাও, বইখাতা নিয়ে এসো।

রুমঝুমের ঠোঁট ফুলে গেল—আগে বলো তুমি এত দিন আসনি কেন?

—ইচ্ছে হয়নি।

—কেন ইচ্ছেটা হয়নি শুনি?

—আহ্ পাকামি কোরো না। যা বলছি শোনো। বই নিয়ে এসো।

মাস্টারমশাইয়ের গোমড়া মুখটা দেখে ভুসভুস হাসি পাচ্ছিল রুমঝুমের। রেগে গেলে মাস্টারমশাই কেমন চোখ পিটপিট করে। নাকটাও কেমন আঙুরের মতো টসটসে হয়ে যায়। এক দিন রুমঝুম থার্টিনের পর বার বার ফিফটিন বলে ফেলছিল, সেদিনও মুখটা ঠিক এরকম হয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের। রুমঝুম জানে ওই রাগ রুমঝুমকে ভয় দেখানোর জন্যে। রুমঝুম মাস্টারমশাইকে ভয় পাবে কেন?

চৌকিতে বইখাতা রাখতে রাখতে রুমঝুম বলল,—জানি গো জানি, কেন এত রাগ।

—কে বলেছে রাগ করেছি?

—তোমার মুখ বলছে গো।

—কী বলছে?

—বলছে, তুমি হেরে গিয়ে ভীষণ রেগে আছ। তাই না গো?

—আহ্ রুমঝুম, বকবক কোরো না। পড়বে তো পড়ো, নইলে আমি যাচ্ছি।

রুমঝুম চুপটি করে রাইমসের বই খুলল। আড়চোখে দেখল মাস্টারমশাইকে। চুপটা সে থাকবে কী করে? পেটের ভেতর থেকে বুড়বুড় করে ঠেসে আসছে কথারা। বুড়বুড় করে বেরিয়েও গেল,—মাস্টারমশাই তুমি হেরে গেলে কেন গো?

—আমার ইচ্ছে।

—ইচ্ছে না কচু। ইচ্ছে করে কেউ হারে নাকি?

মাস্টারমশাই চুপ।

—তুমি একটুর জন্য ফার্স্ট হতে পারলে না, তাই না মাস্টারমশাই?

—হবে।

—হবে না গো, হয়েছে। কী সুন্দর পাঁই পাঁই করে সাইকেল চালাচ্ছিলে, আমি ভাবলাম ফার্স্ট তুমি হবেই, কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না।

—সবাই ফার্স্ট হয় না রুমঝুম।

—দাদুও তাই বলছিল।

—কে দাদু?

—ওই যে গো, বাগানদাদু। উইদিকে থাকে। তোমাকে সেদিন তার কথা বলছিলাম না...

—ও। মনোময়বাবু?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। দাদুও তো সেদিন তোমার রেস দেখতে গিয়েছিল।

—জানি। দেখেছি।

—বাব্বাহ্, তুমি হেরে গেছ বলে সেদিন সবারই কী মন খারাপ। দাদুর মন খারাপ, মার মন খারাপ, ভালকাকুর মন খারাপ...।

রুমঝুম ঝুপ করে কথা থামিয়ে দিল। সেদিন বাড়ি এসে রুমঝুমও কী কম কেঁদেছে। কিন্তু এ কথাটা রুমঝুম মাস্টারমশাইকে কিছুতেই বলবে না। কেন বলবে? রুমঝুমের বুঝি লজ্জা করে না? তা ছাড়া ছোটরা কাঁদলে বড়রা হাসে। রুমঝুম খুব জানে সে কথা। তবে হ্যাঁ, মাস্টারমশাই যদি জিজ্ঞাসা করে রুমঝুমের কষ্ট হয়েছিল কি না, তাহলে সে সত্যি কথাই বলবে।

মাস্টারমশাই সে সব প্রশ্নের ধার দিয়েই গেল না। চোখ পিটপিট করে প্রশ্ন করল,—তোমার মার মন খারাপ হবে কেন? তোমার মা তো সাইকেল রেস ভালবাসে না। তোমার মা তো দেখতেও যায়নি।

—এ মা, কী বলে গো? মা বলে সেদিন তোমার রেস দেখবে বলে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে চলে এল! রুমঝুম গুছিয়ে বসল,—তারপর মা একটা ভাল শাড়ি পরল, আমি গেলাম, মা গেল, ভাল কাকু গেল...

—কই, তোমাদের তো দেখতে পেলাম না!

মাস্টারমশাই চুপ করে বসে। রুমঝুমের রং পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি আঁকছে রুমঝুমের খাতায়। আহা রে, মন খারাপটা যাচ্ছে না মাস্টারমশাইয়ের। এবার নিশ্চয়ই রুমঝুমের মন খারাপ হয়েছিল শুনলে মাস্টারমশাই হাসবে না!

রুমঝুম কান্নার কথাটা বলেই ফেলছিল, তার আগেই মাস্টারমশাই বলে উঠল, —তোমার ভালকাকুটা আবার কে?

—ওমা, তুমি ভালকাকুকে চেনো না? ওই যে অনেক দূরে একটা কাঠ কাটার কারখানা আছে, ঘ্যাসর ঘ্যাসর শব্দ হয়, তার পাশেই তো থাকে। কী বড় বাড়ি গো ভালকাকুর! একটা ইয়া বড় উঠোন আছে। আমার দাদুর বাগানের থেকেও বড়।

তুমি বুঝি সেই কাকুটার বাড়ি যাও?

—গেছি তো। কাকুর জ্বর হয়েছিল, মা দেখতে গেল, আমিও মার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কাকু আমাকে ফেরার সময়ে এতগুলো চকলেট কিনে দিয়েছিল।

—হুঁ। নাও, রাইমস পড়ো। জাক অ্যান্ড জিল, ওয়েন্ট আপ দা হিল...

মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সঙ্গে একবার রাইমস্‌টা পড়েই কান্না পাচ্ছিল রুমঝুমের। আর পড়তে পারছে না। গলায় আটকে যাচ্ছে পড়া।

মাস্টারমশাই বকুনি দিল,—থামলে কেন? পড়ো।

চোখে জল এসে গেল রুমঝুমের। নাক টানতে টানতে কোনও রকমে সামলালো কান্নাটা। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যায়নি রুমঝুম, কাকুর বাড়ি গেছে, সেই জন্যই কি মাস্টারমশাই রেগে গেল? রুমঝুম কী করবে? রুমঝুম একা একা সব জায়গায় যেতে পারে? দাদুর বাড়ি যায়, তাতেই না কত ঝঞ্ঝাট! ভাগ্যিস বকুলমাসি মাকে বলেছে বকুলমাসি রুমঝুমের সঙ্গে যায়, নইলে মা কি আর তাকে যেতে দিত? মা যেখানে যাবে, সেখানেই শুধু রুমঝুমকে যেতে হবে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কি একা চিনে যেতে পারবে রুমঝুম?

মাস্টারমশাই কিছু বোঝে না। কালীপুজোর দিন ভালকাকু কত বাজি হাতে করে নিয়ে এল, তারাবাজি, রংমশাল, রংদেশলাই, আরও কত কি! রুমঝুম একটাও জ্বালিয়েছে? মা সেধেছে, ভালকাকু সেধেছে, বকুলমাসিও সেধেছে, তবু জ্বালায়নি। কেন জ্বালায়নি? মাস্টারমশাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিল বলেই না?

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আর কথাই বলবে না রুমঝুম। একা একাই রাইমস্ পড়ুক মাস্টারমশাই, রুমঝুম কিছুতেই পড়বে না। বকুক, মারুক, চোখ রাঙাক, কিছুতেই না।

বকুলমাসি চা দিয়ে গেছে। ঘুগনিও। অন্য দিন চা এলেই কাপের দিকে হাত বাড়ায় মাস্টারমশাই, আজ সেদিকে তাকালই না। গরগর করছে,—কী হল, আমি একা বকে যাব? বলো, টু ফেএচ্ আ পেএল্ অব ওয়াটার।

রুমঝুম চোক গিলল। শক্ত করে টিপে থাকল ঠোঁট দুটোকে।

মাস্টারমশাই ভ্যাবড্যাব দেখল রুমঝুমকে। দুম করে বই বন্ধ করে দিল,—আমি আর কাল থেকে পড়াতে আসব না। তুমি অন্য মাস্টারমশাইয়ের কাছে পোড়ো।

রুমঝুম বুঝতে পারল না কী হয়ে গেল। কোথ্থেকে এক দলা কান্না গড়িয়ে এল গালে। দু'হাতে জল মুছতে চেষ্টা করছে। যত করছে, তত বেশি কান্না বেরিয়ে আসছে হুড়হুড়।

আর তখনই মা ঢুকেছে,—এ কি, রুমঝুম কাঁদছে কেন?

বসে থাকতে পারল না রুমঝুম, দৌড়ে গিয়ে মার কোমর জড়িয়ে ধরল,—ও মা, মাস্টারমশাই আর আসবে না বলছে।

—কেন? কী হল মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাইও উঠে দাঁড়িয়েছে,—না...মানে...কথাটা আমি আপনাকে বলবই ভাবছিলাম। আমার এক মাসি আছে কলকাতায়, মেসো বলছিল কলকাতায় গেলে যদি কিছু জোটানোর বন্দোবস্ত করা যায়...ঝালুয়ায় তো আমার কিছু হল না।

—ঝালুয়া ছেড়ে চলে যাবেন মাস্টারমশাই? জানেন, আপনি চলে গেলে

ঝালুয়ার কত ক্ষতি হয়ে যাবে?

—কী হবে? একটা হেরো সাইক্লিস্ট সরে গেলে কোথাও কারুর কিচ্ছুটি হবে না।

—মোটেই না। আপনি জানেন ঝালুয়ার লোক আপনাকে ধন্য ধন্য করছে? জানেন আপনি যখন হেরে গেলেন, আমার কী কান্না পাচ্ছিল?

মা ঠিকই বলেছে। রুমঝুমও তো সেই কথাই বলতে চায়! রুমঝুম চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মাস্টারমশাই কেমন ভাবে যেন তাকিয়ে আছে মার দিকে। দাদু যেভাবে রুমঝুমের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠিক সেরকম।

—আমার রুমঝুম যে আপনার কাছে ছাড়া পড়বে না মাস্টারমশাই। মা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল,—আমি বলি কি, ফার্স্ট প্রাইজ পাননি তো কী আছে, সেকেন্ড প্রাইজ তো পেয়েছেন। তাই দিয়ে এখানেই একটা কিছু শুরু করে দিন। ছোট করেই আরম্ভ করুন।

মাস্টারমশাই গোমড়া মুখে বলল,—তিন হাজার টাকায় কিছু হয় না।

—খুব হয়। ঝালুয়ার মানুষ আপনার পাশে আছে, আপনি ঠিক পারবেন। তা ছাড়া সামনের বছর আপনি তো ফার্স্ট হচ্ছেনই। আপনি ঝালুয়ার মানুষকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চান?

মা কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে! মাস্টারমশাই আর উত্তরই দিতে পারছে না, কেমন প্যাঁচার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

রুমঝুম মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে টানল,—ও মাস্টারমশাই, তুমি যাবে না তো?

মাস্টারমশাই রুমঝুমের চুল ঘেঁটে দিল,—আজ অন্তত যাই। তবে কাল কিন্তু কোনও ফাঁকি নয়, সব কটা রাইমস্ মুখস্থ বলতে হবে।

রুমঝুমের বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। এখন শুধু হাসিই হাসি। হাসতে হাসতে মাস্টারমশাইকে বলল,—আমি এখন ফিফটি অব্দি গুনতে পারি। তোমার রাউন্ড দেখতে দেখতে গোনা শিখে গেছি।

—ওরে দুষ্টু মেয়ে, দাঁড়াও তোমার হচ্ছে!

রুমঝুম লাফাতে লাফাতে ভেতরের ঘরে চলে গেল। দুঃখের পর খুশি এলে আনন্দটা যেন আরও বেশি বেশি লাগে। দাদুর বাড়িতে যখন দাদুর ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি এল, তখন তো রুমঝুমের মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। রোজ গিয়ে গেট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতর থেকে হাসি হল্লার আওয়াজ ছুটে ছুটে আসে, রামবিলাসদাদা আর লছমিদিদিকেও মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু

দাদু যেন ম্যাজিশিয়ানের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বারান্দার চেয়ারটার দিকে তাকিয়েই থাকে রুমঝুম। দাদু নিজের নাতিনাতনি পেয়ে বারান্দাতে বসাও ভুলে গেল! একদিন দুটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে হঠাৎ বাগানে দৌড়ে এল। এসেই পটাপট ফুল ছিঁড়তে শুরু করেছে। একটা ছেলে আবার ব্যাট দিয়ে ঠাঁই ঠাঁই মারছিল গাঁদার চারাগুলোকে। দেখে রুমঝুমের এত কষ্ট হল। দাদুর আর রুমঝুমের হাতে তৈরি অত সুন্দর বাগান...।

মা ঘরে এসেছে। ইউনিফর্ম ছেড়ে লাল টিপটিপ একটা শাড়ি পরল। আজকাল কী সুন্দর সাজগোজ করে মা। খুব ভাল দেখায়।

মা বলল,—কেঁদে কেঁদে তো চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিস। চল্ আমরা একটু বারান্দায় গিয়ে বসি।

ভেতর থেকে বকুলমাসির রান্নার হ্যাঁকহোক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রুমঝুম নাক টানল। লুচি ভাজারও গন্ধ আসছে যেন! রুমঝুমের মনে হল এত সুন্দর দিনে আজ লুচি হলে বেশ হয়।

ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। খয়েরি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রুমঝুমকে নিয়ে বারান্দায় বসেছে মা, রুমঝুম টুপ করে চাদরের ভেতর মাথা গলিয়ে দিল।

রুমঝুমকে জড়িয়ে ধরে দুলছে মা। হঠাৎ থেমে গেল।

—হ্যাঁরে রুমি, তোর সেই আগের জায়গাটার কথা মনে পড়ে? যেখানে আমরা ছিলাম?

—বারাসত? হ্যাঁ, মনে পড়ে।

—সেই জায়গাটা ভাল, না এই জায়গাটা ভাল?

কী সোজা প্রশ্ন। রুমঝুম বলল,—এই জায়গা।

মা চুপ করে গেল। আবার জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁরে, রুমি, তোর বাবার কথা মনে পড়ে?

—একটু একটু মনে পড়ে।

—কী মনে পড়ে?

কী কঠিন প্রশ্ন! রুমঝুম চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। একটাই ছবি মনে আসছে। বাবা তাকে স্কুটারে বসিয়ে হু হু করে অনেক দূর নিয়ে চলে যেত, আর ফিরে এলে মা খুব বকত বাবাকে। না না, আরেকটা কথাও মনে আছে। রুমঝুমকে অনেক উঁচুতে ছুড়ে লুফে নিত বাবা। হাসত হা হা করে। তাতেও মা রাগ করত খুব। ইস, বাবাটা কেন যে মরে গেল? কেমন যেন দেখতে ছিল বাবা? ভাবতে গিয়ে রুমঝুমের খালি শোওয়ার ঘরে টাঙানো বাবার ছবিটাই চোখে আসছে।

রুমঝুম জিজ্ঞাসা করল,—বাবা কি খুব ফর্সা ছিল মা? না কালো?

—ফর্সাই ছিল। তোর আমার থেকে অনেক ফর্সা।

—ওই ভালকাকুর মতো ফর্সা?

—কাছাকাছি।

মার গরম নিঃশ্বাস লাগছে রুমঝুমের গালে। মা আবার বলল, প্রায় ফিসফিস করে,—হ্যাঁরে রুমি, ভালকাকুকে তোর কেমন লাগে?

—ভালকাকু তো ভাল।

—আচ্ছা রুমি, ভালকাকু যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলে কেমন হয়?

—কেন, আমাদের সঙ্গে থাকবে কেন? আমাদের কোয়ার্টারে এসে থাকবেই বা কী করে? বকুলমাসি বাইরের ঘরে শোয়, আমরা শোওয়ার ঘরে...

—আমরা যদি ভালকাকুর বাড়িতে গিয়ে থাকি?

এ কি তাজ্জব কথা রে বাবা! রুমঝুমরা এই কোয়ার্টার ছেড়ে ওখানে গিয়ে থাকবে কেন? সাধে কি বড়দের কথার মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না রুমঝুম!

রুমঝুম গম্ভীর হয়ে বলল,—আমরা কেন পরের বাড়ি থাকব?

—ধর্ কাকু যদি তোকে বলে, রুমি তুমি আমার বাড়িতে এসে থাকো, আমি সব ঘরের দরজা তোমাকে খুলে দেব, তাহলে তুই যাবি?

—কেন বলবে ওরকম কথা? কাকু কাকুর বাড়িতে থাকবে, আমরা আমাদের বাড়িতে থাকব।...

—ধর্ যদি কাকু বলেই? কাকু একা একা থাকে, কাকুর কেউ কোথ্থাও নেই...। কাকু তোকে খুব ভালবাসবে...

রুমঝুমের শরীর শক্ত হয়ে আসছিল। মা বার বার এক কথা বলছে কেন? মা কি সত্যি সত্যি কাকুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে চায়? রুমঝুমের ভাল লাগছে না শুনতে। একটুও ভাল লাগছে না।

মার চাদর থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে বার করে নিল রুমঝুম।

একটা একটা করে তারা ফুটছে আকাশে। অনেক দূরে একটা তারা পুট করে নিভে গেল, মাথার ওপর জ্বলে উঠল অন্য একটা তারা। যে তারাটা নিভে গেল, সেটা কি জীবনের মতো হারিয়ে গেল?

রুমঝুমের হঠাৎ বড্ড মন কেমন করছিল। মিলিয়ে যাওয়া তারাটার জন্যে।

শীতের বেলা তপ্ত হচ্ছে ক্রমশ। রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়া বইছে শনশন। হাওয়া যেন বরফের ছুরি, সূর্য হার মানছে তার কাছে। অঘ্রানেই পৌষ এসে গেছে ঝালুয়ায়।

রোদের তাতটা বেশ মিঠেকড়া লাগছিল মনোময়ের। গত জীবনে পাউচের তামাক পাকিয়ে সিগারেট খেতেন। সেই তামাকের মতোই মিঠেকড়া গন্ধ আছে রোদটায়, নেশা ধরে যায়। তফাত একটাই। এই রোদে প্রচুর ভিটামিন।

মনোময় বারান্দা থেকে হাঁক পাড়লেন,—রামবিলাস...অ্যাই রামবিলাস।

দড়িদড়া বাঁশের খুঁটি কাঁধে রামবিলাস বেরোচ্ছে গেট দিয়ে। হাতেও এক ইয়া বড় শাবল। মনোময়ের ডাক শুনে ঘুরে এল,—ডাকছেন বাবু?

রামবিলাসের সাজ দেখে মনোময় বিমোহিত। বললেন,—এইসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চললি কোথায়?

রামবিলাস এক গাল হাসল,—পরশু রাতে আপনার সঙ্গে কথা হল না? বললাম আজ দোকানের কাজটা আরম্ভ করে দেব।

—হুঁ, বলছিলি বটে। তা জায়গাটা পেলি কোথায়?

—এই তো শিমুলতলার পাশে।

—ওখানে তোর ভাজাভুজির দোকান চলবে?

—পাশেই হাসপাতাল আছে, খাবার দোকান চলবে না?

—বুঝেছি। তোর দোকানে খেয়েই সব হাসপাতালে ভর্তি হবে আর কী।

রামবিলাস দাঁত বার করল,—আপনার জন্য রোজ নিয়ে আসব। খেয়ে দেখবেন ভেজাল আছে কি না।

—তেলেভাজায় আবার ভেজাল! মনোময় হো হো হাসলেন,—তা এই বয়সে দোকানঘর বাঁধার কাজও তুই একলা করবি না কি? কাজটা তো চাট্টিখানি কথা নয়! শেষে বুড়ো বয়সে একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসিস না।

—আমি বুড়ো নই বাবুজি। রামবিলাস গেটের দিকে এগোল। কী ভেবে ঘুরে তাকিয়েছে,—লছমিকে আপনার স্নানের জলের কথা বলা আছে। আর কোনও দরকার হলে হাঁক দেবেন, লছমি চলে আসবে।

মনোময় চিন্তিত মুখে বললেন,—কটা বাজে রে এখন? নটা বাজেনি?

—বহুক্ষণ বেজে গেছে।

—মেয়েটা এখনও এল না কেন বল তো?

—এসে যাবে। এখনই এসে যাবে।

রামবিলাস চলে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করার আগে চলন্ত রামবিলাসকে একবার জরিপ করলেন মনোময়। পেশি যেন ফেটে বেরোচ্ছে পঞ্চাশ পার হওয়া শরীরটা থেকে। ঝালুয়ায় এসে দিনে দিনে জোয়ান হয়ে উঠল রামবিলাস।

ঝালুয়া জায়গাটাই এরকম। এখানে রামবিলাসদের যৌবন বেড়ে যায়, এখানে পূর্ণেন্দুরা একবার প্রথম হওয়ার জন্য তিলাইদিঘি পাক দিয়ে চলে অবিরাম, কবিতারা বিষাদপ্রতিমা হয়ে একবিন্দু সুখ খোঁজে, মহীতোষরা বেঁচে থাকে নৈঃশব্দ্য বুকে নিয়ে।

ঝালুয়ায় জীবন বড় সুন্দর। ঝালুয়ায় জীবন বড় কষ্টের।

মনোময় চোখ বুজলেন।

বেলা বাড়ে, তাপ বাড়ে। একটুকু ধ্বনি শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকেন মনোময়। কোনও দিন আসে ধ্বনি, কোনও দিন আসে না। শব্দও বড় অভিমানী ঝালুয়ায়।

মনোময় চেয়ার ছেড়ে নেমে এলেন বাগানে। কয়েকটা গোলাপ বড় হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করেছে, তাদের খুব নিকটে এসে দাঁড়ালেন মনোময়। কালচে লাল রং ফ্যাকাসে হয়ে আসছে, এবার যে কোনও দিন শব্দ করে ফেটে যাবে ফুলগুলো, পাপড়ি সব ঝরে পড়বে মাটিতে। ফুলের মৃত্যু হবে।

ফুলের মৃত্যু! কথাটা কী মনোরম, অথচ কী বিষাদময়!

মুমূর্ষু গোলাপের থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে সহসা হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল মনোময়ের। ও কী ওখানে?

সার সার গাঁদাগাছ ফুলে সেজে আছে। তাদের হলুদ রং এত তীব্র যে হঠাৎ দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

মনোময় চোখ ঘষলেন ভাল করে।

না, ভুল দেখেননি মনোময়। হলুদ গাঁদার বনে শুয়ে আছে রুমঝুম। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কুঁকড়ে। ছোট্ট হয়ে। দু'গাল জুড়ে তার শুকিয়ে আছে অশ্রু তবু ঠোঁটের ফাঁকে কী অপার্থিব হাসি!

কখন এল মেয়েটা!

মনোময় মেয়েটাকে ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন। আহা থাক, ফুটে থাক ফুল হয়ে।

এমনি করে ফুটে থাকার নামই তো জীবন!

——

ভাঙা আয়না

অফিস থেকে ফিরে স্নান-টান সেরে টিভির সামনে বসেছিল সুরজিৎ। সামান্য অবসর বিনোদন। কিম্বা বলা যায় মাথা ছাড়ানো। ক'দিন ধরে যা চাপ যাচ্ছে অফিসে। এক জার্মান কোম্পানির সঙ্গে কোল্যাবোরেশানের কথাবার্তা চলছে মালিকপক্ষের, সেই সুবাদে ছ ছ'খানা দশাসই জার্মান কলকাতায় হাজির। ঘুরে ঘুরে দেখছে অফিস ফ্যাক্টরি। মাঝখান থেকে সুরজিৎদের মতো মেজ সেজ অফিসারদের বাঁশ। সাহেবদের সঙ্গে তাল দিতে দিতে জান কয়লা হয়ে গেল। ব্যাটাদের কৌতূহলের শেষ নেই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। কোন্ মেশিনের কত বয়স, ক'বার ব্রেকডাউন হয়েছে, বর্তমানে উৎপাদনক্ষমতা কীরকম থেকে শুরু করে স্টাফদের ঠিকুজিকুষ্টি, সবই সাহেবরা ঠাসছে মগজে। কাঁহাতক পারা যায়, বাড়ি ফিরে শরীর যেন এলিয়ে আসে।

জয়ন্তী রাতের খাবার বাড়ছে। ডাইনিং টেবিল থেকে হাঁক পড়ল,—কই, এসো।

হিন্দি সিরিয়ালটা জমেছে বেশ। সুরজিতের নড়তে ইচ্ছে করছে না। অলস গলায় বলল,—যাচ্ছি। দু'মিনিট।

—যাচ্ছি নয়, এক্ষুনি এসো। বুবলু ঢুলতে শুরু করেছে।

—ওকে খাইয়ে দাও না।

—তুমি না এলে খাবে না।

অগত্যা উঠতেই হয়। খাবার টেবিলে গিয়ে চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিল সুরজিৎ, যাতে খেতে খেতে টিভির পরদায় চোখ রাখা যায়। টেরচা চোখে বুবলুকে দেখে নিয়ে বলল,—কী বুবলুবাবু, আজ কী কী দুষ্টুমি হল সকাল থেকে?

জয়ন্তী একটা বড়সড় দলা ঠুসে দিয়েছে ছেলের মুখে। কোঁৎ করে ভাতটুকু গিলে নিয়ে বুবলু গাল ফুলিয়ে বলল,—আমি ভাল ছেলে। আমি দুষ্টুমি করি না।

—সে তো তোমায় দেখেই মালুম হয়। পড়াশুনা হয়েছে?

—তিনটে পোয়েম মুখস্থ করেছি।

—গুড। এবার চটপট খেয়ে নিয়ে ঝটপট শুয়ে পড়ো।

জয়ন্তী বাঁ হাতে ক্যাসারোল খুলে জিজ্ঞেস করল,—তোমায় কটা রুটি দেব?

সুরজিতের আহারে মন নেই। দায়সারাভাবে বলল,—দাও না তিনটে চারটে।

—তিনটে? না চারটে? স্পষ্ট করে বলো।

—তুমি জানো না আমি কটা করে খাই?

—আমার জানা দিয়েই তো সব চলে না। তোমার কোন্ দিন কতটা ক্ষিধে থাকে বুঝব কী করে? কাল তো মাত্র একটা খেলে।

—সে তো সাহেবদের নিয়ে হোটেল যেতে হল, তাই।

জয়ন্তী আরও কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। চোখের কোণ দিয়ে সুরজিৎকে দেখল এক ঝলক। তার পর গরম গরম চারখানা রুটি বার করে রেখেছে পাতে। বাঁ হাতে হাতা ধরে খানিকটা সর্ষেপটল দিল, ঠেলে দিল মুরগির মাংসর বাটিটা। ফের ছেলের মুখে ভাত গুঁজছে।

সুরজিৎ রুটি ছিঁড়ল। চিবোচ্ছে রুটি, কিন্তু গিলছে সিরিয়াল। পরদায় এখন টানটান উত্তেজনা। গুপ্ত প্রেমিকের সঙ্গে লটঘট সেরে বাড়ি ফিরছে নায়িকা, কলিংবেল বাজাচ্ছে ঝাং ঝাং, ভেতর থেকে নো সাড়াশব্দ। অধৈর্য নায়িকা জোরে ধাক্কা দিতেই দরজা হাট। আইব্বাস, কেতাদুরস্ত ড্রয়িংরুমের কার্পেটে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে নায়িকার স্বামী! বুকে গেঁথে আছে ছোরা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে কাশ্মীরি কার্পেট। কে মারল লোকটাকে? মেয়েটার প্রেমিক? কিন্তু সে তো এতক্ষণ মেয়েটার সঙ্গে ছিল। তাহলে কি আরও কোনও আশিক আছে মেয়েটার?

পলকের জন্য তিথিকে মনে পড়ল সুরজিতের। ইদানীং তিথির যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব! অফিসে ফোন করছে না বড় একটা! পর পর কটা দিন দেখাসাক্ষাৎ হল না, তা নিয়েও কোনও উৎকণ্ঠা নেই! অন্য কারুর সঙ্গে ঢুকুর ঢুকুর শুরু করল না তো তিথি? অল্পবয়সী কেউ?

ভাবনার মাঝেই জয়ন্তী। যেন নিজের মনেই বলল,—গরমের ছুটি ফুরিয়ে এল, ছেলেটার কোথাও একটু যাওয়া হল না।

সুরজিৎ শুনেও শুনল না। পরদায় রহস্য আরও ঘনীভূত। মেয়েটা পায়ে পায়ে ডেডবডির কাছে চলেছে, আতঙ্কে মুখ কাগজের মতো সাদা। বোকার মতো ছোরাটায় হাত দিয়ে ফেলবে না তো? জানলার ভারী পরদাটা নড়ছে কেন? ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি?

জয়ন্তী ফের বলল,—শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?

—উঁ?

—বুবলুর গরমের ছুটি তো ফুরিয়ে এল, ওর বন্ধুরা কত জায়গায় যাচ্ছে, আমরা তো কটা দিনের জন্য কোথাও ঘুরে আসতে পারি।

পরদায় চোখ রেখেই সুরজিৎ বলল,—যাও, কদিন কাশীপুরে থেকে এসো।

বুবলু ওমনি বলে উঠল,—না বাপি, মামার বাড়ি নয়। অন্য কোথাও যাব।

পুলিশের গাড়ি থেমেছে নায়িকার বাড়ির দরজায়। নামছে উর্দিপরা অফিসার। ফ্রিজ হয়ে গেল দৃশ্য। আজকের মতো ধারাবাহিক খতম।

সুরজিৎ বউ ছেলেতে ফিরল। মন দিয়েছে বুবলুতে,—হ্যাঁ, কী বলছিলি? কোথায় যাবি?

—একটা কোথাও। বেড়াতে।

জয়ন্তী বলে উঠল,—ছোট্ট ট্রিপ। দু'চার দিনের জন্যে। কাছাকাছি কোথাও চলো।

—আমি এখন কী করে যাব? আমার বলে মরার সময় নেই।

—কেন, সামনের সপ্তাহে তো পর পর তিন দিন ছুটি। শুক্কুর শনি রবি।

—না না, ও সময়ে হবে না।

—কেন হবে না বাপি? চলো না বাপি। প্লিজ বাপি।

সুরজিৎ প্রমাদ গুনল। নেক্সট উইকে ওই তিনটে দিন ছুটি আছে ঠিকই, তবে তার জন্য আলাদা প্ল্যান যে ছকা আছে তার। তিথিকে নিয়ে বেরোবে। কাজেকর্মে আটকে থেকে প্রায় আড়াই মাস তিথির সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়নি, হয়তো ওই জন্যই তিথির দুঃখী দুঃখী ভাব। অভিমান?

হাত বাড়িয়ে ছেলের চুল ঘেঁটে দিল সুরজিৎ। মিষ্টি করে বলল,—বুবলুসোনা, ওই সময়ে আমার অফিসট্যুর আছে যে বাবা।

—না। তুমি ট্যুরে যাবে না। প্লিজ বাপি।

—তা কি হয় বুবলু। বস রাগ করবে যে। তার চেয়ে বরং পুজোর সময়ে...

—নাআআআ। এখন।

—জেদ করে না বুবলু। বোঝার চেষ্টা করো।

ব্যস, হয়ে গেল। ছেলের ঘাড় গোঁজ। ঠোঁট ফুলছে।

এ তো মহা গেরো হল! সুরজিৎ কী যে করে এখন? বুবলু-জয়ন্তীকে নিয়ে সুরজিতের বেরোন হয় না ঠিকই, তা বলে ওই তিন দিনই...?

জয়ন্তী ঠাণ্ডা স্বরে বলল,—যেতে দে বুবলু, মন খারাপ করিস না। তোর বাবা যখন নিয়ে যাবেই না...

বুবলুর চোখ টলটল করছে। গাল বেয়ে গড়িয়েও গেল দুটো ফোঁটা। নাক টানছে।

দোলাচলে পড়ে গেল সুরজিৎ। ছেলেটা তার বড় বেশি স্পর্শকাতর হয়েছে। তারই মতো। বাপ কা বেটা। বাবার কাছেই তার যত আবদার, বাবার মুখে না

শুনলে তাই সহ্য করতে পারে না বেচারা।

সুরজিৎ বলে ফেলল,—ও কে। ও কে। যাব। আমার ট্যুর ক্যানসেল।

পলকে বুবলু উদ্ভাসিত,—প্রমিস?

—প্রমিস।

সঙ্গে সঙ্গে বুবলুর আনন্দ দেখে কে! খেয়ে নিচ্ছে গপাগপ। রোজ খুব নকড়া ছকড়া করে ভাত নিয়ে, আজ তিন মিনিটে থালা সাফ।

ছেলেকে আঁচিয়ে দিয়ে জয়ন্তী বসে পড়ল খেতে। ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর চাপা হাসি। যেন বলছে, ছেলের কাছে জব্দ হতে হল তো!

সুরজিৎ একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলল। যাক গে যাক, সংসারটাকেও বজায় রাখতে গেলে একটু আধটু জমি তো ছাড়তেই হয়। তিথি নয় তোলাই রইল এবারকার মতো। ক্যালেন্ডারটা দেখতে হবে, জুলাই আগস্টে একটাও ফাঁক কি মিলবে না? নয় ভরা বর্ষাতেই তিথিকে নিয়ে যাবে সমুদ্রে।

রিমোট টিপে টিভির চ্যানেল বদলাল সুরজিৎ। থামল ইংরিজি খবরে। সংবাদ প্রায় কিসুই নেই, সেই এক চর্বিতচর্বণ। পলিটিশিয়ানদের চাপান উতোর। খুন জখম ধর্ষণ ডাকাতি রাহাজানি। আর এখানে ওখানে জঙ্গি হানা।

বুবলু এসে সুরজিতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ভারী মায়াকাড়া মুখখানা। ফোলা ফোলা গাল, তুলতুলে ঠোঁট, পালক পালক ভুরু, রেশমি চুল। ফ্রক পরালে মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। চেহারায় মায়ের আদল পেয়েছে ছেলে। বাপের সঙ্গে এই জায়গাটায় তার তেমন মিল নেই।

আদুরে গলায় বুবলু বলল,—তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি বাপি?

—তুইই বল্।

—না, তুমি বলো।

মুরগির ঝোলে রুটি ডোবাল সুরজিৎ,—চল্ তবে দীঘা ঘুরে আসি।

জয়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে নাক কুঁচকেছে,—দীঘা একটা জায়গা হল? তার চেয়ে এস্‌প্ল্যানেডে গিয়ে শহিদ মিনারের তলায় বসে থাকতে পারো।

—অ। দীঘায় মন উঠবে না? তবে তোমরাই চুজ করো।

—বাপি, সুন্দরবন গেলে হয় না? পাঁচ বছরের বুবলুর ভুরুতে ভাঁজ,—নদী আছে, জঙ্গল আছে..

—তুই কী করে জানলি?

—আমাদের ক্লাসের শুভম গিয়েছিল। লঞ্চে চড়ে।

—তাহলে তো আমাদেরও যেতেই হয়। বন্ধুর কাছে তো তোমার হার মানা চলবে না। ব্যবস্থা করি তাহলে?

—খুব মজা হবে। বাঘ দেখব। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

—তারপর বাঘ যদি তোকে দেখে ফেলে?

—কী হবে?

—সে কি আর তুই জানতে পারবি! এক্কেবারে গপাং। বাঘ চিড়িয়াখানাতেই দেখা উচিত। আমরা বড় জোর কুমীর প্রকল্প যেতে পারি। কিংবা পাখিরালয়।

—মাথা খারাপ! এই জ্যৈষ্ঠমাসে কেউ সুন্দরবন যায়? এক ঢোঁক জল খেয়ে জয়ন্তী ফের ফেকড়া তুলল,—এ সময়ে যখন তখন এলোমেলো ঝড় ওঠে। লাস্ট উইকেও বিদ্যা নদীতে একটা লঞ্চডুবি হয়েছে।

—শুনলি তো বুবলু? সুরজিৎ বুড়ো আঙুল ঘোরাল,—সুন্দরবনও বাতিল। ...তোর মাকে জিজ্ঞেস কর মায়াপুর যেতে রাজী আছে কিনা। শান্তিপুর? নবদ্বীপ?

—গিয়ে খোল করতাল বাজাব?

এই হচ্ছে জয়ন্তীর বাক্যবাণ। সাধে কি সুরজিতের মাথা গরম হয়! তীর ছোঁড়ার সুযোগও ঠিক তৈরি করে নিতে জানে জয়ন্তী। সুরজিতের কোনও কথায়, কোনও কাজে, কখনও কি আনন্দিত হয়? রান্নার প্রশংসা করলেও মুখ ভ্যাটকাবে। ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে ফ্রেঞ্চ পারফিউম উপহার দিলেও ভুরু কুঁচকাবে। পুজোয় দামী শাড়ি কিনে দিলেও উদাস। এইবারই তো বিয়ের দিনে চার চারটি হাজার টাকার একখানা মেরুন সিল্কবোমকাই দিল সুরজিৎ, অমন গরজাস শাড়িখানা দেখেও মহারানির প্রাণে কোনও হিল্লোল জাগল কি? মুখের ওপর বলে দিল—ফালতু ফালতু পয়সা ওড়ালে! এত দামী শাড়ি পরে যাব'টা কোথায়!

সুরজিৎ আর কথাই বলল না। চুপচাপ খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সোফায় এসে বসেছে। সিগারেট ধরাল একটা। ধোঁয়া কোনও ক্রিয়াই করছে না মাথায়, বরং বিরক্তিটাই পাক খাচ্ছে। সুন্দর করে ভেঁজে রাখা প্ল্যান ভেস্তে গেলে কার ভাল লাগে! এর ওপর জয়ন্তীর কুটুস কুটুস চিমটি! একেই বলে কপাল।

আবার টিভি চালিয়ে দিল সুরজিৎ। নাচগানের চ্যানেল। মোমমসৃণ শরীরের উচ্ছল দুলুনিতে যদি একটু শান্ত হয় চিত্ত।

জয়ন্তীরও আহার শেষ। এঁটো বাসনকোসন নামিয়ে এল সিংকে। ফ্রিজে খাবার ঢুকিয়ে দিয়ে ধমকাচ্ছে ছেলেকে,—বুবলু যাও, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ো।

বুবলুর মোটেই নড়ার ইচ্ছে নেই। বোধ হয় প্রোগ্রাম ফাইনাল না হলে তার ঘুম আসবে না। বুঝে গেছে এখন বেড়ানো নিয়ে কথা চালাচালি হবে বাবা মা'র, সেখানে উপস্থিত থাকাটা তার একান্তই জরুরি।

বুবলু গা মোচড়াল,—আর একটু থাকি মা!

—না। মনে রেখো তোমার ছুটির টাস্ক এখনও শেষ হয়নি। কাল সকালে

তাড়াতাড়ি উঠে সামস্ করবে। লেখাপড়া শেষ না হলে বেড়ানো বাতিল!

ধমকের কী ওজন! বুবলু কেন, সুরজিৎ পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

বুবলুর আর দাঁড়ানোর সাহস নেই। গুটিগুটি পায়ে হাঁটা দিয়েছে। শোওয়ার ঘরে ঢুকেও ফিরে এল,—আমরা তাহলে সত্যি যাচ্ছি তো বাপি?

—হুঁ।

—কোথায় যাব?

—সে দেখা যাবেখন। উত্তরটা জয়ন্তীই দিল,—এখন সোজা বিছানায় যাও। মশারি সাবধানে তুলবে, ভেতরে মশা ডেকে নিয়ো না।

বলেই টিভির আওয়াজ কমিয়ে দিল। উঠে গিয়ে ভেজিয়েও এলো দরজাটা। তারপর বাবু হয়ে বসেছে সোফায়।

সুরজিৎ আবার একটা সিগারেট ধরাল। বিরস মুখে। শব্দ এত কমে গেছে, গান প্রায় শোনাই যায় না। নাচ মনে হয় মূকাভিনয়। ধুস্, এ দেখে মজা আছে?

ঘাড় ঘুরিয়ে সুরজিৎ গুমগুমে গলায় বলল, বেড়ানোর ভূতটা এখন বুবলুর মাথায় না ঢোকালে চলছিল না?

—তোমার খুব অসুবিধে হল বুঝি?

—আশ্চর্য, জানোই তো এখন অফিসের অবস্থা। টালমাটাল সিচুয়েশান। যাব বলে ফাইনাল হল, তারপর হয়তো শনি রবিতেও ডেকে বসল। তখন কী হবে?

—আগে থেকেই কু গাইছ কেন? জয়ন্তী আরও গুছিয়ে বসল, একটা বন্দোবস্ত তো করা যাক।

—থাক। জায়গা কিন্তু তুমিই চুজ করবে। আমি কোনও ঝক্কি নেব না।

—জায়গা আমার ঠিক করাই আছে।

—কোথায়? জঙ্গল টঙ্গল?

—তাড়া কিসের? পরে জোনো। এতক্ষণ পর জয়ন্তীর ঠোঁটে মুচকি হাসি,—দারুণ স্পষ্ট। শ্যামলী আর শ্যামলীর বর গিয়েছিল।

শ্যামলী মানে জয়ন্তীর স্কুলের বন্ধু। শ্যামলীকে দুচক্ষে দেখতে পারে না সুরজিৎ। মোটেই মহিলা ভদ্র সমাজে মেলামেশার উপযুক্ত নয়। হাউহাউ চেঁচায়, আদিরসাত্মক ফাজলামো করে, শাড়ির আঁচল পর্যন্ত ঠিকভাবে রাখতে শেখেনি। বরটা তো চুচুর মুচুর। বউ একটু চোখ পাকালো, তো ওমনি কেঁচো!

সুরজিৎ মুখ বেঁকাল,—তোমার শ্যামলীর পছন্দর জায়গা? তারা তো চেনে শুধু ঝাড়গ্রাম আর ঘাটশীলা। সস্তায় মুরগি খেতে যায়। আমি কিন্তু এই গরমে ওসব জায়গায় যাচ্ছি না।

—ঝাড়গ্রাম-ট্রাম নয়। অন্য জায়গা। তুমি এবার বেড়ানোটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—ভেরি গুড। সুরজিৎ কাঁধ ঝাঁকাল,—তবে আগে থেকে না বললে বাস ট্রেনের টিকিট কিন্তু মিলবে না।

—ও ভারটাও আমার। হোটেল বুকিং-ও।

—বাহ্, মানুষ হয়ে গেছ দেখছি!... তবে মাথায় রেখো, যাতায়াত নিয়ে কিন্তু তিন দিন। সোমবার আমায় অফিস জয়েন করতেই হবে।

—জানি বাবা জানি। বার বার বলতে হবে না। শোবে তো এবার?

—যাচ্ছি। তুমি যাও।

—মনে করে আলো টালোগুলো নিবিও। কাল এ ঘরে লাইট জ্বলছিল।

আবার খোঁচা! সুরজিৎ খচে গেল একটু। বলতে যাচ্ছিল, জ্বলছিল তো জ্বলছিল, আমার পয়সা পুড়ছিল, তোমার কী! গিলে নিল কথাটা। রাত দুপুরে আর খ্যাচোরম্যাচোর পোষাচ্ছে না।

জয়ন্তী উঠে গেছে। বসে আছে সুরজিৎ। নিশ্চুপ।

সিগারেট নিবিয়ে টিভিটাও অফ করল সুরজিৎ। খচখচ করে উঠল মনটা। ফের তিন তিনটে সোনালি দিন মাঠে মারা গেল। আহা রে তিথিতে ডুবে থাকলে কত তরতাজা হয়ে যেত শরীর মন। তার বদলে ওই নীরস জয়ন্তী?

দেবে শেষ মুহূর্তে জল ঢেলে? বলবে ছুটি পাওয়া গেল না?

থাক গে, তিন দিনের তো মামলা। ছেলেটাও কত আশা করে আছে। বউ ছেলের জন্য কত কিছুই তো স্যাক্রিফাইস করে সুরজিৎ, একবার নয় তিথিসুখও ছাড়ল।

।। দুই ।।

সুরজিতের ঘুম ভাঙার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সওয়া ছটার আগে নয়, সাড়ে ছটার পরেও নয়। শয্যাত্যাগের পর নিদ্রার রেশ কাটায় মিনিট পাঁচ দশ, তারপর ব্যায়াম করে একটু। হালকা ফ্রিহ্যান্ড। দেহটাকে মোটামুটি ফিট্ রাখতে হবে তো। ইদানীং মধ্যপ্রদেশে চর্বি জমতে শুরু করেছে, কিছুদিন ধরেই তাই ভোরে উঠে হাঁটার কথা ভাবছিল। হয়ে উঠছিল না। গড়িমসি।

অবশ্য একটা বদলি বন্দোবস্ত হয়েছে সম্প্রতি। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে সুরজিৎ একটা যন্ত্র কিনেছে। ঘরে বসে হাঁটার। উঁহু, শুয়ে শুয়ে হাঁটার। যন্ত্রটির ওপর চরণযুগল রেখে সটান লেপটে যাও, সুইচ টিপে চালু করে দাও টাইমার,

ওমনি শরীরটাকে ঝাঁকাতে শুরু করবে যন্ত্র। পনেরো মিনিটে পাক্কা আড়াই কিলোমিটার হাঁটার ফল মিলে যাবে। এমন একটা ম্যাজিক মেশিন থাকতে কোন বুরবক পথে বেরোয়!

যন্ত্র অবশ্য আরও একটি আছে বাড়িতে। সুরজিতের খিতমদগারির। না চাইতেই সকালে সুরজিৎকে বার তিনেক চা জুগিয়ে যায় জয়ন্তী, সাড়ে সাতটা নাগাদ বাজারের থলি হাতে ধরিয়ে দেয়। ঘোড়ায় জিন দিয়ে বাজার সেরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাতের সামনে এসে যায় দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম। কাঁটায় কাঁটায় পৌনে নটায় ভাত। খাটের ওপর সাজানো থাকে ইস্ত্রি করা প্যান্ট শার্ট, কষ্ট করে শুধু পরতে হয় সুরজিৎকে। সব কটা কাজ জয়ন্তী এত নিঃসাড়ে করে, সুরজিৎ টেরই পায় না তার অস্তিত্ব। শুধু প্রয়োজনগুলোর নিখুঁত মিটে যাওয়া নিরুচ্চারে বলে দেয় কেউ একটা আছে এর পিছনে।

তা সারাটা সকাল সুরজিৎকে নিয়ে পড়ে থাকলেই কি চলে জয়ন্তীর? নজর রাখতে হয় সব দিকেই। বুবলুর পড়াশুনোটা একটু দেখতে হয়, ছেলের স্কুল থাকলে তার বইখাতা গোছানো, তাকে স্নান করানো, খাওয়ানো, সওয়া নটার মধ্যে স্কুলবাসের জন্য রেডি করা...। নিত্যনতুন টিফিন বানাতে হয় ছেলের, রোজ এক মেনু-বুবলুর মুখে রোচে না। আজ চাউমিন, তো কাল স্যান্ডউইচ। একদিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট, তো পরদিন লুচি-তরকারি। এছাড়া কাজের লোকের সঙ্গে লেগে থেকে থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি সামলানো তো আছেই। মাসের মধ্যে সাত দিন ডুব তো মতির মার বাঁধা। অজুহাতের তার অন্ত নেই। ট্রেন গণ্ডগোল। দাঁতব্যথা। শাশুড়ির জ্বর। ছেলের দাস্তবমি। সেই সব দিনে তো পাহাড় প্রমাণ কাজ এসে পড়ে ঘাড়ে। ওই হুটোপুটির সময়ে বাসন মাজা, মশলা করা, কুটনো কোটা...। রান্নাবান্না জয়ন্তী বরাবরই নিজের হাতে করে, সেও কম হ্যাপা নয়। এত সব কাজ এমন অবলীলায় করে যায় জয়ন্তী, যে মনেই হয় না সত্যি সত্যি কেউ করছে কাজগুলো। যেন আপনাআপনি চলছে সংসার। তেল মোবিল খাওয়া মেশিনের মতো।

আজও সব কিছুই হল যান্ত্রিকভাবে। তাড়াহুড়োর মাঝে ভ্রমণের প্রসঙ্গটা উঠলই না। না জয়ন্তী তুলল, না বুবলু। সুরজিতের মনে এল না সেভাবে। যথারীতি দশটার মধ্যে অফিস।

চেয়ারে বসতে না বসতেই চিফ ম্যানেজারের ডাক,—চৌধুরী, একবার আসবেন কাইন্ডলি?

হাঁপাতে হাঁপাতে সুরজিৎ দৌড়ল বিমল মল্লিকের চেম্বারে। গিয়ে দেখল ঠাণ্ডা ঘর আলো করে আছে জার্মান সাহেবরা।

বছর পঞ্চাশের টাকমাথা গাট্টাগোট্টা বিমল মল্লিকের ঠোঁটে হাসি পিছলোচ্ছে।

—চৌধুরী, আজ যে আপনাকে একটা গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

—বলুন স্যার।

—এঁরা আজ একটু রিল্যাক্স করতে চান। ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখবেন। আই মিন, দ্রষ্টব্য স্থানগুলো। ভিক্টোরিয়া, মিউজিয়াম, এই সব আর কি!

ব্যস্, হয়ে গেল। সারাটা দিন চক্কর। বৃটিশদের ব্যাপার স্যাপার বলে ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে নাক কুঁচকোল সাহেবরা, তবে দেখল মন দিয়ে। কারখানা পরিদর্শনের মতো যাদুঘরে কাটাল প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। বেলুড় দক্ষিণেশ্বর দেখারও খুব ইচ্ছে ছিল সাহেবদের। বোটানিকাল গার্ডেনও। হল না। খানিক গঙ্গার হাওয়া খেয়ে, আর নদীপারের রেস্তোরাঁয় বিপুল পরিমাণ পিৎজা আর আইসক্রিম সাঁটিয়ে আজকের মতো সুরজিৎকে যখন ছাড়ান দিল, ঘড়িতে তখন রাত আটটা দশ।

হাক্লান্ত দশায় বাড়ি ফিরল সুরজিৎ। মেজাজও খাট্টা। আজও তিথির সঙ্গে দেখা হল না। তিথি কি আজও অপেক্ষা করেছিল? বড় ঘড়ির নীচে? জি-পি-ও'র সামনে? সুরজিতের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে গেল? ইশ্ একটা ফোন করাও গেল না তিথিকে! সাহেবগুলো যেভাবে জড়িয়ে রইল সারাটা দিন! নাঃ, এবার একটা মোবাইল না নিলেই নয়!

বুবলু ড্রয়িংরুমে বসে কার্টুন দেখছিল। সুরজিৎ ফ্ল্যাটে ঢুকতেই লাফাচ্ছে তিড়িংবিড়িং।

—হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। মা সব ফাইনাল করে ফেলেছে।

তেতো মুখে সুরজিৎ জিজ্ঞেস করল,—কী ফাইনাল? কিসের ফাইনাল?

—বা রে, আমরা ঘুরতে যাচ্ছি না!

আবার তিথিকে মনে পড়ল সুরজিতের। দেখা হল না তিথির সঙ্গে। বলা হল না তিথিকে!

জয়ন্তী ফ্রিজের হিমশীতল জল নিয়ে এসেছে সুরজিতের জন্য। সুরজিতের কালো মুখখানা দেখে ছেলেকে বলল,—আহ্ বুবলু, পরে বোলো। বাবাকে আগে একটু রেষ্ট নিতে দাও।

জলটুকু শেষ করে সুরজিৎ বসল সোফায়। হেলান দিয়েছে। নট খুলছে টাই-এর। আলগাভাবে বলল,—কোথায় যাওয়া ঠিক হল শেষ পর্যন্ত!

—শুনবে। তাড়া কিসের? জয়ন্তী গ্লাসটা রাখতে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—বড়দা এসেছিলেন আজ।

—দাদা?

—হ্যাঁ। বিকেলে। অনেকক্ষণ ওয়েট করেছেন তোমার জন্য।

মনে মনে কারণটা আন্দাজ করল সুরজিৎ। বেজার মুখে বলল,—রিন্টির বিয়ের দিন বুঝি ঠিক হয়েছে?

—হ্যাঁ। শ্রাবণের চোদ্দ। জয়ন্তী পায়ে পায়ে কাছে এল,—দাদার বোধহয় আরও কিছু বলার ছিল।

—বলার তো একটাই কথা। আমার তো ওই চাকরি, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তুই না পাশে থাকলে রিন্টিকে কী করে পার করব বল্...!

—ঠিকই তো। আমরা আলাদা আছি বলে তো সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারি না।

—বটেই তো। বড় চাকরি করে আমি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

—তা কেন? রিন্টি তো তোমারও আপনজন।

—বোকো না। রোজগার তো করতে হয় না, বুঝবে কী করে কত হাড়মাস কালি করে পয়সা কামাতে হয়!

জয়ন্তী সরু চোখে দেখল সুরজিৎকে। তারপর সরে গেল সামনে থেকে।

সুরজিৎও উঠে পড়ল। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়ছে। খাটের ওপর গেঞ্জি পাজামা রাখাই ছিল, পাজামা গলিয়ে গেঞ্জি ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। স্নানে যাবে।

বুবলু পা টিপে টিপে দরজায় এসেছে। ফিসফিস করে ডাকল,—বাপি? ও বাপি?

—কী রে?

—মা কিন্তু টিকিট কেটে নিয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি।

ছেলের সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল সুরজিৎ। বুবলু যেন উত্তেজনায় ফুটছে।

সুরজিৎ চোখ নাচাল,—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ গো। দারুণ মজা হবে। সেখানে গিয়ে আমরা কুঁড়েঘরে থাকব।

—সর্বনাশ, তোর মা কোনও গ্রামেট্রামে যাচ্ছে নাকি? গাঁয়ে গেলে কিন্তু মাঠে গিয়ে পটি করতে হবে।

—গ্রামে না তো! মা তো বলল সমুদ্রের ধারে।

—সে কোন জায়গা? আমাদের দেশেই তো?

—হ্যাঁ গো। উড়িষ্যায়।

—পুরী?

—না না। কী যেন...? বলেই বুবলু একটু আগের নির্দেশ ভুলে চেঁচাচ্ছে,—মা? ও মা? বলো না মা আমরা কোথায় যাচ্ছি? কী যেন পুর?

জয়ন্তীর সাড়া নেই।

—দাঁড়াও। বলেই বুবলু সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে গেল ঘরে। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার খুলে বার করেছে একখানা গোলাপিরঙ কাগজ। বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—দ্যাখো দ্যাখো, এতে লেখা আছে।

ঈষৎ কৌতূহলে কাগজখানা হাতে নিল সুরজিৎ। ভাঁজ খুলতেই হাজার ভোল্টের শক। শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত নেমে যাচ্ছে। নীল অক্ষরগুলো কেঁপে উঠল আগুনের শিখার মতো।

এ কোন্ হোটেলের বুকিং! ক্যাসুরিনা হলিডে রিসর্ট, চাঁদিপুর!

এখানেই ছুটি কাটাতে যেতে হবে সুরজিৎকে? বউ বাচ্চা নিয়ে?

।। তিন।।

হাওড়া থেকে ভোরের ট্রেনে বালেশ্বর। এ ট্রেনটা বড় একটা লেট করে না, মোটামুটি পৌঁছে যায় সাড়ে দশটায়। স্টেশনে নেমে ভাড়া গাড়িতে তারপর চোদ্দ পনেরো কিলোমিটার পথ। পুরো রুটটাই সুরজিতের মুখস্থ।

পৌঁছে কী দেখবে তাও জানে সুরজিৎ। লোহার গেটঅলা বড়সড় পাঁচিলঘেরা কম্পাউণ্ড, ভেতরে তার সবুজের মনোরম সমারোহ। সবুজের রকমফের কত। ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ, কালচে সবুজ, টিয়া সবুজ। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। বেঁটে বেঁটে নারকোল গাছ আছে অগুন্তি। আছে কেয়াঝোপ, আছে ইতিউতি আম জাম পেয়ারা কাঁঠাল। সাগরপারে এত সব গাছ দেখা যায় না বড় একটা, রিসর্ট কর্তৃপক্ষই তাদের আমদানি করেছে এখানে। অবশ্য যা এখানকার মাটিতে এমনিই হয়, সেই কাজুগাছেরও কিছু অভাব নেই।

মোদ্দা কথা, ক্যাসুরিনা রিসর্টের প্রতিটি ধূলিকণাই সুরজিতের চেনা। মানুষজন, গাছপালা, সব। নয় নয় করে তিথির সঙ্গে কম বার তো আসেনি।

ট্রেকার কম্পাউন্ডে ঢুকেছে। ভাবনাচিন্তা মুলতুবি রেখে ভাড়া মেটাল সুরজিৎ। ডান দিকে জলাশয়টা দেখা যাচ্ছে। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ছড়ানো ছেটানো পরিচিত কটেজগুলো। কুঁড়েঘরের প্যাটার্নে তৈরি। খড়ে ছাওয়া। লাল মোরাম বেছানো সরু সরু রাস্তা চলে গেছে চতুর্দিকে। গাছ আর আগাছায় রিসর্ট চত্বরে বেশ একটা অরণ্য অরণ্য গন্ধ।

ভেতরে ঢুকেই বুবলু মুগ্ধ। আনন্দে হাততালি দিচ্ছে,—কী সুন্দর! কী সুন্দর! কোন কুঁড়েঘরটায় আমরা থাকব গো বাপি?

সুরজিৎ ছেলের মাথায় হাত রাখল,—তোর কোন কটেজটা পছন্দ?

—কটেজ নয়। কুঁড়েঘর কুঁড়েঘর।

—তাই নয় হল। যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি।

বুবলু চোখ ঘোরাল,—কুঁড়েঘরের ওয়ালগুলো কি মাটির, বাপি? ঝাঁপ আছে? দাওয়া?

—এসব তোকে কে শেখাল রে? ঝাঁপ! দাওয়া!

—মতির মা বলে তো।

সানগ্লাস খুলে চারদিকটা আলগাভাবে সরেজমিন করছিল জয়ন্তী। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল,—বুবলু, ভাষা ঠিক করো। মতির মা নয়, বলো সুষমামাসি।

ধমকের কী ঝাঁঝ! ঠিক যেন স্কুলের দিদিমণি! বুবলু কোন দিন না মাকেই আন্টিই বলা শুরু করে!

বকুনি খেয়েও অবশ্য বুবলুর উল্লাস নেবেনি। হঠাৎ নতুন এক জিজ্ঞাসা জেগেছে তার। নীচু গলায় বলল,—বাপি, এখানে কি সত্যি সত্যি মাঠে পটি করতে হবে?

সব কিছু জেনেও মানুষকে কখনও কখনও অজ্ঞ সাজতে হয়। সুরজিৎ কী করে এখন বুবলুকে বলে, দেখতে যতই কুঁড়েঘরের মতো হোক, প্রতিটি কটেজের অন্দরমহলই হাল ফ্যাশানের। দেওয়াল মোটেই মাটি লেপা নয়, ওটা নামী কোম্পানির রঙ। ফল্‌স সিলিং আছে খড়ের চালের নীচে। আলো পাখা ইংলিশ খাট ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিং টেবিল, এমনকি ফ্রিজ টিভিও ঘরে ঘরে মজুত। বাথরুম আছে লাগোয়া। শাওয়ার কমোড সমেত। গ্রাম্য খোলস পর্যটকদের টানে বলেই বহিরঙ্গে ওই কায়দা। মার্কেটিং-এর ভাষায় একেই না ইউএসপি বলে!

সুরজিৎ কৌশলে ছেলেকে থামাল,—দেখা যাক কপালে কী আছে!

—কিন্তু সমুদ্রটা কোথায় বাপি?

—কাছেপিঠেই আছে। চোখ বোজ্, শব্দ শুনতে পাবি।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজেছে বুবলু। পরক্ষণে মুখে হাসি ফুটেছে,—হ্যাঁ তো। হচ্ছে তো।

জয়ন্তী খানিকটা তফাতে সরে গেছে। বোধহয় সেও খুঁজছে সমুদ্রটাকে। কটেজগুলোর ওপারে ঝাউবন, তার পরে বালুতট, তারপর সমুদ্র। সুরজিৎ জানে। সমুদ্রের স্বর এখন ক্ষীণ। ভাটা পড়েছে বোধ হয়।

মোটাসোটা এক উর্দিপরা বেয়ারা এগিয়ে আসছে। সুরজিৎ সচকিত হল। সুভাষ। সুরজিতের বোতল টোতলের দরকার হলে এনে দেয়।

সামনে এসে থমকাল সুভাষ। অবাক মুখে ঘুরে দেখছে জয়ন্তীকে। চোখ পিটপিট করে বুবলুকেও।

সুরজিৎ চোখ টিপতে গিয়েও টিপল না। মানে লাগল। কায়দা করে চটপট বলে উঠল—এই যে ভাই, আমার ছেলে তো চিন্তায় পড়ে গেছে। তোমাদের কটেজগুলোতে বাথরুম টাথরুম আছে তো?

সুভাষ যথেষ্ট সেয়ানা। পলকে বুঝে নিয়েছে যা বোঝার। ট্যুরিস্ট স্পটের হোটেল কর্মচারী তো, এই ধরনের দৃশ্য তার কাছে মোটেই অদেখা নয়।

একগাল হেসে বলল,—কিছু ভাববেন না স্যার। আমাদের সব মডার্ন ব্যবস্থা। ইংলিশ টাইপ।

—বাঁচালে। আমার ছেলে তো ঘাবড়ে গেছিল।

সুরজিৎদের লাগেজ নামানো আছে গেটের গোড়ায়। একটা বড় স্যুটকেস, একটা ছোট, একটা হালকা কিটসব্যাগ। তিনটেই হাতে তুলে নিয়েছে সুভাষ। জিজ্ঞেস করল,—কটেজ বুক করা আছে তো স্যার?

—ও শিওর। জয়ন্তী? জয়ন্তীইই? বুকিং-এর কাগজটা দাও তো। অফিসিয়াল কাজগুলো মিটিয়ে আসি।

অলস পায়ে এসে রসিদটা দিল জয়ন্তী। তারপর বুবলুকে ডেকে নিয়ে এগোচ্ছে সমুদ্রের দিকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাড়িয়ে।

স্বস্তি বোধ করল সুরজিৎ। এ সময়ে জয়ন্তী দূরে দূরে থাকাই ভাল। তাও অফিসের বারান্দায় উঠে একবার দেখে নিল পিছন ফিরে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকল অফিসরুমে।

কাউন্টারে পৌঁছে আবার একবার ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। বসে আছে সেই কালোমতন লোকটা। ম্যানেজার। ওফ্, আবার একবার অপ্রস্তুতে পড়তে হবে সুরজিৎকে?

উপায়ও তো নেই কিছু। সুরজিৎ গলা খাঁকারি দিল,—এক্সকিউজ মী।

মাথা নামিয়ে ক্যালকুলেটারে কী যেন হিসেব করছিল লোকটা। মুখ তুলে সুরজিৎকে দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল,—ওয়েলকাম স্যার। হার্টি ওয়েলকাম টু আওয়ার রিসর্ট। বুকিং আছে তো স্যার?

—আছে। এই যে। সুরজিৎ চৌধুরী অ্যান্ড ফ্যামিলি।

ইচ্ছে করে ফ্যামিলি শব্দটাতে জোর দিল সুরজিৎ। কোনও বিশেষ অভিব্যক্তি ফুটল না ম্যানেজারের মুখে। বুকিং স্লিপ দেখার সময়ে একটু কি ভাঁজ পড়ল কপালে? মিস্টার অ্যান্ড মিসেসের সঙ্গে হঠাৎ একটা বাচ্চা দেখে? বোঝা গেল না।

পেশাদার ভঙ্গিতে এগিয়ে দিয়েছে রেজিস্টার,—ফিল আপ্ করুন স্যার।

সুরজিৎ নাম ধাম লেখা শুরু করল। সুরজিৎ চৌধুরী, মেল। এজ, ফরটি টু।

লিখেও দু'এক সেকেন্ড থমকাল। জয়ন্তী চৌধুরী না লিখে তিথি চৌধুরী লিখে দেবে? লাভ নেই, জয়ন্তীকে তো দেখতেই পাবে লোকটা। যাক গে যাক, যে যা ভাবে ভাবুক। দ্বিধা ঝেড়ে সুরজিৎ ফের কলম চালাল। জয়ন্তী চৌধুরী, ফিমেল। এজ, থারটি সিক্স। স্বপ্নদীপ চৌধুরী, চাইল্ড। এজ, ফাইভ।

লিখতে লিখতেই সুরজিৎ টের পেল ঝুঁকে দেখছে লোকটা। কী ভাবছে? জয়ন্তীকে দেখামাত্রই কি লোকটা লেবেল সেঁটে দেবে সুরজিতের গায়ে? লম্পট! অজান্তেই চোয়াল শক্ত হল সুরজিতের। ওই শ্যামলীটাই দায়ী এর জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ধুমসিটা। চাঁদিপুরে এসেছিলি, বেশ করেছিলি, এই রিসর্টেই উঠেছিলি কেন বাপ? ফিরে গিয়ে এমন ব্রেনওয়াশ করলি বন্ধুর, যে সে নাচতে নাচতে এখানেই বুকিং করে ফেলল? কী করে সুরজিৎ বলে, চাঁদিপুর যাব না, চাঁদিপুর যাব না? বললেও কি আর শুনত জয়ন্তী? চাঁদিপুর না আসার কী কৈফিয়তই বা ছিল সুরজিতের কাছে? বলা যায় কি চাঁদিপুরের সমুদ্রটা শুধু আমার আর তিথির? ওফ্, এখন সুরজিৎ ভালয় ভালয় তেরাত্তির পার করতে পারলে হয়!

জাবদা রেজিস্টার ঘুরিয়ে দিয়ে মুখে একটা ভারিক্কি ভাব আনার চেষ্টা করল সুরজিৎ,—ঘরে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দেবেন তো।

—এই গরমে চা খাবেন স্যার? বলেন তো ডাব পাঠিয়ে দিই? কচি দেখে? আপনি তো স্যার ডাবই...

—না। চা'ই পাঠান। লিকার। ঠান্ডা স্বরে পূর্ব পরিচয়টা ঝেড়ে ফেলল সুরজিৎ।

—অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার। ম্যানেজার কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে গলা ওঠাল,—যতীন! বারো নম্বর রেডি তো? যা, স্যারের লাগেজ পৌঁছে দিয়ে আয়।

মালপত্র বারান্দাতেই রেখেছে সুভাষ। যতীন উঠিয়ে নিয়ে চলেছে। পিছন পিছন সুরজিৎ। হঠাৎই নিজেকে খুব ছোট লাগছিল সুরজিতের। সুভাষ দেখল, যতীন দেখবে, এখনই তো গোটা কর্মচারীমহলে রাষ্ট্র হয়ে যাবে। ম্যানেজারকেও আর জয়ন্তীকে দেখা অবধি অপেক্ষা করতে হবে না। তার আগেই সেঁটে যাবে লেবেলটা। ইশ, প্রেস্টিজে একেবারে গ্যামাক্সিন!

সুরজিৎ শক্ত করলে নিজেকে। আরে দূর, ওই সব নগণ্য মানুষগুলো তাকে নিয়ে কী ভাবল, না ভাবল, তাতে কী আসে যায়? পয়সা দিয়ে থাকবে সুরজিৎ, সঙ্গে বান্ধবীকে এনেছে, না বউ ছেলেকে, তাতে কার বাপের কী?

বারো নম্বর কটেজ এক টুকরো মাঠের ওপর। সামনে গোটা কয়েক কাজুগাছ, পিছন ভাগে কেয়াঝোপ। কাজুগাছের গা বেয়ে ঢালু জমি, তারকাঁটার বেড়ায় ঘেরা। বেড়ার ওপারে সার সার ঝাউ। সেখানে থেকেই খাড়া নেমে গেছে বালুতট। ইয়া বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে টানা আছে বালুতটের সীমারেখা। জোয়ারের

সময়ে সমুদ্র এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ে ওই পাথরের ওপর, ভাটা পড়লে সরে যায় বহু দূর।

সুরজিতের সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছিল না। ঘরে ঢুকতেও না। তার চোখ বারে বারে চলে যাচ্ছে প্রান্তসীমার কুটিরটায়। তেরো নম্বর। ওই একটা মাত্র কটেজের সামনে ঝাউগাছের আড়াল নেই, সমুদ্র ওখানে পরিপূর্ণ উদোম। একান্তই নির্জন ওই জায়গাটা।

কুটিরটা সুরজিৎকে চুম্বকের মতো টানছিল। তালা ঝুলছে তেরো নম্বরে। কটেজটা কি খালিই আছে? নাকি সমুদ্রস্নানে গেছে বোর্ডার? অবশ্য খালি ভর্তি বন্ধ খোলা, সুরজিতের কাছে সবই সমান। কটেজটাই তো তার মূল দ্রষ্টব্য। ওখান থেকে তিথির গন্ধ ভেসে আসছে যে।

তিথির শরীরের মতো ওই কটেজেরও প্রতিটি খাঁজ দাগ কোণ অনুকোণ সুরজিতের মুখস্থ। একটুখানি তফাত রেখে পাশাপাশি দুটো সিংগলবেড খাট। তিথির নির্লোম ফর্সা দুটো পা। টুলসহ ড্রেসিংটেবিল। তিথির বাঁ উরুতে কালচে জড়ুল। দক্ষিণ কোণে দেওয়াল আলমারি। ডান হাঁটুতে ছোটবেলার কাটা দাগ। দেওয়াল ঘেঁষে চেয়ার টেবিল, নীল জগ, সোনালি এ্যাশট্রে। তিথির পিঠে পরপর তিনটে লাল তিল। দুখাটের মধ্যিখানে সরু লম্বা জুট কার্পেট। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা তিথির পিঠে রহস্যময় গভীর খাঁজ । ছবিতে ফুল হাতে হাস্যময়ী জাপানী তরুণী। বাথরুমের শাওয়ারে গোলাপি ঝাঁঝরি। তিথির গালের টোল। বাহুমূলের মাদকতা। তিথির গালের টোলটা ইদানীং যেন ভরে এসেছে। কিছুদিন আগে চশমা নিল, তারপর থেকে ডিম্বাকৃতি মুখটাও কেমন অন্য রকম। ওই কটেজেও কি শাওয়ার রঙ বদলেছে? গোলাপী থেকে শ্যাওলা সবুজ? কিম্বা গাঢ় নীল?

মনে হয় না। গত দু'বছরে কিছুই তো তেমন বদলায়নি রিসর্টের। ঘরদোর, গাছপালা পরিবেশ কিছু না। সমুদ্রের দিকে কাঁটাতারের বেড়া আজও প্রথম দিনের মতোই ভাঙা ভাঙা। কয়েকটা জায়গায় তো পুরো খুলে পড়েছে।

ওই কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে প্রথম বার সমুদ্রে নেমেছিল তিথি। এ্যাডভেঞ্চারের শখ। লাফিয়ে পাথরে নামতে গিয়ে পা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড।

সেবার সুরজিৎ খুব চোটপাট করেছিল ম্যানেজারের ওপর,—আপনাদের মেনটেনেন্স এত খারাপ কেন? কটা পয়সা খরচা করে কাঁটাতারটা সারাতে পারেন না?

ম্যানেজার কাচুমাচু মুখে বলেছিল,—ওটা তো ঠিক নামার রাস্তা নয় স্যার। সমুদ্রে যাওয়ার গেট তো আমরা বানিয়ে রেখেছি। সোজা পথে না গিয়ে বাঁকা পথ ধরা তো ঠিক নয় স্যার।

সত্যিই তো, চমৎকার একটা গেট আছে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য। গেট পেরোলেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে বালুতটে। পাশে এক চওড়া বেদীও আছে, বাঁধানো। বিকেল সন্ধেয় গিয়ে বসে বোর্ডাররা। গেটের এধারে মিনি চিল্ড্রেনস্ পার্কও আছে একখানা। লুকিয়ে লুকিয়ে বাচ্চাদের দোলনায় দোল খেতে কী যে ভালবাসে তিথি। ছেলে মানুষ, এখনও এক্কেবারে ছেলে মানুষ। কাঁটাতারের বেড়ায় পা কেটেও তো শিক্ষা হয়নি, লাষ্ট বার এসেও ওখান দিয়েই কায়দা কানুন করে নামল সমুদ্রে।

সুরজিতের ধ্যান ভেঙে গেল। চা এনেছে যতীন। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল,—চা কি ঘরে রাখব স্যার?

—রাখো।

—বানিয়ে দিয়ে যাব?

—থাক। ঢেলে নেব।

—এখন কি আর কিছু খাবেন?

—দাঁড়াও, তোমার ম্যাডাম আসুক।

শেষ উত্তরটা শুনে একটু কি চোরা হাসি ফুটল যতীনের ঠোঁটে? সুরজিৎ ছেলেটাকে দেখল আড়চোখে। ফুটলেও কিছু করার নেই, সুরজিৎকে এখন না দেখার ভান তো করতেই হবে।

।। চার।।

ঘর থেকে দুটো বেতের চেয়ার বার করে দিয়ে গেছিল যতীন। আরামকেদারায় নিজেকে এখন ছেড়ে দিয়েছে সুরজিৎ। চোখ বুজে ধূমপান করছে। সমুদ্র পর্যবেক্ষণ সেরে জয়ন্তী এসেছে কটেজে। পাশে বসে চা শেষ করল এই মাত্র। ঘরে গিয়ে টুকটাক করছে কী যেন।

বুবলু নেচে বেড়াচ্ছিল সামনেটায়। ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরার চেষ্টা চালাচ্ছিল। রোদ্দুরে মুখ লাল। ঘামছে। হাঁপাচ্ছে। তবু ক্লান্তি নেই।

তিড়িং করে বারান্দায় উঠে বলল,—বাপি? ও বাপি? আমরা সমুদ্রে চান করতে যাব না?

হাত বাড়িয়ে খপ করে বুবলুকে ধরল সুরজিৎ। মাথা নেড়ে বলল,—আজ নয়, কাল। কাল সকালে।

—কাল কেন?

—আজ সময় পেরিয়ে গেছে।

—সমুদ্রে চান করার সময় থাকে বুঝি?

—থাকে তো। সমুদ্র যখন কাছে আসে, তখন নামতে হয়। দেখছ না, সমুদ্র এখন দূরে চলে যাচ্ছে!

—সমুদ্র দূরে কেন চলে যায় বাপি?

—সমুদ্রের যখন মন খারাপ হয়, তখন সরে যায় সামনে থেকে।

—আবার মন ভাল হলেই কাছে আসে?

—নিশ্চয়ই। নাচতে নাচতে আসে তখন।

—কেন বাপি? সমুদ্র এরকম কেন?

—খুব মুডি তো, তাই।

বুবলু সন্দিগ্ধ স্বরে বলল,—তবে যে মা বলল...!

—কী বলল?

—সমুদ্র এখানে খাঁড়ি মতো... জলটা ভেতরে ঢুকে এসেছে... জোয়ারে জল বাড়লে তাই এগিয়ে আসে... ভাটার টানে জল কমে সরে যায়?

—বলেছে?

—হুঁ। এটাই নাকি প্রকৃতির নিয়ম। চাঁদ আর সূর্যর টানেই এমন হয়। সত্যি বাপি?

সুরজিৎ একটু বিরক্তই হল। পাঁচ বছরের ছেলের মাথায় এখনই এত বিজ্ঞান গুঁজে না দিলেই কি নয়? এই বয়সের বাচ্চাদের একটা কল্পনার জগৎ থাকবে না? রূপকথা থাকবে না? নাহ্, জয়ন্তী বড্ড বেশি কাঠখোট্টা হয়ে গেছে। দুনিয়ার তাবৎ রঙিন কল্পনাকেই জয়ন্তী যুক্তির পাতায় নামিয়ে আনতে চায়।

বেজার মুখে হাত উল্টোল সুরজিৎ,—হবে। তাইই হবে। তোমার মা যখন বলেছে।

বুবলু মাথা দুলিয়ে বলল,—মা এই সমুদ্রটার নামও বলেছে। বে অফ বেঙ্গল।

—হুম। আর কী কী জ্ঞান ঝেড়েছে তোমার মা?

—সমুদ্র কেন নীল হয়...

—কেন হয়?

—আকাশের ছায়া পড়ে। আকাশ নীল থাকলে সমুদ্র নীল। আকাশ কালো থাকলে সমুদ্র ঘোলাটে।

—তাই বুঝি? তা এখন আকাশ ঝকঝক করছে, তাও সমুদ্রকে ঘোলা লাগছে কেন?

বুবলু চিন্তায় পড়ে গেল। ঘাড় চুলকোচ্ছে। ডাকল,—মা? ও মা? এখন সমুদ্র ঘোলা কেন?

—আসল নীল পাওয়া যাবে শীতকালে। বলতে বলতে বেরিয়ে এল জয়ন্তী। চেয়ারে বসে আঁচলে ঘাম মুছছে। সুরজিতের দিকে ফিরে বলল,—তবে যাই বলো বাপু, আমার কিন্তু এই সমুদ্রটাই বেশি পছন্দ। বেশি নীল চোখে ক্যাটক্যাট করে।

সুরজিৎ ঠাট্টার সুরে বলল,—তোমার তাহলে এখন চাঁদিপুর ভালই লাগছে?

—লাগবে বলেই তো এলাম। তোমার ভাল লাগছে না?

সুরজিৎ উদাসভাবে বলল,—চলতা হ্যায়।

—তাহলে একবার অন্তত শ্যামলীর টেস্টের তারিফ করো। কী চমৎকার বন্দোবস্ত, টিপিকাল হোটেল বিল্ডিং-এ না থেকে কী সুন্দর একদম আলাদা হয়ে থাকা...

—প্লাস গিজগিজে ভিড় নেই।

—তাহলে স্বীকার করছ, না এলে জায়গাটা তুমি মিস করতে?

—তা তো বলি নি।... তবে হ্যাঁ, একদিন দুদিনের জন্য ঠিকই আছে..। বাই দা বাই, বেয়ারাটা বলছিল এখানে কী সব সাইট সিয়িং ফিয়িং আছে, যাবে নাকি?

—কী কী আছে?

—ওই তো, কী সব যেন। পঞ্চলিঙ্গেশ্বর টেম্পল্, তারপর কী যেন পাহাড় টাহাড়...

—দুৎ, সমুদ্রে এসে পাহাড়ে যাব কেন? মন্দির দেখেই বা কী হাত পা গজাবে? তার চেয়ে এই তো বেশ। শুয়ে বসে থাকো, সমুদ্রে নেমে পড়ো, সকাল বিকেল বিচ ধরে হাঁটো...

—ভেবে দ্যাখো। পরে কিন্তু বলো না আমি নিয়ে যাইনি। যদি চাও তো বাসে সিট ফিট বুক করে আসতে পারি।

—না বাবা, আমি এখান থেকে নড়ছি না।

কথার মাঝেই যতীন। চায়ের কাপ ট্রে তুলে নিতে এসেছে। বলল,—আপনাদের মিলটা বলে দেবেন স্যার?

যতীনের চোখের দিকে তাকাল না সুরজিৎ। বলল,—কী পাওয়া যাবে?

—যা অর্ডার দেবেন। ফিশ মাটন চিকেন...

বুবলু বলে উঠল,—আমি চিকেন। আমি চিকেন।

—তাহলে জয়ন্তী, তিনটে চিকেনই বলে দিই, কী বলো?

—আমি মুরগি খাব না। আমি প্লেন মাছ ভাত।

জানা কথা। জয়ন্তীর সঙ্গে ছোটখাটো পছন্দ অপছন্দগুলোও আজকাল মেলে না সুরজিতের। যদি সুরজিৎ মাছ ভাত চাইত এখন, জয়ন্তী নির্ঘাত চিকেন বলত। ফ্ল্যাটের দেওয়ালে পেস্তা রঙ করার খুব ইচ্ছে ছিল সুরজিতের, জয়ন্তী নাকচ করে দিয়ে ক্রিম রঙ লাগাল। সুরজিৎ হিন্দি সিরিয়ালের চ্যানেল খুললে বাংলা সিনেমা দেখার সাধ জাগবে জয়ন্তীর। ছেলের সঙ্গেই সুরজিতের একমাত্র যা পটে এখন। ওই ছেলের টানেই না এখনও দাম্পত্যটা টিকিয়ে রাখা।

যতীন আবার বলল,—তাহলে কী হল স্যার? দুটো চিকেন, একটা ফিশ?

—না, আমাকে মাছ দাও। শুধু বাচ্চার জন্য চিকেন। বলেই বিরস মুখে তাকাল জয়ন্তীর দিকে,—ঠিক আছে?

—সে তুমি খাবে, তুমি বুঝবে। আমি তো আমারটা বলে দিলাম।

যতীন অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল। কী ভেবে দাঁড়াল,—মিল্ কি ঘরেই সার্ভ করব স্যার?

জয়ন্তী পুট করে বলে উঠল,—কেন তোমাদের ডাইনিং হল নেই?

—আছে। যেতে পারেন।

যতীনের ঠোঁটে আবার সেই চোরা হাসি। কিম্বা হয়তো স্বাভাবিক হাসিই। সুরজিতের অতি সতর্ক মন বক্রভাবে দেখছে তাকে। তিথির সঙ্গে এলে তারা কখনোই ডাইনিং হলে যায় না, খাওয়ার সময়েও সুরজিতের একটু খুনসুটি চাই।

যতীনকে ঝলক দেখে নিল সুরজিৎ। যেন যতীনকে শুনিয়েই জয়ন্তীকে বলল,

—ডাইনিং হলে যাওয়ার দরকার কী? ঘরেই খেয়ে নাও না।

—না না, ঘরে এঁটোকাঁটা হবে।

—আমি তো ঘরই প্রেফার করি।

—তাহলে তুমি ঘরেই খাও। আমি আর বুবলু হলে খেয়ে আসি।

—থাক। এক সঙ্গেই খাব।

সুরজিৎ গোমড়া হয়ে গেল।

যতীন একই রকম হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল,—তাহলে কটা নাগাদ আসছেন স্যার?

সুরজিৎ রুক্ষ স্বরে বলল,—কেন, সেই বুঝে তোমরা রান্না বসাবে? আমরা ছাড়া রিসর্টে বুঝি আর কেউ নেই?

—এখন একটু ফাঁকাই যাচ্ছে স্যার। তবে গত হপ্তাতেও ফুল ছিল। কাল তো শনিবার, কাল আবার আসবে অনেক। আসা যাওয়াই তো স্যার চলে এখানে।

—ঠিক আছে। আমরা দেড়টা নাগাদ যাব।

যতীন চলে যেতেই জয়ন্তী বলল,—ইশ, হোটেলটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল, কালই ভিড় হয়ে যাবে? কোনও মানে হয়?

—তাতে তোমার কী? তুমি তোমার মতো থাকবে!

—তবু... বেড়াতে এসে ক্রাউড একদম ভাল লাগে না।

সুরজিৎ বলতে চাইল, আমারও কি লাগে? মুখে বলল,—সামার ভেকেশানের টাইমে চাঁদিপুর ভ্রমণের শখ জাগবে, আবার সেখানে নির্জনতাও চাই, দুটো তো একসঙ্গে হয় না।

গুমগুম করে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। কামান দাগার মতো। জয়ন্তী কান খাড়া ধরে শুনল,—কিসের আওয়াজ?

বুবলু গোল গোল চোখে বলল,—আমি বলব?

—বল্ তো?

—সমুদ্র ফাটছে।

দুশ্চিন্তা, বিরক্তি ভুলে হো হো হেসে উঠল সুরজিৎ,—দূর পাগলা! চাঁদিপুরে মিলিটারিদের গুলিগোলা টেস্ট হয়।

—মানে?

—আমাদের দেশে অনেকগুলো গুলিগোলার কারখানা আছে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে মিলিটারির লোকেরা সেগুলো বন্দুকে কামানে ভরে চালিয়ে দেখে নেয় কোনটা কত দূরে যাচ্ছে। সেই পরীক্ষাই হয় চাঁদিপুরে। সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখে।

বুবলু ঈষৎ শঙ্কিত হল। বলল,—গোলাগুলি যদি এমনি নৌকোয় গিয়ে পড়ে?

—পড়বেই না। আগেই খবর দেওয়া থাকে। যেখানে গুলিগোলার টেস্ট হয় তার ধারে কাছে নৌকো যাবেই না।

—যদি খবর না পায়? যদি যায়?

—তাহলে মরবে। সাবধান না হলে নৌকো ডুববে।

জয়ন্তী ছেলেকে টানছে। বলল, বুবলু, এবার কিন্তু গুলিগোলা তোমার দিকে আসবে।

—কেন?

—কথা শুনছ না! এখনও চানে গেলে না!

শুনেই বুবলু ফুড়ুৎ করে পালিয়েছে বারান্দা ছেড়ে। ঢাল বেয়ে কাঁটাতারের কাছে নেমে গেল। তেরো নম্বর কটেজের ঠিক সামনেটায়। লগবগে খুঁটিখানা ধরে নাড়াচ্ছে জোরে জোরে। খেলা।

জয়ন্তী গলা ওঠাল,—বুবলু বাড়াবাড়ি কোরো না। সাড়ে বারোটা বাজে, তোমাকে চান করিয়ে আমাকেও ঢুকতে হবে।

সুরজিৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলল,—যাও না, গিয়ে ধরে আনো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছ কেন? ...কাঁটায় হাত পা ছড়বে যে। এই তো কদিন আগে কাচে পা কেটে এল!

—আশ্চর্য, তোমার স্মরণে আছে?

জয়ন্তীর স্বরে শ্লেষ। সুরজিৎ গুম মেরে গেল। ছেলের কিছু হলে জয়ন্তীকে একাই সামলাতে হয় সব। স্কুলে ছোটা, ডাক্তারখানা—কোথায় বা সঙ্গ দিতে পারে সুরজিৎ? কথাটা মাঝে মাঝেই সুরজিৎকে মনে করিয়ে দেয় জয়ন্তী। সুরজিৎ গায়ে মাখে না তেমন। তবে এই মুহূর্তে কথাটা একটু যেন বিঁধল তাকে।

পিছনের কটেজ দুটোয় এক দঙ্গল লোক ফিরল কোথ্থেকে। বোধ হয় সমুদ্রস্নানে গিয়েছিল। তাদের উচ্চকিত কোলাহলে চমকে থেমে গেছে পাশের আমগাছের কাঠঠোক্রাটা। এতক্ষণে নির্জনতা ছিঁড়ে ফরদাফাই।

নেমে গিয়ে বুবলুকে ধরে আনল জয়ন্তী। ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে তেরো নম্বরের দিকে। একটু আগের ব্যঙ্গ বেমালুম ভুলে চকচকে চোখে বলল,—ওই কটেজটা কী দারুণ, তাই না গো?

ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করল সুরজিৎ। প্রাণপণ চেষ্টায় উদাস রাখল নিজেকে। উত্তর দিল না।

জয়ন্তী ফের বলল,—সামনেটা পুরো ফাঁকা। ঘর আর সমুদ্র, মাঝে আর কিছু নেই।

—হুম। একটু বেশিই ফাঁকা। অস্পষ্ট স্বরে বলল, সুরজিৎ।

—ওটা তো মনে হয় খালি আছে। দ্যাখো না, ম্যানেজারকে বলে ওটাতে শিফ্‌ট করা যায় কিনা। রাত্রে ওখানে ভীষণ ভাল লাগবে।

দুম করে আবার একটা গোলা ফাটল দূরে। নাকি কাছেই?

সুরজিৎ মাথা ঝাঁকাল,—না না, অত ফাঁকা ভাল নয়। রাতে সাপখোপ বেরোতে পারে।

—তুমি বড্ড ভীতু।

সুরজিৎ মুখে কুলুপ এঁটে রাখল। সব কথার পিঠে কি কথা হয়?

।। পাঁচ ।।

তিথির সঙ্গে সুরজিতের পরিচয়টা খুব বেশি দিনের নয়। জোর বছর দু-আড়াই। সুরজিৎদের অফিসের ফ্লোরে আর একটা প্রাইভেট কোম্পানির দপ্তর আছে, এক সময়ে সেখানে প্রায়ই আসত তিথি। তখন লিফ্‌টে করিডোরে তাকে বেশ কয়েক বার চোখে পড়েছিল সুরজিতের।

চোখ টানার মতোই চেহারা তিথির। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় সে বেশ দীর্ঘাঙ্গি, মাংসল না হলেও ভরাট স্বাস্থ্য, ডিম্বাকৃতি মুখখানা ভারী লাবণ্য মাখা, টানা টানা চোখ, ধারাল চিবুক, মাথার চুল কোমর ছুঁই ছুঁই। বয়স কতই বা, মেরে কেটে পঁচিশ ছাব্বিশ। এমন তরতাজা যৌবনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা কঠিন।

তিথির সঙ্গে আলাপ করার জন্য কি ছটফট করছিল সুরজিৎ? হয়তো বা। কিম্বা হয়তো কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল খানিকটা। মেয়েটা প্রায়ই দুপুরে ওই অফিসে আসে। কেন? প্রেমিক টেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যে নয়, বোঝাই যায়। তেমন হলে মুখে ওই বিষণ্ণতা লেগে থাকত না কখনও। চাকরি খুঁজছে? তা রোজ রোজ ওই অফিসেই বা আসবে কেন?

অবশেষে আলাপের একটা সুযোগও এসে গেল। কলকাতায় সেদিন প্রবল বৃষ্টি, অফিসপাড়া জলে থৈ থৈ, বিল্ডিং থেকে নেমে ঢাকা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল সুরজিৎ। ছকছিল কীভাবে বাড়ি ফেরা যায়। তখনই হঠাৎ আবিষ্কার করল লিফ্‌ট করিডোরের সেই মেয়েটা পাশেই দাঁড়িয়ে। মুখ যথারীতি শুকনো।

সুরজিৎ আগ বাড়িয়ে বলল,—ওয়েদারটা কী বিশ্রী হয়ে গেল, তাই না?

তিথি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল।

সুরজিৎ আবার বলল,—বাড়ি ফিরতে খুব ঝঞ্ঝাট হবে আজ। বাস টাসের যা হাল।

তিথি আবছা ভাবে বলল,—হুঁ।

—কোথায় যাবেন আপনি? কোন দিকে?

—সিঁথি।

কথা বলতে বলতে সুরজিৎ হঠাৎ দেখল খালি হচ্ছে একটা ট্যাক্সি। এক পাল লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ট্যাক্সির ওপর, সুরজিৎ সবার আগে গেট খুলে দখল নিয়েছে গাড়ির। সেদিন ওই মুহূর্তে ট্যাক্সিটা না পেলে, কিম্বা ট্যাক্সিটাকে অধিকার করতে না পারলে, সুরজিতের জীবনে তিথি হয়তো আসতই না।

ট্যাক্সির জানলা থেকে হাত নেড়ে তিথিকে ডেকেছিল সুরজিৎ,—চলে আসুন। আমি ডানলপ যাব। পথে আপনাকে নামিয়ে দেব।

সামান্য দ্বিধাগ্রস্তভাবে এল তিথি। টাক্সিতে যেতে যেতে অস্বস্তিটা বুঝি কেটেও গেল।

সুরজিৎ কথা বলছিল সহজ সুরেই। জিজ্ঞেস করল, আগরওয়াল ব্রাদার্সে আপনার পরিচিত কেউ চাকরি করেন বুঝি?

—করতেন। আমার বাবা।

—রিটায়ার করে গেছেন?

—নাহ্। রিটায়ারমেন্টের তিন বছর মতো বাকি ছিল। হঠাৎ সেরিব্রালে এখন একদম শয্যাশায়ী।

—ও!...ওঁরই পাওনা টাওনার ব্যাপারেই বুঝি...?

—হ্যাঁ। ঘুরছি খালি। লাভ হচ্ছে না। রোজই বলে কাল আসুন, পরশু আসুন।...

—মালিকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন? সুরেশ...বড় ভাইটা?

—করেছি। উনি তো বলেন, অ্যাকাউন্ট্সে ইন্স্ট্রাকশান দিয়ে দিয়েছেন, এবার যা হওয়ার ওখান থেকেই...। তিথির বাক রুদ্ধ সহসা। ভিজে গলায় বলেছিল—কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না। আসছি, ফিরে যাচ্ছি...

তিথির চোখের কোলে অশ্রুবিন্দুই কি সেদিন দুর্বল করে দিয়েছিল সুরজিৎকে? নাকি ভেতরে ভেতরে অন্য এক দুর্বলতাও ক্রিয়া করেছিল? চল্লিশের কাছাকাছি বয়স তার, বউ পুরোন হয়ে গেছে অনেকটাই, তাকে খানিকটা একঘেয়ে অভ্যাসের মতো লাগে। এমন একটা সময়ে অন্য কোনও মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাটাই তো পুরুষমানুষের দস্তুর। তাছাড়া সুরজিৎ এমন কিছু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নয়, নারীসঙ্গের প্রতি তার এক ধরনের আকুতিও আছে। মেয়েমানুষঘটিত শৌখিন-ফূর্তিকার্তায় এক আধবার মেতেছেও সে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। সুযোগ পেলে এমন পুরুষ তিথির দিকে ঢলে পড়বে, এ আর অভিনব কী?

তবে সঙ্গে সঙ্গেই নারীখাদক হয়ে ওঠেনি সুরজিৎ। তখন তার তিথির প্রতি সহানুভূতিটাই বেশি ছিল। আগরওয়ালাদের অফিসে চেনাজানা ছিল কয়েকজন, তাদের বলে কয়ে তিথির বাবার প্রাপ্যটুকু মাসখানেকের মধ্যেই বার করে ফেলেছিল।

সম্পর্কটাও পাকতে লাগল একটু একটু করে। কৃতজ্ঞতা জানাতে একসঙ্গে একটু চা খাওয়া, একটুখানি সঙ্গ দেওয়া...। তারপর দুম করে একদিন তিথি নিয়ে গেল বাড়িতে, বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সুরজিৎ স্বচক্ষে দেখল তিথির

বাবার সুস্থ হয়ে ওঠার আশা প্রায় নেইই, একেবারেই পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন তিনি। দেখল তিথির অকর্মণ্য দাদাটিকে। শ্রীমান শৈবাল একটি লক্কা পায়রা, রকবাজি ছাড়া তার কোনও কাজ নেই, সংসারের সামান্যতম দায়িত্বও সে কাঁধে নিতে পারবে না। ছোট্ট একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন তিথির বাবা, মা মেয়ের তাই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু আছে, কিন্তু পেটটা চলবে কিসে? লাখ সওয়া লাখ মতন মিলেছে অফিস থেকে, তবে তাতেই বা চলে কত দিন?

চেষ্টাচরিত্র করে তিথিকে একটা কাজ জুটিয়ে দিল সুরজিৎ। তাদেরই কোম্পানির এক কনট্রাক্টরের অফিসে রিসেপশানিস্ট। পাবে হাজার দু আড়াই মতো। তা হোক, নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল।

তা এই ধরনের সম্পর্কে দাবী তো একটা আপনাআপনিই এসে যায়। তিথিকে সুরজিৎ প্রথম চুমু খেয়েছিল পরিচয়ের পাঁচ মাস পরে। তিথিদেরই বাড়িতে বসে। আগ্রাসী পুরুষের মতো নয়, ভীরু প্রেমিকের মতো। বাধা তো দেয়ই নি তিথি, বরং তার যেন সম্মতিই ছিল। যেন সে মেনেই নিয়েছিল এটুকু অধিকার না ছাড়াটা চরম বেইমানি হবে। কিম্বা তিথি হয়তো মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিল সুরজিকে। কৃতজ্ঞতা তো অনেক সময়েই বদলে যায় প্রেমে।

চুমু খাওয়ার মাসখানেক পরেই হঠাৎ একদিন তিথি বলল,—আমাকে ক'দিনের জন্য একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে? খোলা হাওয়ায়? কোনও ফাঁকা জায়গায়? এই দমবন্ধ পরিবেশে আমি বড় হাঁপিয়ে পড়েছি।

প্রস্তাবটা শুনেই সুরজিতের সর্বাঙ্গে দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি। রক্ত উথাল পাথাল। বুবলু হওয়ার পর থেকে জয়ন্তী তো সত্যিই শুধু অভ্যাস এখন, স্বাদবর্ণগন্ধহীন পানীয় জলের মতো। সুরজিতের ছোট ছোট কামনা বাসনাগুলোই বা জয়ন্তী সেভাবে মেটাতে পারে কই!

তবু সুরজিৎ তক্ষুনি তক্ষুনি সংযম হারায়নি। হেসে বলেছিল, আমার সঙ্গে বাইরে যাওয়ার পরিণাম কী জানো?

—জানি। তুমি আমাকে গপ করে খেয়ে ফেলবে।

—তার পর?

—তার আর পর নেই। আমি আর অত ভাবতে পারি না। যদি কিছু ভাবনা থাকে, তুমি ভাবো।

কিন্তু তোমার বাবা মা কী মনে করবেন? তোমার দাদা?

—দাদার কথা ছাড়ো। ফোরটোয়েন্টি নাম্বার ওয়ান, এখানে সেখানে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে... আমাকে নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। আর আমার বাবা-মাকে তো তুমি কবেই গিলে বসে আছ। তুমি তাদের কাছে ভগবানের মনুষ্য

এডিশান। অবতার নাম্বার এগারো।

কথাটা তো ভুল নয়। তিথিদের সংসারে বিপদের দিনে স্তম্ভের মতো খাড়া আছে সুরজিৎ। মেয়ের ওই মাইনেতে সংসার তো মসৃণভাবে চলার কথা নয়, ভর্তুকিটা কোথা থেকে আসছে তা কি তাঁরা বোঝেন না? তাছাড়া মেয়ের ওই সামান্য রোজগারটুকুর জন্যও সুরজিতের মতো খুঁটিটা জরুরী, এও তো তাঁরা জানেন। নইলে কি সুরজিৎকে দেখামাত্র অযথা খুশিতে চোখ ঝিকঝিক করে ওঠে তিথির মায়ের? শুরু হয়ে যায় জামাই আদর।

নিরাপত্তার অভাব তো এভাবেই পঙ্গু করে দেয় বিবেককে। স্বার্থপর হয়ে যায় নিজের বাবা-মা'ও।

যাই হোক, তখন থেকেই শুরু। খেলার। প্রথমবার ডায়মন্ডহারবার, পরেরবার ফুলেশ্বরের ডাকবাংলো, তারপর এই চাঁদিপুর। ক্যাসুরিনা হলিডে রিসর্টের তেরো নম্বর কটেজ। একবার নয়; বার বার।

একবারই খালি তেবো নম্বরটা জোটেনি। দোলের সময়। ক্যাসুরিনার কলকাতা অফিসে বুকিং করতে গিয়ে ভীষণ হতাশ হয়েছিল সুরজিৎ। শান্ত নির্জন ওই একটেরে কুটিরটা যে তাকে কী ভয়ংকরভাবে টানে। রাত বাড়লে ওই কুটির যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মায়াবী দ্বীপ হয়ে ওঠে। দূরে সমুদ্রের ডাক, আর কানে ঝিঁঝিপোকার শব্দে ক্রমশ বিবশ হয়ে আসে দুটো শরীর। নোন্‌তা বাষ্প তখন চাঁদের আলো মেখে ভাসতে থাকে কুটিরের চারপাশে।

তিথি মাঝে মাঝে বলে,—তুমি কিন্তু কটেজটায় অবসেস্‌ড হয়ে যাচ্ছ।

তিথির ভেজা ভেজা ঠোঁট থেকে নুনটুকু মুছে নেয় সুরজিৎ। বলে,—জোরে জোরে নিশ্বাস নাও, দ্যাখো একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ পাবে।

ঝিরঝির হাসে তিথি। নাক টানে জোরে জোরে,—পাচ্ছি। আঁশটে গন্ধ।

তিথির নাভিতে মুখ রাখে সুরজিৎ,—আরও জোরে নিশ্বাস নাও।

—পাচ্ছি। ঘামের গন্ধ।

—আরও জোরে।

শ্বাস টানতে গিয়ে তিথির নাকের পাটা ফুলে ওঠে,—পাচ্ছি। বিপদের গন্ধ।

—কিসের বিপদ?

—কটেজ নাম্বারটা মনে রেখো মশাই। আনলাকি থার্টিন।

ওই আনলাকি থার্টিনেই যে কেন নজর পড়ল জয়ন্তীর? তাকেও কি টানছে কটেজটা? কোনও ভৌতিক আকর্ষণে?

উঁহু, সুরজিৎ বুঝতে পারছিল না।

।। ছয়।।

বিকেলের সমুদ্র সরে গেছে আরও দূরে। বহু দূরে। পড়ে আছে শুধু এক শান্ত জলস্তর। অগভীর। কোথাও পায়ের চেটোটুকু ডোবে, কোথাও গোড়ালি, কোথাও বা হাঁটু। দিশাহীন বাতাসে জলস্তর কাঁপছে মৃদু মৃদু, ভেজা বালি কখনও পাথরের মতো কঠিন, কখনও বা পিছল কাদা। কিনারার কাছাকাছি পর পর কয়েকটা কালো খুঁটি। জলে আধডোবা। খুঁটির মাথায় বসে সমুদ্রকে পাহারা দিচ্ছে গোটাকতক নিশ্চল বক। তাদের ডানায় পড়ন্ত সূর্যের আলো।

জয়ন্তী আর বুবলু হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। পিছিয়ে পড়েছে সুরজিৎ। বুবলু লাফাতে লাফাতে মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছে জলে, ছুটতে ছুটতে ফিরছে বালিতে।

সিক্ত বেলায় ছড়িয়ে আছে অজস্র ঝিনুক। কোমর নুইয়ে ঝিনুক কুড়োচ্ছে জয়ন্তী, জড়ো করছে শাড়ির কোঁচড়ে।

একটা বড়সড় কালচে রঙ কিসের যেন একটা ছোট্ট কংকাল হাতে তুলে দৌড়ে এল বুবলু,—এটা কী বাপি?

সুরজিৎ চোখ কুঁচকে দেখল,—মনে হচ্ছে শংকরমাছ!

—এহ্, শংকরমাছের তো লম্বা লেজ থাকে। লেজ দিয়ে চাবুক হয়।

—কে বলল?

—মা।

সুরজিৎ আলগা হাসল,—তাহলে বোধহয় চাবুকটা খসে গেছে।

—আমি কিন্তু এটা কলকাতায় নিয়ে যাব বাপি।

—ছিঃ। পচা গন্ধ বেরোচ্ছে! কটেজে নিয়ে রাখলেই পিঁপড়ে লেগে যাবে।

—কিছু হবে না। আমি এটা কাল রোদ্দুরে শুকিয়ে নেব।

কঙ্কালে লেগে থাকা পচা গলা অবশেষ শুধু শুকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হয় না, পচা অংশ নির্মমভাবে চেঁছে ফেলে দিতে হয়।

দার্শনিক ভাবনাটাকে গিলে নিয়ে সুরজিৎ বলল,—কী করবি এটা নিয়ে গিয়ে?

—এটা হবে আমার কালেক্শান। বন্ধুদের দেখাব। রঙ লাগাব এর ওপর। এখানে গোল গোল দুটো চোখ আঁকব, আর এই মাঝখানটায় নাক...

একটানা বকেই চলছে বুবলু। সুরজিৎ আর শুনছিল না। একটু যেন ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। দুপুরে খেয়েদেয়ে জয়ন্তী বুবলু ঘুমিয়ে নিয়েছে ঘণ্টাখানেক,

শুধু সুরজিতেরই শোওয়া হল না। চোখ বুজলেই হাজির হচ্ছে তিথি। আর ওই হতচ্ছাড়া কটেজটা।

সুরজিৎ হাঁটা থামাল হঠাৎ—অ্যাই, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর তো আর কদ্দূর যাবে?

বুবলু যেতে গিয়েও থমকে গেছে। জনমানবহীন সৈকতে নেমে আসছে এক পাল গরু, তাদের গলার ঘণ্টি এলোমেলো বাজছে টুং টুং। পা টিপে টিপে গরুগুলোকে পার হল বুবলু। তারপরই ভোঁ দৌড়।

জয়ন্তীর কাছে পৌঁছে চেঁচিয়ে বলল,—বাপি, মা বলছে মোহনা অব্দি যাবে।

ওফ্, অসহ্য। ক্রোধে সুরজিতের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। সেই কখন হাঁটা শুরু হয়েছে, এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা, কত দূরে মোহনা তার ঠিকঠিকানা নেই, তবু তাকে চলতেই হবে? কোথায় এখন তিথির কাঁধে মাথা রেখে সমুদ্রের ধারে বসে থাকবে তা নয়, ট্যাঙোস ট্যাঙোস করতে হবে বিকেল ভর?

অবশ্য তিথির এবার ইচ্ছে ছিল জঙ্গলে যাওয়ার। দলমা ফরেস্ট। শালমহুয়ার বনে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাবে তিথি, বড় বড় পাতার ফাঁক দিয়ে সোঁ সোঁ হাওয়া বইবে, শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে ভেঙে ছুটবে সুরজিৎ, গাছের আড়াল থেকে তাই দেখে উচ্ছল ঝরনা হয়ে হাসিতে মাতাল হবে তিথি—আহাহা, ভাবতেই গোটা শরীর জুড়ে রোমাঞ্চ। ওই যে উদ্দেশ্যহীন বাধাবন্ধনহীন দৌড়ের খ্যাপামো, তার উত্তেজনা কী তীব্র, তা কি জয়ন্তী বুঝবে কোনও কালে?

জয়ন্তী না হয় নেহাতই উত্তাপহীন। মামুলি। ওই উত্তেজনার অর্থ সুরজিৎই কি ছাই পুরোপুরি বোঝে? যদি বুঝত, তাহলে ওই পরিণতিহীন সম্পর্ক কি টিকে থাকত এতদিন?

তা কেন? সুরজিৎ মাথা ঝাঁকাল আপন মনে। পরিণতিই কি সব? সাময়িক সুখটুকুর কোনও মূল্য নেই? কিম্বা রহস্যের? রহস্যই তো অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখে সম্পর্ককে। রহস্য মুছে গেলে পুরুষের চোখে মেয়েমানুষ তো ম্যাড়মেড়ে। জোলো। জয়ন্তী সেই রহস্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তিথি পেরেছে। অন্তত এখনও পর্যন্ত। তাছাড়া তিথির সংশয়হীন নির্ভরতা, তাকেই বা সুরজিৎ অস্বীকার করবে কী ভাবে? পঙ্গু বাবা, চিন্তায় চিন্তায় বুড়িয়ে যাওয়া মা, অপদার্থ দাদাকে নিয়ে তিথি যখন অকূল পাথারে, তখন কে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল? সুরজিৎ—সুরজিৎই তো। সেই মুহূর্তে তো প্রত্যাশাও ছিল না সেভাবে। এখন তিথির ওই সঙ্গটুকু, আর এক ফালি নীল আকাশ চাওয়াটা কি খুব বেশি কিছু? শরীরের আনন্দও তো তাদের দুজনের, সুরজিতের একলার নয়। এতে সুরজিতের অপরাধই বা কী আছে?

জয়ন্তী হাত নেড়ে ডাকছে সুরজিৎকে। বিরক্তিমাখা স্বরে সাড়া দিল সুরজিৎ,—কীই?

সমুদ্র থেকে হু হু ছুটে আসছে বাতাস। বাঁ দিকের ঝাউবনে আছাড় খেয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ঢেউ-এর মতো। ভাঙা বাতাস টলমল করছে পাড়ে। বাতাসের ওপার থেকে জয়ন্তীর গলা আর শুনতে পেল না সুরজিৎ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বুবলু জয়ন্তী উধাও হয়ে যাচ্ছে একটা বাঁকের আড়ালে।

দীর্ঘ পথ ফুরিয়ে এল ক্রমশ।

সামনে এখন অন্য ছবি। এক পাশে সমুদ্র, অন্য পাশে বিশাল চওড়া এক চর। ছোট ছোট বালিয়াড়ি। অনেকটা দূরে সরে গেছে ঝাউবন, চরের বুকে শুয়ে আছে নদী। রুপোলি পাতের মতো। বুড়িবালাম।

ছবিটা মন্দ লাগল না সুরজিতের। আগে কখনও সে আসেনি এদিকে। সময়ই পায় না আসার। যখন বাইরে সমুদ্র, ঘরেও সমুদ্র, তখন কোন বুদ্ধু মোহনা খুঁজতে ছোটে? কিন্তু এই দিগন্তজোড়া চরটা তো বেশ। একবার তিথিকে এনে দেখাতে হবে।

খানিক এগিয়ে বাঁকটুকু ঘুরেই সুরজিৎ পাথর সহসা। যা দেখছে তা কি সত্যি? অলৌকিক কিছু নয় তো? বালির ওপর যত দূর চোখ যায়, শুধু ফুটে আছে টুকটুকে লাল ফুল। উঁহু, ফুল নয়। কাঁকড়া। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লাল কাঁকড়া।

সুরজিৎ প্রাণভরে দৃশ্যটা দেখছিল। এদিকে বুবলু মেতেছে অন্য খেলায়। কাঁকড়াগুলোর দিকে এক পা এক পা করে এগোয় সে, সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে মিলিয়ে যায় একরাশ কাঁকড়া। আবার এক পা এগোল, আবার আর একটা ঝাঁক ভ্যানিশ। আরও এগোতেই পিছনের ফুলেরা পুট পুট ফুটে উঠল বালিতে, সামনের লাল ফুলেরা মুখ লুকোল। বুবলু যেদিকেই ছোটে, সেদিক থেকে মিলিয়ে যায় রক্তকুসুম, অন্যদিকে জেগে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে।

পলকের জন্য হৃৎপিণ্ড বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল সুরজিতের। ও কাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে বুবলু? কাঁকড়া? নাকি মনেরই গভীরে লুকিয়ে থাকা কোটি কোটি কামনা বাসনা? যারা সামান্য বিপদের ঘ্রাণ পেলেই আড়ালে পালায়, আবার সুযোগ বুঝলেই ঝুপ করে বেরিয়ে আসে, গোটা মনের দখল নেয়?

আরে ছোঃ কামনা বাসনা যদি নাই থাকে, তাহলে জীবনটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ানোর অর্থটা কী? বাসনার ধর্মই তো এই, এক জায়গায় চাপা পড়লে অন্যত্র ফুটে বেরোবে। কিসের এত ভয়? কেনই বা এত ধুকপুকুনি? একটা মাত্র নারীকে

আজীবন ভালবেসে যেতে হবে, এমন দাসখত কবে কোথায় লিখে দিয়েছে সুরজিৎ? নিয়মের শিকলে থোড়াই বাঁধা যায় মানুষের মন। সুরজিৎ কি বঞ্চিত করেছে জয়ন্তীকে? মোটেই না। স্বামী হিসেবে সংসারের জন্য যা যা করা উচিত, সবই তো সে করে চলেছে। তার পরেও যদি সুরজিতের মনে আরও একটা মেয়েকে ভালবাসার মতো জায়গা থাকে, সেটা কি তার পাপ? নাকি সেটাই তার হৃদয়ের বিশালতা?

সুরজিৎ খানিকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করল। গ্লানিটা কেটে যাচ্ছে মন থেকে। দু-হাত ছড়িয়ে আড় ভাঙল সুরজিৎ। শরীরের। হয়তো বা মনেরও। শ্রান্ত চরণযুগলকে সতেজ করতে করতে থেবড়ে বসে পড়েছে মাটিতে।

জয়ন্তী কাছে এল,—কী হল, বসে পড়লে যে?

—শরীর আর চলছে না। পা টনটন করছে।

—কিন্তু ফিরতে হবে তো।

—আমি আর হাঁটতে পারব না।

জয়ন্তীও বোধহয় কাহিল। বলল,—এখান থেকে রিক্সা ফিক্সা পাওয়া যাবে না।

—কী করে বলব? জয়ন্তীর অসহায় স্বরে সুরজিৎ একটু মজাই পেল,—শখ করে চলে এলে, এবার ঠেলাটা বোঝো।

—ওই দিকে তো আলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে কিছু নেই?

মনে মনে হাসল সুরজিৎ। ভালমতোই জানে ওখানে একটা বাজার আছে। মাছের আড়তও। একবার অটোরিক্সায় ওদিকে এসেছিল। চিংড়িমাছ কিনতে।

সুরজিৎ ইচ্ছে করেই একটু বেপরোয়া হল,—চলো, বাজারে অটো পাওয়া যাবে। বলেই পরক্ষণে ঢোক গিলেছে,—আই মিন, ম্যানেজার বলছিল।

বাজারটায় দোকানপাট আছে বেশ। বসে চা খেল সুরজিৎরা। সঙ্গে গরম গরম চিংড়ির বড়া।

বুবলুর ঝাল লাগছিল। মুখে তুলল না বড়া। ক্লান্তিতে ঢুলছে। অটোরিক্সায় ওঠামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যিখানে বুবলু, দুপাশে বাবা মা। অন্ধকারে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে অটোরিক্সা। হেডলাইটের আলোয় যৎসামান্য আলোকিত হচ্ছে পথ, বাকি সবটাই আঁধার। দু ধারে ঘন কালো কেয়াঝোপ। পুষ্পহীন। গন্ধহীন। বাজারের আঁশটে গন্ধই এখনও তাড়া করে আসছে গাড়িটাকে। দূরে বড় বরফ কারখানাটার আলো ঝলমল করে উঠল একবার, পলকে ঢেকে গেল গাছগাছালির আড়ালে।

বহুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করল সুরজিৎ। পারছে না। হাওয়ার ঝাপটায় জ্বলেই নিবে যাচ্ছে আগুন। পর পর বেশ কয়েকটা কাঠি নষ্ট হল। তবু চালিয়ে যাচ্ছে চেষ্টা।

জয়ন্তী বসে আছে চুপচাপ। হেলান দিয়ে। হঠাৎই বলল,—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

সুরজিতের হাত থেকে খসে গেল দেশলাইটা। ঝুঁকে কুড়োতে কুড়োতে বলল,—কী?

কিছুই বলল না জয়ন্তী। তার দৃষ্টি বাইরের আঁধারে স্থির। রুপোলি নদী আবার পাশে এসেছে, অন্ধকারে চলছে সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে নদীতে হাল্‌কা আলোর বিচ্ছুরণ। বুড়িবালামের স্রোতকে বড় দুঃখী দেখায় এখন।

জয়ন্তী নদী দেখছিল। নাকি অন্য কিছু?

।। সাত।।

দশ নম্বর কটেজের সামনে জমিয়ে আসর বসেছে রাত্রিবেলা। একজোড়া মেয়ে জামাই, দুই বুড়ো বুড়ি, আর গোটা তিনেক বাচ্চা সমানে কিচিরমিচির করে চলেছে। তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে জয়ন্তীও। খানিক আগে জয়ন্তীকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল বুড়োটা, এখন কীসব গল্প শোনাচ্ছে, মাঝে মাঝে ফোয়ারা উঠছে হাসির।

সাগরের উতল হাওয়া থেমে গেছে সহসা। ওমনি জেঁকে বসেছে বিশ্রী গরম। ভ্যাপসা। চিটচিটে। নুন মাখা।

বারান্দায় বসে ঘামছিল সুরজিৎ। একে এই গরম, তায় যা পরিশ্রম গেছে। বুবলুটা ঘুমিয়ে পড়লে মহা যন্ত্রণা, ব্যাটা একেবারে ছানা কুম্ভকর্ণ বনে যায়, ওই ছেলেকে কাঁধে ফেলে রুমে ফেরা, তারপর তাকে টানতে টানতে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া, আবার বয়ে এনে বিছানায় শোয়ানো—বাপস্! বুবলু কি আর আগের মতো ছোট্টটি আছে, যে সুরজিৎ তাকে তুলে অবলীলায় ঘুরে বেড়াবে?

সুরজিৎ বেতের চেয়ারটা সামনের ঘাসে নামিয়ে নিল। যদি একটু হাওয়া মেলে! যদি একটু দেহ জুড়োয়! অদূরে কালি মাখা ভূতের মতো নিঝুম দাঁড়িয়ে তেরো নম্বর কটেজ। জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে। সিগারেট ধরিয়েছে। তামাকের ধোঁয়ায় যদি একটু আরাম মেলে!

আবার জয়ন্তীর হাসি উড়ে এল। বেশ জোরে জোরে হাসছে। জয়ন্তীর এত উচ্চকিত হাসি বহুকাল শোনেনি সুরজিৎ। কী এত আড্ডা মারছে? সুরজিতকে

ছেলে পাহারাদারিতে বসিয়ে সেই যে ভাগল্‌বা হল, আর কোনও হুঁশটি নেই? আজব মেয়েছেলে! দুপুরে নির্জনতা হারানোর শোকে পরিতাপ করছিল, এখন দিব্যি নিজেই ভিড়ের মাঝে খোশগল্পে মাতোয়ারা! কখন যে কী চায় জয়ন্তী?

সুরজিতের বুকের ভেতর একটা চোরকাঁটা খচখচ করে উঠল। তখন কী যেন বলতে চেয়েও জয়ন্তী চেপে গেল। কী কথা? একবার যখন গিলে ফেলেছে, তখন তার পেট থেকে কথাটা বের করা খুব কঠিন। জয়ন্তীর স্বভাবটাই এরকম। ভয়ঙ্কর চাপা। জিদ্দিও আছে খুব। চিরটাকাল। সুরজিতের সঙ্গে বিয়েটা জয়ন্তীর বাবা মা প্রথম দিকে মেনে নেননি, ভ্যানতাড়া ছিল নানা রকম। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতের ছেলে বিয়ে করবি? কী আছে ওর মধ্যে, কোয়ালিফিকেশনেও তোর থেকে কম! তুই এমএ পাস করেছিস, ও তো নেহাতই গ্র্যাজুয়েট। ওর চেয়ে অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ আসবে, বংশের মুখ পোড়াস্‌নি! জয়ন্তী কোনও কথাকেই আমল দেয়নি। রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা সারল, তারপর প্রায় একবস্ত্রে চলে এল সুরজিতের কাছে। কোনও দুঃখ নেই, হাহুতাশ নেই, বাবা মা'র জন্য মন খারাপ নেই...! কিম্বা হয়তো ছিল, সুরজিতের সামনে প্রকাশ করেনি। অথচ এই জয়ন্তী বিয়ের আগে বাবাঅন্তপ্রাণ ছিল। সেই বাবার সঙ্গে জয়ন্তী বিয়ের পর প্রথম দেখা করতে গেল পাক্কা দেড় বছর পর। তাও বাবার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে। এত তেজ!

সুভাষ রুমে জল দিতে এসেছে। সুরজিতের সামনে ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টেরচা চোখে তাকাল সুরজিৎ,—কী চাই?

সুভাষ ঘাড় চুলকোল,—ছোট একটা আছে স্যার। ফরেন। দিয়ে যাব?

কড়া একটা ধমক দিতে গিয়েও সামলে নিল সুরজিৎ। সুভাষ তো বলতেই পারে, সে তো এই কাজেই অভ্যস্ত। সুরজিৎ অবশ্য নিয়মিত মদ খায় না, তবে এখানে এলে ওই জিনিস একটু তার চাই-ই চাই। তিথিও চুকুর চুকুর চুমুক দেয় গ্লাস থেকে। রাতও বাড়ে, নেশায় দুজনের চোখও জড়িয়ে আসে অল্প অল্প। মদ্যপানের গুণও আছে। বিলকুল সাফ হয়ে যায় বিবেক। নোনা হাওয়ায় নেশা আরও জেঁকে বসলে মৃদু মৃদু দুলতে থাকে বাইরের কাঁটাতার, সমুদ্র আকাশ পৃথিবী ভরে যায় অপার্থিব মায়ায়। যেন এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনও শোক নেই, সমস্যা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, জটিলতা নেই, আছে শুধু এক ছেদহীন আনন্দ। অনন্ত। অপার। যেন সেতার সরোদের ঝালা। বাঁশী নূপুরের যুগলবন্দী। কামনায় টন্‌কো দুটো শরীর বাজতে থাকে সুরে।

কিন্তু সেই নেশা কি এখন চলে? এই মুহূর্তে? নিটিপিটি গেরস্থর মতো ছেলে বউ নিয়ে বেড়াতে এসে?

গলা ঝেড়ে সুরজিৎ বলল,—না, লাগবে না।

তবু দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ। প্রত্যেক বার এই সময়টায় কিছু বকশিশ জোটে, সম্ভবত সেই আশায়।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পার্স বার করে সুভাষকে একটা দশ টাকার নোট দিল সুরজিৎ। ক্ষণিকের জন্য মনে হল জয়ন্তীকে ডেকে দিতে বলবে কিনা! থাক গে, যখন আসার আসবে।

সুভাষ চলে যেতেই হালকাভাবে তিথিকে মনে পড়ল। কী করছে তিথি এখন? টিভির সামনে বসেছে? নাকি সুরজিতের কথাই ভাবছে? জয়ন্তীর সঙ্গে এল বলে মনে মনে পুড়ছে কী? মনে হয় না। তিথির মনে কোনও হিংসে নেই। সে তো জানেই জয়ন্তী আছে, জয়ন্তী থাকবেও। এ সব ছুটকো ছাটকা দায়িত্ব সুরজিৎকে পালনও করতে হবে।

তবু যেন খবরটা শুনে পরশু একটু মুখ ভার হয়েছিল তিথির। বলেছিল,—ভাল। এবার তোমায় চাঁদিপুরে চোরের মতো যেতে হবে না।

সুরজিৎ তরল স্বরে বলেছিল,—অভিমান হয়েছে মনে হচ্ছে?

—নাহ্। মান অভিমান কি আমার সাজে? আমি কি তোমার বউ?

—তুমি বউ-এর চেয়েও বেশি। বউ পুরোন হয়, প্রেমিকা হয় না।

সামান্য হেসেছিল তিথি। ম্লান হাসি। যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল ওই হাসিতে। ওই ছায়ামাখা মুখ দেখে একটু খারাপ লাগছিল সুরজিতের। আবার যেন নিশ্চিন্তও হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। যাক, আশঙ্কার কিছু নেই, সুরজিতের দিক থেকে এখনও মন সরেনি তিথির।

এরকম একটা দুটো ভাবনাই চনমনে করে দেয় মন। শরীরও। গুনগুন গান ধরেছে সুরজিৎ,—সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী... লাউয়ের আগা খাইলাম, ডগা খাইলাম, লাউ দিয়া বানাইলাম ডুগডুগি...

জয়ন্তী ফিরল। বারান্দায় উঠে ঘরে উঁকি মেরে এল একবার। তারপর চেয়ার নিয়ে বসেছে মুখোমুখি। বলল,—বুবলুবাবু তো একেবারে ন্যাতা।

—বেচারাকে যা হাঁটিয়েছ!

—শোওয়ানোর আগে ওকে হিশি করে নিয়েছিলে?

—হুম্।

অন্য সময়ে এই প্রশ্ন করলে খেঁকিয়ে উঠত সুরজিৎ। বলত, দায়িত্বজ্ঞান তোমার একার নেই, আমারও কিছু আছে।

আজ ওদিক মাড়ালই না। লঘু স্বরে বলল,—ভিড়ভাট্টা তো দেখছি এখন তোমার খুব ভালই লাগছে!

—ফ্যামিলিটা খুব জমাটি।

—সে তো বোঝাই যায়। যা হাহা হিহি চলছিল!

—ভদ্রলোক একটা মজার গল্প বলছিলেন।

—মানে কেঠো বুড়োটা?

—আহা, এখনও যথেষ্ট ফিট আছেন। দারুণ রসিক। বেয়াল্লিশ বছর আগে এখানে হানিমুন করতে এসেছিলেন, সেই গল্পটাই...

—বাহ্, বাহ্, মেয়ে জামাইকে সামনে বসিয়ে, অপরিচিত এক মহিলাকে নিজের হানিমুনের গল্প! ডিটেলে সব বলল বুঝি?

—সমস্ত কথার এরকম খারাপ মানে করো কেন? নাতি নাতনি হয়ে গেছে, এখন তো মেয়ে জামাই বন্ধুর মতো।

—হুম্। তা কী গপ্পো শোনালেন তিনি?

—খুব ইন্টারেস্টিং। ওঁরা যখন এসেছিলেন, তখন নাকি এতসব হোটেল রিসর্ট কিছু ছিল না। ওই দিকে, পান্থনিবাসের দিকটায়, একটা মাত্র বাংলো ছিল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। বাকি জায়গাটা ছিল জঙ্গল।

—বুঝেছি। ভদ্রলোক এক ঢিলে তিন পাখি মারতে চেয়েছিলেন। সমুদ্র জঙ্গল বউ।

—আহা, শোনই না। তো হয়েছে কী... সদ্য বিয়ে হওয়া বর বউ পূর্ণিমায় সমুদ্র দেখবেন বলে ঠিক করেছেন। সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যাওয়ার আগে একবার ঘরে ঢুকেছেন কি ঢোকেননি, ওমনি এক কেলোর কীর্তি।

—ডাকাত টাকাত পড়ল?

—না না। শোনই না।... বেরোতে গিয়ে দেখেন, কে যেন বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর চিৎকার, ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কি কিছুতেই কেউ দরজা খোলে না। থেকে থেকে খালি মাতাল চৌকিদারটা হুংকার ছুঁড়ছে, খবরদার, হুঁশিয়ার...। নতুন বউ তো কেঁদে কেটে একশা, এই বুঝি কোনও সর্বনাশ হল...। ভদ্রলোকও কাঁপছেন ঠকঠক। একবার দরজায় ফাঁক দিয়ে উঁকি মারেন, আর স্ত্রীকে এসে সান্ত্বনা দেন, ভয় কি, আমি তো আছি।

—হয়েছিল কোনও বিপদ?

—উঁহু। রাতটা তো কোনও মতে গুটিসুটি মেরে কাটল। যেই না ভোর হয়েছে, ওমনি দেখেন তালা খোলা, আর চৌকিদার দাঁত বার করে হাসছে। বলছে, বকশিশটা দিন বাবু, এবারকার মতো আপনাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম...

—কেন? সুরজিতের গলায় ব্যঙ্গ,—সমুদ্র থেকে রাতে বাঘ টাঘ উঠেছিল নাকি?

—ভদ্রলোকও তো ভেবেছিলেন ওরকমই কোনও অঘটন টঘটন ঘটেছে। পরে শুনলেন অন্য গল্প।

—কী রকম?

—কী হতে পারে আন্দাজ করো।

—সরি। পারলাম না। ওই আজগুবি কাহিনী শোনার আমার আর ইন্টারেস্টও নেই।

—তবু শোন। ... এক অদ্ভুত মিথ নাকি চালু আছে এখানে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদিপুরের সমুদ্র নাকি এতই অপরূপ হয়ে ওঠে, সাধারণ মানুষ সেই সৌন্দর্য নাকি সহ্যই করতে পারে না। উন্মাদ হয়ে যায়। অনেকে নাকি সমুদ্রে নেমে আত্মহত্যাও করেছে। জয়ন্তী দম নিল একটু। তারপর গলা নামিয়ে বলল,—কী অদ্ভুত ব্যাপার, না? সৌন্দর্য দেখার জন্য দুজনে ছুটে এসেছিলেন, অথচ ওই সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঠেকাতেই চৌকিদারটা...।

—ফুঃ যত সব গুলগল্প!

—গুল হোক, আর গল্পই হোক, ঘটনাটার আয়রনিটা কিন্তু লক্ষ করার মতো।

—ওই গ্যাঁজা শুনেই হাসছিলে?

—না, না। সে আর একটা মজার গল্প।

—বুড়ো বুঝি মজার হোলসেলার?

—তাইই বটে।... ভদ্রলোকের তখন নাকি একটা ইয়া তাগড়াই গোঁফ ছিল। ভোজপুরী দারোয়ানদের হার মানানো। সেই গোঁফের ভয়ে নতুন বউ, মানে মাসিমা নাকি ঠকঠক করে কাঁপতেন, বরের কাছে ঘেঁষতে চাইতেন না। হানিমুনে এসেও নাকি সারাক্ষণ সিঁটিয়ে ছিলেন।... তা সেই যে সে রাতে আরও বেশি ভয় পেয়ে বরটির হাত চেপে ধরেছিলেন, ওমনি বর সম্পর্কে ভয় টয় ঘুচে গেল। আর সেদিন থেকেই নাকি ভদ্রলোকেরও দুর্দশার শুরু। ওই চেপে ধরা হাতের জ্বালায় কোথাও এক চুল একটা নড়তে পারেন না, রণে বনে জলে জঙ্গলে ওই হাতই সর্বত্র ভদ্রলোকের পাহারাদার।

—বুঝলাম। বুড়ো বউ-এর আঁচল-ধরা, তাই তো?

—সে তুমি যেভাবে ব্যাখ্যা করো। তবে এই বৃদ্ধ বয়সেও ভদ্রলোকের মুখে চোখে কী স্যাটিস্‌ফ্যাকশান।... বোঝাই যায়, ওঁরা খুব সুখী কাপল্। খুব লাকি।

জয়ন্তীর কথায় কি ইঙ্গিত আছে কোনও? সুরজিৎ আর জয়ন্তী দুঃখী জুটি, এমনই কিছু প্রতিপন্ন করতে চায় না তো?

চাঁদ নেই। আকাশ লাল হয়ে আছে। দূরে, বহু দূরে, আকাশ যেখানে সাগর ছুঁয়েছে, সেখানে ছোট ছোট বিদ্যুতের ঝিলিক। মাঝে মাঝে আকাশের অনেকটাই

চিরে যাচ্ছে রুপোলি চমকে। আলোয় আলো হয়ে যাচ্ছে ঝাউবন, পরক্ষণে যে আঁধার সেই আঁধার।

আচমকাই সুরজিতের মনে ফিরে এল কথাটা। জিজ্ঞেস করল,—তুমি যেন তখন কী বলবে, বলছিলে?

—হুম।

একটু আগের উচ্ছল জয়ন্তী ঝুপ করে নির্বাক হয়ে গেল। যেন আনমনা হঠাৎ।

সুরজিৎ সোজা হয়ে বসল,—কী? বলো।

জয়ন্তী সময় নিচ্ছে। আকস্মিকভাবেই উঠে গেল ঘরে। বোধহয় জল টল খেতে। কিম্বা ছেলেকে দেখতে। ফিরে ফের বসল চেয়ারে।

সুরজিতের অপরাধী মন অধৈর্য হল,—কায়দা মারছ কেন? ঝেড়ে কাশো না।

জয়ন্তী সহজ সুরে বলল,—আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

—ও। বড় একটা পাথর যেন সরে গেল সুরজিতের বুক থেকে। নাহ্, তার **চতুরতায়** এখনও গলতি নেই কোনও। পর মুহূর্তেই জেগে উঠেছে পৌরুষ। ভারী **গলায়** বলল,—চাকরি পেয়েছ মানে?

—চাকরি মানে চাকরি। কাজ।

—কোথায়?

—একটা স্কুলে। প্রাইভেট স্কুল।

—হঠাৎ তোমার চাকরির কী দরকার পড়ল?

—পড়ল।

—তোমার হাত খরচে কম পড়ছে?

জয়ন্তী দু'এক সেকেন্ড থেমে থেকে বলল,—তা ঠিক নয়। আমার মনে হচ্ছে নিজের একটা রোজগার থাকা ভাল। অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম, জুটে গেল একজনের ব্যাকিং-এ। জুলাই-এর গোড়ায় জয়েনিং।

—চাকরির চেষ্টা করছ, কখনও বলোনি তো?

জয়ন্তী চুপ।

—কে ব্যাক করল তোমায়? কাকে ধরেছিলে?

—সে তুমি জেনে কী করবে? আছে আমার একটা বন্ধু।

অল্প তাতলো সুরজিৎ। খর গলায় বলল,—তা অ্যাদ্দিন পর চাকরি করতে দৌড়লে আমার সংসারটা কী হবে, অ্যাঁ? আমার ছেলের?

—বুবলুকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হয়েছে কখনও? ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

সুরজিৎ গুমগুমে স্বরে বলল, স্ট্রেট বলে রাখছি; আমার মত নেই।

—তোমার মত তো চাইনি। পেয়েছি, জানিয়ে রাখলাম।

—আচ্ছা? খুব সাধ জেগেছে স্বাধীনতার, অ্যাঁ?

এবারও কোনও জবাব নেই জয়ন্তীর।

সরু চোখে জয়ন্তীকে দেখল সুরজিৎ,—মাইনে কত দেবে?

—সব মিলিয়ে গোড়ায় সাড়ে পাঁচ হাজার মতোন। খুব কম?

—কটা থেকে কটা স্কুল?

—যেমন হয়। দশটা থেকে চারটে। ভাবছি সামনের বছর বুবলুকেও ওই স্কুলে ভর্তি করে দেব। আমার সঙ্গেই যাবে আসবে।

—অসম্ভব। বুবলুকে ওই স্কুল থেকে ছাড়াতে আমি দেবই না। তোমারও চাকরি করার কোনও প্রয়োজন নেই।

জয়ন্তী প্রতিবাদ করল না। তর্কও না। আস্তে আস্তে উঠে গেল সামনে থেকে।

সুরজিৎ গর্জে উঠতে চাইল। স্বর ফুটল না। এই নিঃশব্দ চলে যাওয়া যে কী অসহায় করে দেয় এক এক সময়ে!

।। আট।।

সুরজিৎ স্বপ্ন দেখছিল।

এক অতিকায় পতঙ্গ যেন ঢুকে পড়েছে তার ডানলপের ফ্ল্যাটে। ঝটপট করছে পোকাটা। উঁহু, পোকা নয়, প্রজাপতি। না না, প্রজাপতিও নয়, মথ। এলোপাথাড়ি উড়তে উড়তে ঠোক্কর খাচ্ছে এ দেওয়ালে সে দেওয়ালে। থেমে থাকা পাখায়। ঘরের সিলিং-এ। মথটার ডানায় কী অসম্ভব জোর! ফ্ল্যাটের দেওয়াল কেঁপে উঠল থরথর। জানলায় শব্দ হচ্ছে ঝনঝন। শব্দ বাড়ছে, ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এত উচ্চগ্রামে পৌঁছে গেল যে কানে তালা লাগার জোগাড়।

সুরজিৎ মথটাকে তাড়াতে চাইল। পারছে না। হঠাৎ দেওয়াল ভেদ করে কোথ্থেকে এক রাশ কনকনে বাতাস ধেয়ে এল। কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর। শীত করছে, ভীষণ শীত।

শব্দ আর শীতের যুগপৎ আক্রমণে ঘুম ছিঁড়ে গেল সুরজিতের। চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। সে এখন ঠিক কোথায়? ডানলপের বাড়িতে? নাকি কোনও খোলা মাঠে?

চাঁদিপুরের বারো নম্বর রুমটাকে চিনে উঠতে সুরজিতের সময় লেগে গেল মিনিট খানেক। কী প্রবল ঝোড়ো বাতাস বইছে বাইরে! একেই কি পাগলা হাওয়া বলে? ওই বাতাসই খেলনার মতো ঝাঁকাচ্ছে কটেজের দরজা জানালা। হিম ঢুকিয়ে দিচ্ছে দেহের খাঁচায়, ঠকঠক কাঁপছে হাড়পাঁজরা।

কখন এমন ঝড় উঠল?

বাইরের বাতিগুলো সব নিবে গেছে। আঁধারে চোখ চালিয়ে পাশের খাটটাকে দেখার চেষ্টা করল। কিছুই পরিষ্কার নজরে আসে না। রাত কত এখন?

সুরজিৎ হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ডের কাছে গেল। ঘরের আলো জ্বলতেই চমক।

বুবলু ঘুমোচ্ছে, গায়ে চাদর ঢাকা। দরজা হাট।

জয়ন্তী নেই।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে সুরজিৎ হাই তুলল। টেবিলে রাখা রিস্টওয়াচ তুলে দেখল সময়। দুটো চল্লিশ। রাতদুপুরে কোথায় বেরোল জয়ন্তী? বাথরুমে যে নেই বোঝাই যাচ্ছে, বাথরুমের বাতি নেবানো।

ঘুম ঘুম চোখে সুরজিৎ দরজায় এল। যা ভেবেছে তাই, জয়ন্তী বারান্দায় বসে। জয়ন্তীকে ঘিরে অন্ধকারের আস্তরণ।

সুরজিৎ আবার হাই তুলল একটা। ডাকল, কী করছ বাইরে? এত রাত্তিরে।

অন্ধকার নড়ল না।

—অ্যাই, রুমে এসো। ঝড় উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

অন্ধকার সাড়া দিল না।

সুরজিৎই গেল অন্ধকারের কাছে। পিঠে হাত রেখে বলল, কী ব্যাপারটা কী তোমার? হলটা কী?

এবার সামান্য কেঁপেছে অন্ধকার,—কিছু না। এমনিই।

—ভাবছটা কি বসে বসে?

অন্ধকার আবার নিশ্চুপ।

সুরজিৎ এবার ছুঁয়েছে অন্ধকারের মুখ গলা। অস্ফুটে বলল,—ইশ, গা হাত পা তো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

অন্ধকার এতটুকু উত্তাপ নিল না সুরজিতের হাত থেকে। নির্লিপ্তভাবে বলল,—তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

—তুমি বসে থাকবে?

—আমার ঘুম আসছে না।

সুরজিৎ আর একটু নিবিড় হলো। কোমল স্বরে বলল,—রাগ হয়েছে?

—না।

—কী ভাবছ আমাকে বলবে না? চাকরির কথা?

—না। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গল্পটাই ভাবছিলাম। জয়ন্তীর কণ্ঠ তুহিনশীতল,—কালই তো পূর্ণিমা, তাই না।

।। নয়।।

নটার মধ্যে সমুদ্রে এসে গেছে সুরজিৎরা। রাতের ঝড়ের কোনও চিহ্নমাত্র নেই এখন, আকাশ আজ পুরোপুরি নির্মেঘ। ঝড় যেন মালিন্য মুছে নিয়েছে আকাশের। সকালের ঝকঝকে রোদ্দুর হাসছে প্রাণ খুলে। তাপ এখনও চড়া নয়, বইছে নরম বাতাস। খুশির মেজাজে।

পূর্ণিমার টানে সমুদ্র আজ রীতিমতো উত্তাল। সকাল সকাল চলে এসেছে কাছে। ফুঁসছে। তেজী যুবকের মতো সার সার ঢেউ মিছিল করে এসে হাত পা ছুঁড়ছে পাড়ে। বোল্ডারে আছাড় খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

বুবলুরই জলে নামার উৎসাহ সব থেকে বেশি। মার হাত চেপে ধরে তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে সে। সাহস দেখিয়ে মার হাত ছাড়িয়ে ঢুকল একটু ভেতরে, বেশি নয়, দু-চার পা। আচমকা এক বড়সড় ঢেউ ধেয়ে এল, সঙ্গে পোঁ পোঁ উল্টো দিকে দৌড়। দুহাতে বেড় দিয়ে ধরেছে মার কোমর। ঢেউ-এর চকিত ধাক্কায় জয়ন্তীও ছেলে নিয়ে চিৎপটাং। দু'তিনটে ঘুরপাক খেয়ে মা ছেলে দু'জনেরই দিশেহারা হাল। বুবলু খাবি খেয়ে কাশছে খকখক, চোখ করমচার মতো লাল। জয়ন্তীও দম নিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সজোরে। থু থু করে মুখ থেকে বার করছে লবণাক্ত জল।

নিরাপদ দূরত্বে বসে সুরজিৎ হেসে উঠল হা হা। আজ স্নানার্থীদের ভিড় আছে বেশ, আশপাশের হোটেলের বাসিন্দারাও নেমেছে সমুদ্রে। সবাই যে সমুদ্রস্নানে উৎসাহী নয়, কেউ কেউ জল ছুঁয়েই পুলকিত। সুরজিৎও সেই গোত্রের। জলে সে নামে না বড় একটা। তিথির আহ্বানেও নয়। মাঝেমধ্যে ঢেউ-এ পা রেখে একটু জলের স্পর্শ নিয়ে আসা, ব্যস। জলে পা ডুবিয়ে বসে তিথির অস্থির হুটোপুটি দেখাতেই তার বেশি সুখ।

এই মুহূর্তে অবশ্য তার দৃষ্টি গেঁথে আছে জয়ন্তীতে। বুবলুকে পাড়ে রেখে জয়ন্তী আড়াআড়িভাবে প্রবেশ করছে সমুদ্রে। সালোয়ার কামিজ পরেছে জয়ন্তী,

ওড়নাটা বেঁধে নিয়েছে কোমরে। আলতো চাপড়ে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। টপকে পার হচ্ছে মাঝারিদের। আর বড় ঢেউ এলেই জলের নিচে ডুব। ভিজে বালিতে বসে মনে হয় এ যেন জয়ন্তী নয়, অন্য কোনও অচিন নারী, যাকে সুরজিৎ ভাল করে দেখেনি কোনও দিন। সালোয়ার কামিজ লেপটে আছে জয়ন্তীর শরীরে, দেহের প্রতিটি ভাঁজ এখন আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট। বুক। কোমর। উরু। নিতম্ব। অতি পরিচিত দেহলতা অপরিচিত হয়ে কতকাল পর সুরজিৎকে টানছে আবার। এ ঠিক সেই অভ্যাসের টান নয়, এ এক অচেনা সম্মোহন।

সুরজিৎ উঠে দাঁড়াল। নামল জলে। বাবাকে নামতে দেখে হৈ হৈ করে উঠল বুবলু, তাকে সঙ্গে নিল না সুরজিৎ, জয়ন্তীর পাশে এসে দাঁড়াল হাঁটুজলে। জয়ন্তীর ঘাড় গলা জলে বালিতে চিকচিক।

সুরজিতকে দেখে জয়ন্তী অবাক,—নামব না বলে হঠাৎ এলে যে বড়?

বউ-এর কোমর বেড় দিয়ে ধরল সুরজিৎ—চলো, একটু ভেতরে যাই।

জয়ন্তী সরে গেল,—না না, বেশি জলে ব্যালান্স রাখতে পারব না।

সুরজিৎ ছোট্ট একটা ঢেউ টপকাল। এক হাতে চাপ দিল জয়ন্তীর কোমরে, অন্য হাত জয়ন্তীর কাঁধে রেখেছে, কিচ্ছু হবে না, চলো তো।

পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেল জয়ন্তী,—না, আমি যাব না।

—এসো না, প্লিজ।

—না।

জয়ন্তীর চোখে বিচিত্র এক দৃষ্টি। ভয়ও নয়, প্রত্যাখ্যানও নয়, ঘৃণাও নয়, ভালবাসাও নয়। তবে যে কী আছে ওই চোখে?

কথা বলতে বলতে জয়ন্তী সরছে পিছন পানে। পাড় অভিমুখে। চেঁচিয়ে বলল,—বেশি দূরে যেও না কিন্তু। ভেতরে চোরা টান আছে।

সুরজিতের জলে নামার বাসনাটাই মিইয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বুবলু ছুটে এসে বাবাকে জাপটে ধরল,—চলো না বাপি জলে যাই। চলো না বাপি।

ছেলের বায়না মেটাতে সুরজিৎকে এগোতেই হল খানিকটা। ঢেউ এলেই উঁচু করে তুলে ধরছে বুবলুকে, নামিয়েও দিচ্ছে সময়মতো। কোমরজলে দাঁড়িয়ে।

—আপনাদের কি আজকেই লাস্ট?

তাকেই বলছে কি? সুরজিৎ ঘাড় ঘোরাল। পাশেই দশ নম্বরের বড় জামাই। পেটানো চেহারা, বক্সার বক্সার। ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মতো হাসছে লোকটা।

সুরজিৎ অল্প চোয়াল ফাঁক করল,—লাস্টও বলতে পারেন। ফার্স্টও বলা যায়।

কিছু কিছু লোক থাকে যারা গায়ে পড়ে আলাপ জমানোর অছিলা খোঁজে। জল স্থল অন্তরীক্ষ—জায়গার কোনও বাছবিচার নেই। নুন জলে কুলকুচি করে নিয়ে লোকটা বলল,—হাতে একটু সময় নিয়ে আসবেন তো! নীলগিরি পাহাড়টা ঘুরে আসতে পারতেন।

—তাই?

—হ্যাঁ মোওয়াই। পাহাড়ের টপে কী সিনিক বিউটি! ঝরনা, জঙ্গল...

জঙ্গল শব্দটা শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল সুরজিতের। তিথির এবার জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। সুরজিৎ মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, তুই যা না শালা। তোর গুলবাজ শ্বশুরকে কাঁধে নিয়ে ঘোর।

রাগ করতে গিয়ে বুঝি সেকেন্ডের জন্য আনমনা হয়েছিল সুরজিৎ, হঠাৎই এক অতিকায় ঢেউ পাগলা হাতির মতো সামনে এসে গেছে। বুবলুকে চেপে ধরে মরিয়া ডুব দিল সুরজিৎ, তবু শেষরক্ষা হলো না, সুরজিতের হাত ছিটকে ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে গেল বুবলু। ডিগবাজি আর ঘষা খেতে খেতে লুটিয়ে পড়ল পাড়ে।

জয়ন্তী দৌড়ে এসেছে। ঢেউ বুবলুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরল ছেলেকে, তার মুখ চোখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ।

সুরজিৎও হাচোড় পাচোড় করে বেরিয়ে এসেছে জল থেকে। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল,—কী রে, তোর লেগেছে?

বুবলুও ভয় পেয়েছে খুব। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। লালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। চোখ নাক মুখ ভরে গেছে জলে, বালিতে। হাঁপাচ্ছে।

জয়ন্তীর গলায় ঝাঁঝ ফুটল,—ছেলের হাতই ধরে রাখার মুরোদ নেই, তুমি আবার আমায় টানতে চাইছিলে!

একটু আগের রাগটা ফিরে এল দপ করে। সুরজিৎ চড়া স্বরে বলল,—আমি কি ইচ্ছে করে করেছি?

—থাক থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না। আমার যা বোঝার বুঝে গেছি।

—কী বুঝেছ? কীই?

জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না জয়ন্তী। বুবলুকে জড়িয়ে নিয়েছে তোয়ালেতে। ছেলের হাত ধরে চলে গেল দূরের বালিতে। যত্ন করে মুছিয়ে দিচ্ছে ছেলের গা মাথা।

সুরজিৎ হাঁই হাঁই করে সামনে এসে দাঁড়াল। তার শর্টসের পকেট বালি

বোঝাই। খামচে খামচে বালি বার করল খানিকটা, মুঠোয় পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল জলে। ঝুঁকে বুবলুর হাত ধরে টানছে,—আয়। আর একবার যাই।

কঠোর স্বরে জয়ন্তী বলল,—না। বুবলু আর যাবে না।

—এঁএঁএঁহ্, যাবে না! সব বুঝি তোমার হুকুমে হবে? সুরজিৎ ভেংচে উঠল,—ছেলে আমার। তাকে নিয়ে আমি যেখানে খুশি যাব।... চল্ তো বুবলু।

জয়ন্তী ফুসে উঠল,—না। আমি বলছি বুবলু যাবে না।

—কী রে বুবলু, আসবি না?

বুবলু মুখ ফিরিয়ে নিল।

ক্রোধে ছটফট করছে সুরজিৎ। বুবলু তাকে এইভাবে বিট্রে করছে? ছেলে তার এত ন্যাওটা... সেই ছেলে মা ছেড়ে নড়ছে না কিছুতেই। এ যেন বুবলুকে মাঝখানে রেখে জয়ন্তীরই অঘোষিত যুদ্ধ। হেরে যাচ্ছে সুরজিৎ, বিচ্ছিরিভাবে হেরে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সুরজিৎ যদি বালিতে মুখ গুঁজতে পারত! কিম্বা মিলিয়ে যেতে পারত মহাশূন্যে।

সুরজিৎ হিসহিস করে উঠল,—বাড়াবাড়ি! তোমার সব সময়ে বাড়াবাড়ি!

জয়ন্তী অকম্পিত স্বরে বলল,—বাড়াবাড়ি কাকে বলে সে বোধ তোমার আছে?

—কী বলতে চাও তুমি, অ্যাঁ? আমি কী অন্যায়টা করেছি?

উত্তরই দিল না জয়ন্তী। যেন প্রয়োজনই বোধ করছে না। উঠে দাঁড়াল গম্ভীর মুখে।

ঝপ করে জয়ন্তীর হাত চেপে ধরল সুরজিৎ,—হচ্ছেটা কী? সিন ক্রিয়েট করছ কেন?

—সিন তো তুমি ক্রিয়েট করছ।

—স্ট্রেঞ্জ, আমি কি ইচ্ছে করে হাত ছেড়ে দিয়েছি? জলের ধাক্কায় বাচ্চারা ছিটকে যায় না?

—কেয়ারলেস মানুষদের অনেক কিছু ছিটকে যায়। জয়ন্তী শান্তভাবে হাত ছাড়িয়ে নিল,—তুমি কি এখন ফিরবে?

—এক্ষুনি?

—আমরা তাহলে কটেজে যাচ্ছি। আয় বুবলু।

বলেই হাঁটা দিয়েছে জয়ন্তী। বাধ্য ছেলের মতো বুবলুও চলেছে মার পিছু পিছু। রিসর্টের গেট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

সুরজিৎ কটমট চোখে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। হিংস্র এক শঙ্খচূড় যেন ফণা

তুলছে শরীরের কোষে। কী অসম্ভব মেজাজ হয়েছে জয়ন্তীর! গ্রাহ্যই করে না! কী ভাবছিলটা কী? সুরজিৎ ছেলেকে ডুবিয়ে দিত? নিজেরই ছেলেকে? নাকি ছেলের সামনে প্রতিপন্ন করতে চাইছিল তার বাবা কত দায়িত্বজ্ঞানহীন? সুরজিতকে ছেলের চোখে হেয় করে কী সুখ পেল জয়ন্তী?

ভিতরে রাগটা বাড়ছে ক্রমশ। গজরাচ্ছে। মাথা ঠিক রাখতে পারল না সুরজিৎ, খ্যাপা ষাঁড়ের মতো হঠাৎ ছুটল সমুদ্রে। উন্মত্ত লাফালাফি করছে জলে। আশেপাশের মানুষজন দেখছে কিনা হুঁশ নেই, নিষ্ফল আক্রোশে ঘুষি চালাচ্ছে ঢেউ-এর গায়ে। এলোপাথাড়ি। যেন ঘুষি মেরে চুরমার করে দেবে সমুদ্রকে। কিম্বা ক্ষণপূর্বের অপমানকে।

এক সময়ে হাঁপিয়ে পড়ল সুরজিৎ। কাঁহাতক লড়া যায়? এ যে এক অসম যুদ্ধ, ঢেউ আসছে তো আসছেই। সুরজিতের সাধ্য কি এদের রোখার?

সূর্য ক্রমশ মাঝগগনে। খুনে তাপে ঝলসে যাচ্ছে চরাচর। সমুদ্রও সরছে ধীরে ধীরে। পরাজিত সুরজিৎ উঠল জল ছেড়ে। নতমস্তকে।

যেতে যেতেও ফিরে ফিরে সমুদ্রকে দেখছিল সুরজিৎ। ওফ্, সমুদ্র কী নির্মম!

।। দশ।।

ডাইনিং হল থেকে ফিরে মেজাজ শরিফ হয়ে গেছিল সুরজিতের। চমৎকার মেন্যু ছিল আজ। মুচমুচে আলুভাজা, ঝাল ঝাল আলুপোস্ত, চিতলমাছের পেটি, আনারসের চাটনি। চারটেই সুরজিতের প্রিয় আইটেম। সংগ্রামী সমুদ্রস্নানের পর আজ ক্ষিধেটাও ভারী চনচনে ছিল, পাকস্থলীতে খাবারগুলো ঢুকে কখন যে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল রাগটাকে।

ভোজনের পর শরীরটা একটু যেন আইঢাইই করছিল। মৌজ করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে সুরজিৎ আবিষ্কার করল প্যাকেট বেবাক ফাঁকা। পৌনে তিনটে বাজে, এখন সিগারেট কিনতে ছুটবে বাইরে?

জয়ন্তী বিছানায়। ছেলে নিয়ে শুয়েছে। সুরজিতেরও গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু নেশাটাও টানছে। দু'চার মিনিট দোনামোনা করে পাঞ্জাবীর পকেটে গলাল মানিব্যাগখানা। আলগাভাবে প্রশ্ন ছুঁড়ল,—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তোমার কিছু লাগবে?

জয়ন্তীও অনেকটা স্বাভাবিক এখন। সহজ স্বরেই বলল,—নাহ্।

—পান টান খাবে?

—মিষ্টি পাতা পাওয়া যাবে?

—যেতেও পারে।

—তাহলে এনো একটা। সাদা। অল্প একটু চমন দিয়ে।

বুবলুর চোখ পটাং করে খুলে গেল,—আমি একটা পান খাব বাপি।

—না। জয়ন্তী মৃদু ধমক দিল,—বাচ্চাদের পান খেতে নেই।

—অতো বকো কেন? সুরজিৎ বলে ফেলল,—খেলই নয় একটা মিষ্টি পান। কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

জয়ন্তী আর কিছু বলল না। পাশ ফিরে চোখ বুজেছে।

বেরিয়ে এল সুরজিৎ। বাইরে দুপুরটা এখন অদ্ভুত রকমের শুনশান। এদিক ওদিকের কটেজগুলোতে বেশ কিছু লোক এসেছে আজ, কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না এখন। নিঃসাড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ক্যাসুরিনা রিসর্ট। শোনা যায় শুধু এলোমেলো বাতাসের শব্দ। দস্যি বালকের মতো ছোটাছুটি করছে বাতাস গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে। একটা ঘুঘুপাখি ডেকে উঠল কোথায় যেন, আরও নির্জন হয়ে গেল দুপুর।

গেট থেকে হাত পনেরো দূরে পানের দোকান। ঢুলছে দোকানদার। তাকে ডেকেডুকে জাগাল সুরজিৎ। সওদা সেরে ফিরছে মন্থর পায়ে। কটেজের কাছে এসে কী ভেবে থামল। তৃষ্ণার্ত চোখে তাকাল তেরো নম্বরটার দিকে। তারপর হঠাৎই সম্মোহিতের মতো এগিয়ে চলেছে। কটেজের একটা জানলার পাট খোলা, পাতলা পরদা কাঁপছে তিরতির।

পা টিপে টিপে তেরো নম্বরের বারান্দায় উঠল সুরজিৎ। পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই বুকে নেহাই-এর ঘা। কটেজের শয্যায় কে ওই নারী পুরুষ? আদিম খেলায় মেতেছে ওরা কে? পুরুষটির চওড়া পিঠ উঠছে নামছে, নারীর পেলব হাত জাপটে আছে পুরুষকে। নারীর মুখে ঠোঁট ঘসছে পুরুষ, অপার্থিব শীৎকারে ভরে যাচ্ছে গোটা ঘর।

খেলা থামতেই সুরজিৎ মেয়েটার মুখ দেখতে পেল। কী আশ্চর্য, তিথি যে! পুরুষটিকেও চিনতে পারল এক লহমায়। সে নিজে!

এ কী বিভ্রম?

সুরজিৎ চোখ রগড়াল। দৃশ্যটা মুছে গেছে। শূন্যতা নিয়েই পড়ে আছে তেরো নম্বর, দরজাতেও তালা ঝুলছে।

খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সুরজিৎ। এমন একটা আজগুবি ব্যাপার ঘটল কেন? অন্তরের তীব্র বাসনা কী তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল? অতৃপ্ত কামনার এফেক্টে হ্যালুসিনেশান? ফিরে গিয়ে তিথিকে বলতে হবে গল্পটা।

তিথি কি হাসবে? ঠাট্টা জুড়বে? নাকি জয়ন্তীর সঙ্গে থেকেও তিথিকে মনে পড়েছে বলে চোরা তৃপ্তি অনুভব করবে?

চাপা শরীরী উত্তেজনা নিয়ে সুরজিৎ রুমে ফিরল। জয়ন্তী ঘুমিয়ে পড়েছে। বুবলুও। পান ড্রেসিংটেবিলে রেখে বাইরে বেতের চেয়ারে এসে বসল সুরজিৎ। সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজল।

আবার আচ্ছন্নের মতো দেখছে দৃশ্যটাকে। চঞ্চল হচ্ছে রক্ত।

।। এগারো।।

পূর্ণিমার চাঁদ এখনও ওঠেনি আজ। ঘন কালো অন্ধকারে ডুবে আছে বিশ্বচরাচর। সমুদ্রের আওয়াজ ক্ষীণ ছিল এতক্ষণ, এবার ধীরে ধীরে গর্জন হয়ে উঠছে। হাওয়া দামাল। কাছে আসছে সমুদ্র। জল বাড়ছে।

চার সেলের টর্চ হাতে জয়ন্তীকে খুঁজছিল সুরজিৎ। হঠাৎ আলো থেকে নিশ্ছিদ্র তমসায় এসে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মনে হয় পৃথিবীটাই যেন লুপ্ত হঠাৎ। সমুদ্রও দৃশ্যমান নয়। তার জায়গায় সামনে যেন এক অতিকায় কালো গহ্বর। কী বিশাল তার হাঁ!

বুবলুর হাত ধরে কাঠের গেটটার পাশে সুরজিৎ দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। ক্যাসুরিনা রিসর্টের নুনে খাওয়া বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে বালিতে। ভাঙাচোরা ধাপিতে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট বসে, অশরীরী ছায়ার মতো। চাঁদের প্রতীক্ষায়। টর্চ ঘুরিয়েও সুরজিৎ সেখানে জয়ন্তীকে দেখতে পেল না।

বিকেলবেলা বুবলুকে নিয়ে বেরিয়েছিল সুরজিৎ। জয়ন্তীকেও বলেছিল যেতে, সে রাজি হল না। ছেলের টানাটানিতেও না। তার নাকি ভয়ানক মাথা ধরেছে। মরুক গে যাক, সুরজিৎ সাধাসাধিতে যায়নি, বুবলু খুশি থাকলেই তার যথেষ্ট। বুবলুর হাত ধরে প্রায় গোটা জনপদটাই চষেছে সুরজিৎ। পান্থনিবাসের পাশে খাঁচায় হরিণ দেখে বুবলু তো আহ্লাদে আটখানা। সুরজিৎ তাকে চিপস্ কিনে দিয়েছে, ক্যান্ডিফ্লস খাইয়েছে, চকোবার চকোবার করে মাথা খারাপ করেছিল ছেলে, ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে তাও এনে দিয়েছে ছেলেকে। এখন শুধু রাতটুকু পার হলেই হয়। এবারকার মতো বেড়ানো শেষ।

সুরজিৎ বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল। আঃ, বন্দীদশা থেকে মুক্তি। আবার কলকাতা। আবার তিথি। আবার সেই মাদক নেশা।

বুবলু হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে তুরতুরিয়ে নেমে গেল তৃতীয় ধাপটায়। অন্ধকারেই

দেখতে পেয়েছে আট নম্বর ঘরের বাচ্চাটাকে। গল্প জুড়েছে গিয়ে। সম্ভবত বন্দী হরিণের গল্প।

সুরজিৎ আবার হাতের আলোখানা ঘোরাল। এক দু'বার টর্চ এদিক ওদিকে করতেই এবার চোখে পড়েছে। ওই তো জয়ন্তী। ওই তো বসে ডানদিকের বোল্ডারে।

সামনে কয়েকটা এবড়ো খেবড়ো পাথর। সাবধানে পাথরগুলোকে টপকে জয়ন্তীর পিছনে এসে দাঁড়াল সুরজিৎ। ভারিক্কি গলায় বলল,—কটেজের চাবিটা দাও তো।

চমকে ফিরেছে জয়ন্তী,—ও, তুমি?

—মাথা ছেড়েছে?

—ট্যাবলেট খেয়েছি। কমেছে খানিকটা।

—আমাদের জন্যে রুমে ওয়েট করতে পারতে। একা একা এসে অন্ধকারে বসে আছ...

—সন্ধে অব্দি ঘরেই ছিলাম। তখনও ফিরছ না দেখে...

—কটেজ বন্ধ করে এখানে চলে এলে! আমি কাঁহা কাঁহা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—প্রয়োজন ছিল না। চাবি তো কাউন্টারে রাখা আছে। ম্যানেজার বলেনি?

—জিজ্ঞেস করিনি। বুঝব কী করে তুমি...।

সুরজিৎ সামান্য অসন্তুষ্ট মুখে ফিরতে যাচ্ছিল, জয়ন্তী আচমকা ডাকল,—শোনো।

—কী? রাতের মিল? বলা হয়ে গেছে। প্লেন রুটি মাংস। একটা বেলা অন্তত আমার কথামতো খেয়ে দ্যাখো, খারাপ লাগবে না।

—আমি খাওয়ার কথা বলছি না।

—কাল বেরোনর কথা বলছ? নো প্রবলেম। অটোওয়ালা ফিট করে এসেছি, ঠিক সময়মতো কটেজে চলে আসবে।

—ওসব না।... একটু বোসো না এখানে।

জয়ন্তীর স্বর গভীর। এত গভীর যে থমকে গেল সুরজিৎ। পাশের পাথরে বসে পড়েছে।

হাঁটুতে থুতনি ঠেকাল জয়ন্তী। নিচু গলায় বলল,—কাল তোমায় পুরো কথা বলা হয়নি। আমারও আরও কিছু বলার ছিল।

সুরজিৎ একটা গন্ধ পাচ্ছিল। কটু, নোনা ঘ্রাণ। আপনাআপনি চোখ সরু হয়ে গেল,—কী কথা?

জয়ন্তী লম্বা শ্বাস ফেলল,—আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না।

কথাটা এতই আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত, যে সুরজিৎ প্রথমটা হৃদয়ঙ্গমই করতে পারল না। লঘু গলায় বলে উঠল,—কেন? হঠাৎ এত রাগের কী হল? চাকরি করতে বারণ করেছি বলে এত খচে গেলে? নাকি ছেলেকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলাম বলে?

জয়ন্তী রা কাড়ল না। থুতনিও তুলল না হাঁটু থেকে।

তরল সুরেই সুরজিৎ বলল,—কেন এত চটাচটি করছ মাইরি? ঠিক আছে বাবা, সংসার করে দম থাকলে কোরো চাকরি।

—সে তো করবই। করতেই হবে।...ডিসিশান যখন নিয়েই ফেলেছি...

—কিসের ডিসিশান?

—বললাম তো। তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এতক্ষণে সুরজিৎ থতমত। অবাক স্বরে বলল,—কেন?

—শুনবে? শুনে হজম করতে পারবে?

—কী বলতে চাও তুমি?

—যদি বলি তোমাকে আমার আর ভাল লাগছে না?

সুরজিতকে জোর বিঁধল কথাটা। সুরজিতকে, না সুরজিতের পৌরুষে? তপ্ত স্বরে বলল,—কারণটা জানতে পারি?

—কারণ আবার কী, ইচ্ছে। একজনকে সারা জীবন ভাল লাগতে হবে তার কোনও মানে আছে?

—হেঁয়ালি কোরো না। সুরজিতের গলা চড়ল সামান্য,—খোলসা করে বলো।

জয়ন্তীর এতটুকু হেলদোল নেই। একই রকম অচঞ্চল স্বরে বলল,—কত বার বলব? তোমাকে আর ভাল লাগছে না। তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছু পাই না। তুমি এত সাধারণ, এত একঘেয়ে...

সপাটে কে যেন চড় কষাল সুরজিৎকে। কথা বলতে গিয়ে তোতলা হয়ে গেল সুরজিৎ,—আআমি সাধারণ? আআমি একঘেয়ে?

—তোমার কী আছে বলো? ঘুম থেকে উঠে হাঁইহাঁই কিছু হুকুম, তারপর লাখ লাখ ভেড়া ছাগলের মতো অফিস ছোটা, বাড়ি ফিরে ছেলে নিয়ে আহ্লাদীপনা, নয়তো টিভিতে চোখ গেঁথে বসে থাকা! আর মাঝে সাঝে রাতবিরেতে আমার শরীরটার ওপর হামলানো! সেটাও এত যান্ত্রিক, এত রহস্যহীন...

—থামো। সুরজিৎ অপমানে বিমূঢ় প্রায়। ঘড়ঘড়ে গলায় গর্জে উঠল,—নাটুকে ডায়ালগ ঝেড়ো না। আমি কি মেয়েছেলে, যে রহস্য করে বেড়াব?

—রহস্য সকলেরই থাকে গো। পুরুষেরও থাকে। জয়ন্তী ভিজে বাতাসের মতো ফিসফিস করছে,—তোমার নেই। তুমি নেহাতই একটা কেজো মানুষ। অ্যাভারেজেরও অ্যাভারেজ। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি আজকাল সহ্য করতে পারি না।

এবার বুঝি আঘাতে আঘাতে চুরমার হয়ে যাবে সুরজিৎ। পাল্টা আক্রমণ জুড়ল,—সেরকম রহস্যময় পুরুষের সন্ধান পেয়েছ বুঝি?

জয়ন্তী সহসা বোবা। সমুদ্রের ওপারে, আকাশের ঢালে খুব আস্তে আস্তে একটা আলোর সঞ্চার হয়েছে। অলস পায়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসছে পূর্ণ চাঁদ। হঠাৎই লাফিয়ে পুরো মেলে দিল নিজেকে।

গুঞ্জন উঠেছে চারদিকে। চাঁদের শোভায় মুগ্ধ মানুষ বিচিত্র ধ্বনিতে বুঝি আবাহন করছে চাঁদকে। শুধু জয়ন্তী নীরব। শুধু স্থির তাকিয়ে আছে পূর্ণশশীর দিকে।

সুরজিৎ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। প্রতিটি নিঃশব্দ পল অনুপল লক্ষ অর্বুদ বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল তার।

কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—জবাব দিচ্ছ না যে? সেই রহস্যময় লোকটি কে? তারই ব্যাকিং-এ বুঝি চাকরি জুটেছে?

চাঁদ এখন শীতল আলো হয়ে বিছিয়ে গেছে সমুদ্রে। সোনালি বিষাদের মতো। অন্ধকার যেন এক নীলচে মোহ এখন। জয়ন্তীর স্বরেও আলোছায়া,—কী হবে জেনে?

—আমার জানার রাইট আছে। তুমি আমার স্ত্রী।

—ধরো জানলে। কী করবে তুমি?

নীল নীল জ্যোৎস্নায় একরাশ কাঁকড়া চরতে বেরিয়েছে বালিতে। ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে ভেসে আছড়ে পড়ছে বোল্ডারে, ঢেউ সরলেই কিলবিল কিলবিল করে গর্ত খুঁজছে।

সুরজিৎ প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—আই উইল সি দ্যাট বাগার।

দেখে নেব। একজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করা ঘুচিয়ে দেব। বলতে বলতে শাসাচ্ছে আঙুল তুলে,—তোমাকেও আমি দেখে নেব।

জয়ন্তী পলকের জন্য চোখ তুলল, পলকে সরিয়ে নিল দৃষ্টি। অসম্ভব ঠান্ডা গলায় বলল,—তুমি কিছুই করতে পারবে না। কারণ আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবই না। ফিরে গিয়েই আমি ডিভোর্স কেস করব।

—অত সোজা?

—দেখতেই পাবে।

সুরজিৎ এবার ক্রোধের শেষ সীমায়। এত বাড় বেড়েছে জয়ন্তী? কবে থেকে এমন লাগামছাড়া হয়ে গেল? আশ্চর্য, সুরজিৎ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

দাঁতে দাঁত ঘসল সুরজিৎ,—তুমি কি এই নাটক করার জন্য চাঁদিপুর এসেছ?

—ধরে নাও তাই। এখানে যত সহজে তোমায় বলে দিতে পারলাম, ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালের মধ্যে হয়তো তা বলে ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ভাবলাম শেষ বারের মতো তোমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে, একটু অন্য পরিবেশে...

কথা শেষ করতে পারল না জয়ন্তী। সুরজিৎ চিৎকার করে উঠেছে,—স্টপ ইট। ঢং দেখানোর একটা লিমিট থাকা উচিত।

সিঁড়িতে বসে থাকা দু'চারজন ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। দশ নম্বরের টিমটাও ঘাড় ফেরাল। বুবলু ডেকে উঠল না?

জয়ন্তী সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একই রকম শীতল স্বরে বলল,—চেঁচাচ্ছ কেন? আস্তে কথা বলা যায় না?

—আস্তে বলার মতো কাজ করেছ তুমি?

—আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। গোপনও করিনি। যা বলার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছি। এখান থেকে ফিরে আমি পরশুই বুবলুকে নিয়ে কাশীপুর চলে যাব।

—খবরদার। নিজে ঢলানি করছ করো, আমার ছেলের দিকে তুমি হাত বাড়াবে না।

—তা কী করে হয়? বুবলু আমার ছেলে। বুবলু আমার সঙ্গে যাবে।

এমন নির্বিকারভাবে বলল জয়ন্তী, সুরজিতের পিত্তি জ্বলে গেল। ফের চিৎকার করে উঠেছে,—অসম্ভব। বুবলু আমার ছেলে। মাই সান। তোমার মতো এক দুশ্চরিত্র মায়ের কাছে আমি আমার ছেলেকে মোটেই ছাড়ব না।

—কিন্তু বুবলু যদি তোমার কাছে না থাকতে চায়?

—আলবৎ থাকবে। ওকে আমি সব খুলে বলব। বলেই সুরজিৎ গলা উঠিয়েছে,—বুবলু? অ্যাই বুবলু?

—আঃ বুবলুকে ডাকছ কেন? এতক্ষণে মুখ তুলেছে জয়ন্তী,—ছেলেকে তুমি কিছুই চেনোনি। বুবলু আমায় ছাড়া থাকতেই পারবে না। কারণ আমি হচ্ছি ওর প্রয়োজন। আর তুমি তো শুধুই ওর আবদার। বায়নাক্কা। ওর রিলিফ। তোমার যেমন তিথি।

শেষ শব্দটুকুতে কী যে ছিল, বাতাস থমকে গেল সহসা। সমুদ্র নিমেষে নিস্পন্দ।

সুরজিতের স্নায়ু অসাড় হয়ে গেল। ক্রোনক্রমে বলতে পারল,—কে তিথি?

জয়ন্তী নিঃশব্দে মুঠোয় ধরা তিন চারটে কাগজ এগিয়ে দিল সুরজিতের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির সমুদ্র যেন চতুর্গুণ গর্জনে ফেটে পড়েছে। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

সুরজিৎ হাত বাড়াল না। পাংশু মুখে বলল,—কী ওগুলো?

—তোমারই জিনিস। এই রিসর্টেরই বিল। অক্টোবরের আছে, ডিসেম্বরের আছে, ...লাস্ট এপ্রিলেরও।

চাঁদ স্পটলাইট হয়ে আলো ফেলেছে সুরজিতের মুখে। স্পটলাইট? না সার্চলাইট? সুরজিৎ সহ্য করতে পারছিল না চাঁদের আলোটাকে। মুখ নামিয়ে বলল,—এসব তুমি কোথ্থেকে পেলে?

জয়ন্তীর চোখে চাঁদের কিরণ,—তুমি বড় অসাবধান। প্যান্টের পকেটে রেখে প্যান্ট কাচতে দাও, শার্টের বুক পকেটে অবহেলায় ফেলে রাখো, ব্রিফকেসে রেখে সেখান থেকে টাকা বার করতে বলো আমাকে। ভুল তো তোমার এক বার নয়, বার বার। তিথিকেও তুমি মূল্য দাও না।

পূর্ণিমার ঢেউ দুরন্ত আবেগে মাথা কুটছে বোল্ডারে। ছিটকে আসা জলকণায় ভরে গেল সুরজিতের মুখ।

জয়ন্তী বিড়বিড় করে বলল,—কিম্বা হয়তো তুমি এভাবেই তোমার তিথির কথা জানতে চাইছিলে আমাকে। হয়তো এভাবেই ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছিলে আমাকে আর তোমার প্রয়োজন নেই...।

—না। বিশ্বাস করো...। সুরজিৎ খপ করে জয়ন্তীর হাত চেপে ধরেছে,—আআআমি বুঝতে পারিনি।

—কী বুঝতে পারোনি?

—মানে... মানে... ঠিক এরকমটা তো চাইনি।

—মানে, তুমি দু'দিকেই বজায় রাখতে চেয়েছিলে, তাই তো? জয়ন্তীর স্বর বুঝি মৃত্যুর চেয়েও শীতল। কথা বলতে বলতেই উঠে পড়েছে জয়ন্তী। গলাটাকে আরও হিম করে দিয়ে বলল,—কিন্তু এভাবে তুমি কাকে ঠকাচ্ছ সুরজিৎ? আমাকে? তোমার তিথিকে? নাকি নিজেকেই?

সুরজিৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

।। বারো ।।

দুটো খাটের মাঝে মাত্র হাত কয়েকের ব্যবধান। পাশের খাটে জয়ন্তীর গায়ে হাত রেখেছে মধ্যরাতের জ্যোৎস্না। দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছে জয়ন্তী, বুবলুকে আঁকড়ে ধরে। শুয়েই আছে বোধহয়। ঘুমিয়েছে কি?

চোরের মতো নিজের শয্যা থেকে হাত বাড়াল সুরজিৎ। ছুঁতে চাইছে জয়ন্তীকে। পারছে না। দুটো খাটের মাঝে দূরত্ব যেন বেড়ে গেছে কয়েক শো যোজন। জয়ন্তীর পাশে আর কোনও দিনই বুঝি পৌঁছতে পারবে না সুরজিৎ।

ওফ্, আজ যদি সেই বুড়ো চৌকিদারটা থাকত। যদি বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে যেত ঘরটাকে।

হায় রে, কোথায় কে?

সুরজিৎ নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এল। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরিয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন প্রকট হয়েছে চাঁদ। অশালীন জ্যোৎস্না ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে অন্ধকারের সমস্ত মুখোশ। সমুদ্র আকাশ মাঠ ঝাউবন কারুর আজ রেহাই নেই চাঁদের হাত থেকে। সুরজিতেরও না।

ভিখিরির মতো সুরজিৎ তেরো নম্বর কটেজটার দিকে তাকাল একবার। শুনশান মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে নীল চাঁদ। কুটিরটা নেই! উবে গেল নাকি!

কোথায় যে এখন মুখ লুকোয় সুরজিৎ?

আলো ফুটছিল। একটু একটু করে। সমুদ্র বহু দূরে এখন। তরঙ্গহীন। অনেক দূরে, বেলাভূমি বেয়ে হাঁটুজল ভেঙে একা একা হাঁটছিল একটা লোক। তীর ধরে হেঁটে যাচ্ছে। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। আবার ফিরছে পাড় মাড়িয়ে। ওই ভাবে হেঁটে চলে কেন লোকটা? অবিরাম? ক্লান্তও হবে না কখনও? লোকটার কাঁধে একখানা ভারী মাছ ধরার জাল। অস্ফুট আলোয় অর্ধনগ্ন মানুষটা যেন এক চলন্ত সিল্যুয়েট।

নিঃস্ব চোখে চলমান লোকটাকে দেখছিল সুরজিৎ। মরা কোটালে তো মাছ আসে না, তবু কেন নির্বোধের মতো প্রকাণ্ড জালটাকে বয়ে বেড়ায় লোকটা?

এ কি নির্বুদ্ধিতা?

নাকি এ নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা?

সুরজিৎ জানে না।

নিজেকেই যে এখন চিনতে পারছে না সুরজিৎ।

অনিকেত

এমনি করে বেরিয়ে না পড়লে আজও বোধহয় আসা হয়ে উঠত না। শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালার চোখা চোখা বাক্যবাণই বুঝি অনুঘটকের কাজ করল। যে সয় সে রয় প্রবাদবাক্যটা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে বাড়িওয়ালা।

এবারের সংঘর্ষটা শুরু হয়েছিল কাল রাত্রে। মন্দার অফিস থেকে ফেরার পর। বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটে এসেছিল সুরভি। প্রায় আর্তনাদের সুরে বলেছিল,—আর নয়, আর নয়, এ বাড়িতে আর নয়।

মন্দার প্রথমটায় তত আমল দেয়নি। ইদানীং বাড়িওয়ালার সঙ্গে খুচখাচ খিটিমিটি তো লেগেই আছে। কখনও জল নিয়ে তো কখনও কাপড় মেলা, কখনও গলি পরিষ্কার করা, নর্দমার নোংরা...

অথচ এসব কোনও ঝামেলা হওয়ারই কথা ছিল না। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সময়ে অবিনাশ হালদার বলেছিল, জল পাবেন চব্বিশ ঘণ্টাই। এখন কার্যক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি দুপুর সন্ধেতেই কল ঘোরালে বাতাসের শব্দ শুনতে হয় মন্দারদের। পাম্প চালানোর কথা বললেই অমনি অবিনাশবাবুর মুখ হাঁড়ি। এর মধ্যে আপনাদের জল শেষ হয়ে গেল? আশ্চর্য!

অবিনাশগিন্নির মন্তব্যগুলো আরও মারাত্মক,—কী দিনকাল পড়ল। মাসে মাসে এতগুলো টাকা করে পাম্পের বিল গুনছি, তবু ভাড়াটের মন পাওয়া যায় না। কোন বাড়িতে বাড়িওয়ালা এমন দিনে চোদ্দবার করে পাম্প চালায়, অ্যাঁ? সববাইকেই মেপেজুপে চলতে হয়। বাড়িওয়ালার জল বলে দেদার মনে খরচ করব...। দেয় তো মোটে সতেরোশো টাকা, এতেই যেন মাথা কিনে নিয়েছে!

ছাদে কাপড় মেলা তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। সুবালার মা বারবার সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ ওঠে নামে, এতে নাকি দোতলার প্রাইভেসি নষ্ট হয়! প্রত্যেক রবিবার ভাল করে গলি ঝাঁট দেয় সুবালার মা, তবুও ওপর থেকে টিপ্পনী উড়ে আসে অহরহ। জমাদার ঠিকঠাক নর্দমা সাফ না করলেও দোষটা মন্দারদের। যেন মন্দাররাই ইচ্ছে করে বাড়িটাকে মশা প্রজননের আখড়া বানাচ্ছে। দেওয়ালে এখন একটা পেরেক ঠোকারও উপায় নেই। সামান্য আওয়াজ গেলেই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে কর্তাগিন্নি।

ভাবতে অবাক লাগে এই স্বামী-স্ত্রীরই কী অদ্ভুত অন্যরকম মূর্তি ছিল। পাঁচ বছর আগে মন্দাররা যখন প্রথম এ বাড়িতে ভাড়া এল তখন কী মোলায়েম ব্যবহার!

অবিনাশ হালদার বলেছিল,—নামেই একতলাটা ভাড়া নিলেন, এখন থেকে কিন্তু আপনারা এই বাড়িরই লোক। আমার গিন্নির মশাই একদমই আপন আপন পর পর ভাব নেই, দেখবেন আপনাদের সঙ্গে কেমন আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করবে।

হালদারগিন্নি তো আরও মধুর,—আত্মীয়ের মতো বলছ কেন, ওঁরা তো এখন থেকে আত্মীয়ই। আমরা একসঙ্গে থাকব, সুখে-দুঃখে পরস্পরকে দেখব...। আপনারা দুজনে নিশ্চিন্তে অফিস বেরিয়ে যেতে পারেন, আমি ঘরদোর পাহারা দেব।

ঝিমলির প্রসঙ্গও উঠেছিল কথায় কথায়,—আহা, কী মিষ্টি মেয়ে আপনাদের। ও স্কুল থেকে ফিরে একা একা থাকবে কেন, সোজা যেন দোতলায় চলে আসে। টিভি দেখবে, কলকল করবে... আমার আগের ভাড়াটের ছেলেটা তো আমাদের ঘরেই মানুষ হয়ে গেল, তাই না গো?

—বটেই তো। আমার মেয়ে তো বাপ্পা অন্ত প্রাণ ছিল। নিজের ভাই নেই তো কী আছে, ভায়েরও বাড়া। খুকুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ওই ছেলেও যে কতদিন দিদি দিদি করে খুকুর শ্বশুরবাড়ি ছুটেছে।

সুরভি ঘরপোড়া গরু। বিয়ে হয়ে ইস্তক নয় নয় করে তিন তিন বার বাড়ি বদল করেছে দশ বছরে। ঠিক আগের বাড়িওয়ালার সঙ্গে প্রথম প্রথম সম্পর্ক বেশ মাখো মাখো ছিল। এক দেড় বছর যেতে না যেতেই মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাদের আবার জল দেওয়ার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন রকম। টাইমে টাইমে আসবে, ছ্যারছ্যার করে বিশ পঁচিশ মিনিট পড়বে, ব্যাস্, খতম। পোষালে থাকো, নইলে কাটো। তার আগের বাড়িটায় তো আলো বাতাসই ঢুকত না। লোডশেডিং হলে দিনের বেলাতেও মোমবাতি জ্বেলে ভূতের মতো নড়াচড়া করতে হত। সে বাড়িতে বছরখানেকের বেশি টেকা যায়নি। একদম পয়লা বাড়িটা অবশ্য মন্দ ছিল না, বাড়িওয়ালার সঙ্গেও শেষ অবধি সুসম্পর্কই ছিল। তবে সেখানে ঘর ছিল মোটে একখানা। আত্মীয়-বন্ধু এলে বসতে দেওয়ার জায়গা নেই, রান্না করে এনে শোওয়ার ঘরেই বসে খাও...

তুলনায় অবিনাশ হালদারের বাড়ি তো স্বর্গ। ঘর একখানাই বটে, কিন্তু ঘরের সাইজটি বিশাল। সঙ্গে ছোট হলেও একটা ড্রয়িং ডাইনিং স্পেস। বাথরুম রান্নাঘরও বেশ পছন্দসই। সবচেয়ে বড় সুবিধে অবিরাম জল এবং হাতের কাছে

বাজার, বাসস্ট্যান্ড। এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ফের গৃহচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় যেতে সুরভি মোটেই রাজী নয়।

তাই কথাগুলো কানে ঢুকলেও মগজে প্রবেশ করতে দেয়নি সুরভি। তাছাড়া সে খামোখা ঝিমলিকে রোজ রোজ দোতলায় পাঠাতে যাবেই বা কেন? ঝিমলি যথেষ্ট বুঝদার মেয়ে, কোনও বিটকেল বায়নাক্কা নেই, কাজের লোকের কাছে থাকাতেও সে ছোট থেকে যথেষ্ট অভ্যস্ত। স্কুল থেকে ফিরে নিজের মনে আঁকাআঁকি করে, নয়তো খেলনা পাজল্ নিয়ে বসে যায়।

এ বাড়ি এসে সুরভি আরও অনেক কিছু বর্জন করেছিল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে নো বাটি চালাচালি, নো চিনি-দুধ চাওয়া-চাওয়ি, গায়ে পড়া ভাব তো নয়ই, হাতে একটা সিনেমার টিকিট বেশি থাকলেও কখনও হালদারগিন্নিকে সঙ্গে যেতে সাধেনি সুরভি। ঘাটশিলা না গালুডি কোথায় যেন এক আত্মীয়ের বাড়ি গেল অবিনাশ হালদারেরা, সুরভিরা আসার পর পরই বড়দিনে একসঙ্গে সেখানে যাওয়ার জন্য হালদারগিন্নির কী ঝুলোঝুলি, মন্দার আর সুরভি ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের মধ্যিখানে সব সময়ে একটা দূরত্ব থাকা ভাল, তাতে সম্পর্কটা তেতো হয় না।

তবু তিক্ততাটা এসেই গেল। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ে বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিল মন্দার, মাসে মাসে পাঁচশো টাকা করে কাটা যেত ভাড়া থেকে। অগ্রিম শোধ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল নানান বখেড়া। মন্দার দুশো টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে, তবুও। এখন অবিনাশ দম্পতির সঙ্গে বাদানুবাদ মন্দার সুরভির নিত্যকার ব্যাপার।

কাল তাই মন্দার প্রথমে সুরভির ক্ষোভে জল ঢালতে চেয়েছিল। ঠাট্টার সুরে বলেছিল,—আজ আবার কী নিয়ে লাগল, অ্যাঁ? গরম বাতাস নীচ থেকে ওপরে উঠছে বলে? নাকি আমাদের ইলিশমাছের গন্ধে ওদের গা গুলিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সুরভি,—ফাজলামি কোরো না।... এরা অতি অসভ্য, অতি বজ্জাত। জানো আমাকে কী বলেছে আজ?

—কী?

—কোথ্থেকে কোন কাক বোধহয় এঁটো-কাঁটা মুখে করে এনে গলিতে ফেলেছিল, সেই ছুতো ধরে...। বলে আমরা নাকি ছোটলোকের বেহদ্দ! খেয়েদেয়ে এঁটোকাঁটা যে ঠিক জায়গায় ফেলতে হয় তাও নাকি শিখিনি!

—ছোটলোক বলেছে?

—বলল তো! আমি অফিস থেকে ফিরে সবে শাড়ি ছাড়ছি, অমনি দরজায় দুমদুম ধাক্কা। ইতরের মতো। কী উগ্রচণ্ডী মূর্তি, ঝিমলি পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে

গিয়েছিল।

ঝিমলিও পোঁ ধরল,—হ্যাঁ বাবা, কী বিশ্রী ভাষায় কথা বলছিল জেঠিমা।

সুরভি খেঁকিয়ে উঠল,—আর জেঠিমা বলতে হবে না। বল্ বাড়িউলি।

মন্দারের আর জামা খোলা হলো না। গুমগুমে স্বরে বলল,—তোমরা চুপচাপ শুনে গেলে? কিছু বলতে পারলে না।

—আমরা কি ওদের মতো? ওদের লেভেলে নামতে পারব আমরা?

—তা সেই নোংরাটা কি এখনও গলিতেই পড়ে আছে?

—নাহ্। আমি ফেলে দিয়ে চান করে নিয়েছি।

—কেন ফেললে? দোতলায় ছুঁড়ে দেওয়া উচিত ছিল?

—বললাম তো। ওদের স্তরে নামতে পারব না।....ওই চামারদের বাড়ি এবার ছাড়ো। কতদিন ধরে বলছি এবার একটা কিছু করো নিজের...

সুরভির পুরো গজগজটা শোনার ধৈর্য ছিল না মন্দারের। দুপদাপ উঠে গেল দোতলায়। আঙুল তুলে তুলে কথা শোনাল দশখানা। বিনিময়ে কুড়িটা ফেরত দিল বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালি।

রাগে গরগর করতে করতে নেমে এল মন্দার।

সুরভি বলল,—পারলে? পারলে ওদের সঙ্গে? ভাড়াবাড়ির মায়া এবার কাটাও, পরের বাড়িতে ঢের হয়েছে।

মন্দার দাঁতে দাঁত ঘষল,—হুম্, কিছু একটা এবার করতে হয়।

—অমন এড়িয়ে যাওয়া কথা বোলো না। সিরিয়াসলি খোঁজখবর নাও।

তখনকার মতো থেমে গেল কথাবার্তা, স্নান-টান সারল মন্দার। কদিন ধরে থসথসে গরম পড়েছে, ঘামাচি বেরিয়েছে বুকে-পিঠে, পাউডার মাখল ভাল করে। ঝিমলির স্কুলে সামার ভেকেশান চলছে, রাশি রাশি হোমটাস্ক, রেকারিং ডেসিমেলের অঙ্ক নিয়ে ঝিমলির নাস্তানাবুদ দশা। মন্দার মেয়ের একটা দুটো অঙ্ক কষে দিল। খেটেখুটে।

রুটি বানিয়ে খেতে ডাকল সুরভি। ডাইনিং টেবিলে ফের পাড়ল কথাটা। মন্দারের প্লেটে তরকারি দিয়ে বলল,—কিছু ভাবলে?

মেয়ের অঙ্ক নিয়ে ভাবিত ছিল মন্দার। অন্যমনস্কভাবে বলল,—কী ভাবব?

—যা বললাম তখন। ওই বাড়ি করার ব্যাপারে।

—বাড়ি করা কি সহজ কাজ? জমি কেনো, দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রি খাটাও...

—ধুস্, আমি ফ্ল্যাটের কথা বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে বারো বছরের ঝিমলির কুটুস মন্তব্য,—হ্যাঁ বাবা, ফ্ল্যাটই তো ভাল।

—ঠিক আছে, ফ্ল্যাটই নয় হবে।

—তোমার তো বলা! হবে বলেই ঘুমিয়ে পড়বে। ক্যাসারোল থেকে গরম রুটি নিয়ে সুরভি নিজেও বসে গেছে খেতে। সকালের ইলিশভাপার জন্য একগাল ভাতও নিল। ইলিশই হোক কি অমৃত, মন্দার মরে গেলেও রাতে ভাত ছোঁবে না। বেছে বেছে তাকে ঘাড়ের পিসটা দিল সুরভি, ঝিমলিকে পেটি। নিজে সন্তর্পণে গাদার কাঁটা বাছছে। হঠাৎই কী মনে পড়ে যেতে বলল,—এই, গাঙ্গুলিপাড়ার মুখটায় দেখেছ এক ভদ্রলোক অফিস করেছে? বাইরে ইয়া সাইনবোর্ড—নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটের অগ্রিম বুকিং করুন?

—ও তো সুব্রত নন্দীর অফিস।

—তুমি চেনো?

—মুখচেনা।

—তা ওঁকে অ্যাপ্রোচ করা যায় না?

—করা যায়। মন্দার স্যালাডের প্লেট থেকে এক কুচি শশা ফেলল মুখে,—ওর কথা আমি আগেও ভেবেছি। তবে...

—কী তবে?

—লোকটা একসময়ে পার্টি-টার্টি করত। বেশ মাস্‌লম্যান গোছের ছিল। মানে ওই পার্টির অ্যাকশান স্কোয়াড থাকে না...

—তাতে আমাদের কী? এখন তো লোকটা প্রোমোটার।

—হুম্।

—আমরা পয়সা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করব, টাইম টু টাইম টাকা দিয়ে যাব, লোকটা আগে গাঁটকাটা ছিল, না সন্ন্যাসী ছিল, তা দিয়ে আমাদের কী আসে যায়?

মন্দার হাসল মনে মনে। এত অবলীলায় সুরভি কথাগুলো বলছে, যেন ফ্ল্যাট কেনার টাকা আলমারিতে মজুত আছে, গিয়ে শুধু ঢেলে দাও, হাহ্! সুরভিটা বড্ড বেশি ইমোশানে চলে। ব্যাপারটা ধর তক্তা মার পেরেক হলে মন্দার কি এতকাল হাত গুটিয়ে বসে থাকত?

তবে ওই মুহূর্তে ওসব বলে সুরভিকে আর চটাল না মন্দার। বলল,—হুম্ দেখি কী করা যায়।

দেখি দেখি করেই হয়তো মন্দার আরও কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তার আর সুযোগ রইল না। আজ সকালে কল খুলতেই ভুস ভুস হাওয়া বেরোচ্ছে।

তুম্‌বো মুখে দোতলায় ছুটে যেতেই অবিনাশ হালদারের সাফ উত্তর,—ট্যাংকে জল আছে, আপনার লাইনে হয়তো আসছে না। পাইপ পরিষ্কার করান গিয়ে।

—কিন্তু কাল রাতেও তো পড়ছিল।

—তার আমি কী জানি? প্লাম্বার ডাকুন, প্লাম্বার বলবে।

—বাহ্, পাইপ পরিষ্কার করানোটা তো আপনার কাজ।

অবিনাশগিন্নি পাশ থেকে বলে উঠল,—হ্যাঁ, এর পর বলবেন আপনাদের পায়খানা পরিষ্কার করে দেওয়াটাও আমাদের কাজ।

মন্দার ঝেঁঝে উঠল,—বটেই তো। কোনও কিছুই তো আপনাদের কাজ নয়। পাঁচ বছর আছি, একবার কলি দেওয়াটাও তো কাজ বলে মনে হয়নি। এদিকে লাস্ট ইয়ারে তো দিব্যি নিজেদের ঘরের রঙ ফিরিয়ে নিলেন।

—আমাদের বাড়ি, আমরা কোথায় কী করব আপনি বলে দেবেন?

আবার একটা তুমুল বাধতে যাচ্ছিল, মন্দারই সংযত করে নিল নিজেকে। গটমট করে নীচে নেমে এল।

সুরভি বেড়ালের মতো কান খাড়া করে ছিল। মুখ বেঁকিয়ে বলল,—কী, শুনলে তো? যাও, এবার ঘাড় হেঁট করে কলের মিস্ত্রি খুঁজে আনো।

প্লাম্বার প্রায় ঈশ্বরের মতোই দুর্লভ। আর ছুটির দিনে তো কথাই নেই, তাদের সন্ধান পেতে ঘাম ছুটে যায়। প্রচুর ঘুরে টুরে একটা বুড়ো লোককে ধরে আনল মন্দার। সাকশান টাকশান করতে জল এল বটে, তবে কেমন মরা মরা। এ অঞ্চলে জলে আয়রন খুব, পাইপের গায়ে মোটা আস্তরণ পড়েছে, পুরো লাইনটাই নাকি বদলানো দরকার।

গুনে গুনে একশোটি টাকা নিল প্লাম্বার। তাকে বিদেয় করেই মন্দার বলল,—চটপট শাড়ি বদলে নাও।

সুরভি অবাক হয়ে বলল—কেন?

—আজ রোববার, আজই ঘুরে আসি চলো।

—কোথ্থেকে?

—সুব্রত নন্দীর কাছ থেকে।

—এক্ষুণি যাব কী করে? রান্নাবান্না সব পড়ে আছে।

—থাকুক। এসে সেদ্ধভাত করে নিও।... আর সহ্য হচ্ছে না, আর সহ্য হচ্ছে না।

দুই

প্রকাণ্ড একখানা কাগজ টেবিলে মেলে ধরে সুব্রত নন্দী বলল,—দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান। প্রত্যেক ফ্লোরে তিনটে করে ফ্ল্যাটের প্রভিশান। দু'পাশে দুটো টু রুম ডাইনিং, মাঝেরটা ছোট, ওয়ান রুম।

সুরভি ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। সাদা কাগজের গায়ে অসংখ্য জ্যামিতিক

আঁকিবুঁকি। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, রম্বাস, ট্র্যাপিজিয়াম, সরলরেখা, বক্ররেখা। কী অদ্ভুত গাণিতিক নিপুণতায় এঁকে দেওয়া হয়েছে তিন তিনটে গৃহ! উঁহু, গৃহ নয়, গৃহের নাগরিক সংস্করণ।

মন্দারও নক্‌শাটা জরিপ করছিল। কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করল,—সিঁড়ি কোথায়?

—হা হা, সিঁড়ি ছাড়া কি বাড়ি হয়? এই তো। ক্রস ক্রস করা অংশটাতে আঙুল বুলিয়ে ফের ফ্ল্যাটের চৌখুপিতে ফিরল সুব্রত নন্দী,—আপনাদের জন্য আইডিয়াল হবে এই ফ্ল্যাটটা। তিনতলার ওপর, খোলামেলা, পার্কও পাবেন এদিকটায়। মানে সাউথ পুরো ওপেন। পার্কের অ্যাডভান্টেজটা বুঝছেন? দক্ষিণ কোনও দিনই বন্ধ হবে না।

মন্দার খুশি খুশি মুখে বলল,—কিন্তু ফ্ল্যাটের এন্‌ট্র্যান্সটা ঠিক কোনটা বুঝছি না তো!

—এই যে, এখানটা কাটা রয়েছে। তারপর এই ঢুকেই লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস। সাইজটা আপনি খারাপ বলতে পারবেন না। নাইন বাই টোয়েন্টি মতন। আর এই হলো আপনার মাস্টার বেডরুম। ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ...

সুরভি জিজ্ঞেস করল,—অন্য বেডরুমটার যেন কত সাইজ?

—মাস্টার বেডরুমের চেয়ে মারজিনালি ছোট। দশ বাই দশ। বাথরুম ধরুন গিয়ে সাড়ে চার বাই আট।... আর এইটাই হলো আসল ঘর। সুব্রত চোয়াল ছড়িয়ে হাসল,—বউদির কিচেন।

—এ তো বেশ বড়। সুরভির চোখ জ্বলজ্বল।

—আমি নিজে আর্কিটেক্টের সঙ্গে বসে এটা বাড়িয়েছি। ছোট কিচেনে রান্না করতে বউদিদের বড় কষ্ট হয়।

চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে সুব্রত। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, থ্যাবড়া নাক, ফোলা ফোলা গাল, চোখ দুটো সামান্য লালচে। মন্দারের মনে হলো, অ্যালকোহলের প্রভাব। তবে লোকটার মুখটা বেশ টানছিল মন্দারকে। এক ধরনের গরিমা যেন রঙিন বিজ্ঞাপনের মতো ঝলমল করছে সুব্রতর মুখে।

তবে সুব্রত নন্দীর ওই গরিমা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাইজের অ্যালসেশিয়ান। জুলজুল চোখে প্রভুর দু'পাশে বসে আছে কুকুর দুটো, ভারী নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে।

জন্তু দুটোকে দেখে প্রথমটা তো রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল সুরভি। বাপ্‌স

রে, কী শান্ত অথচ কী হিংস্র চেহারা। লকলক করছে লম্বাটে জিভ, আর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরাচ্ছে।

সুরভির ভয় দেখে সুব্রতর পুরু ঠোঁটে অভয় হাসি,—ওরা কিন্তু কিছু করবে না বউদি। আসলে দেখতে যা সাংঘাতিক, আদতে তত ভায়োলেন্ট নয়।

অন্যমনস্ক হাতে পিঠে আঁচলটা টেনে নিল সুরভি। কথা বলতে বলতে মন্দারের থেকে সুরভির দিকেই সুব্রতর দৃষ্টি বেশি। চোখটা তেমন লোভাতুর নয়, তবু যেন কী আছে! অস্বস্তি হয়।

মন্দার সিগারেট ধরিয়েছে। প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সুব্রতকে। আলতোভাবে জিজ্ঞেস করল,—আপনার এখন কটা প্রোজেক্ট চলছে?

—অফিসিয়ালি তিনটে রানিং। একটার কাজ অবশ্য মোটামুটি শেষ। আর একটা চলছে কসবায়। আর এইটা শুরু হবে।

সুরভি প্রশ্ন করল,—আপনি একাই সব দেখাশুনো করেন?

—একা কী হয়। লোকজন আছে। আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকটার, তিনে মিলে বিল্ডিং প্রোমোটার। ছন্দ মিলিয়ে বলতে পেরে সুব্রত নিজেই গদগদ,—আমার সব কাজ করে এক্সপিরিয়েন্সড হ্যান্ডরা। আমি তো আর বড়লোকদের জন্য অট্টালিকা বানাই না, আমি সেবা করি মধ্যবিত্তদের। আমি ফিল্ করতে পারি মধ্যবিত্তদের কাছে একটা ফ্ল্যাট মানে কতখানি। সারাজীবনের সঞ্চয় ঢেলে তারা একবারই আস্তানা খোঁজে। ফর পারমানেন্ট পারপাস্। এটা বুঝি বলেই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি যাতে এই মানুষগুলোর মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারি। কড়া নজর রাখি যাতে তাদের কষ্টের টাকাটা জলে না যায়।

একটু যেন বেশিই বকছে সুব্রত। কথার জালে মোহিত করে ঠকিয়ে দেবে না তো? মন্দার প্রশ্ন করল,—ফ্ল্যাটের মোট এরিয়া তাহলে কত হচ্ছে?

—সুপারবিল্ট্ নিয়ে ধরুন গিয়ে সাতশো কুড়ি মতো।

সুরভি বলল,—সুপারবিল্ট?

—হ্যাঁ। সুব্রত কাঁধ ঝাঁকাল,—ধরুন মোট ফ্ল্যাট হচ্ছে গিয়ে বারোটা। তার মধ্যে তো অনেক কিছুই কমন থাকছে। সিঁড়ি, সেপ্টিক ট্যাংক, ছাদ, কমন প্যাসেজ...। এ সবের জন্য ছাড়া ল্যান্ড এরিয়াটা সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে তো।

—এগ্জ্যাক্ট কার্পেট এরিয়া কত হবে?

—ওই ফিফ্টিন পারসেন্ট মতো বাদ দিন। অ্যারাউন্ড সওয়া ছশো। আমার তো মনে হয় আপনাদের মতো ছোট ফ্যামিলির পক্ষে একদম পারফেক্ট।

মন্দার কথাটা মেনে নিল। তাদের অফিসের দেবদত্ত সদ্য সদ্য ফ্ল্যাটে গেছে,

তারও তো ওই রকমই মাপ। সাতশো চল্লিশ মতো, সুপারবিল্ট্ নিয়ে। তার চেয়ে দশ বিশ স্কোয়্যার ফিট কমে তার ফ্ল্যাট কীই বা এমন ছোট হবে। দেবদত্তর ফ্ল্যাটটা তো খুব ক্ষুদে মনে হয় না।

নক্শাটা গুটিয়ে রাখছে সুব্রত। বলল,—তাহলে আপনাদের জন্য ওই ফ্ল্যাটটাই মার্ক করে রাখি? তিনতলারটা?

মন্দার তবু ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত যেন। বলল,—কবে নাগাদ শুরু করছেন কাজ?

—অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল্। মানে প্ল্যান স্যাংশান হয়ে গেলে আর একদিনও দেরি করা নয়।

—তাও কতদিন লাগতে পারে মনে হয়? বুঝতেই তো পারছেন আমাদেরও সেই মতো টাকাপয়সার অ্যারেঞ্জমেন্ট...। মন্দার দেঁতো হাসল,—লোন টোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো।

—দূর, ওটা আজকাল একটা ভাবনা নাকি? টাইমলি সব কাগজপত্র দিয়ে দেব, সাত দিনে পেয়ে যাবেন। সুব্রতর চোখ সার্চলাইটের মতো ঘুরল মন্দার-সুরভিতে,—বলেন তো আমিও লোনের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

—না না, কাগজপত্র ঠিক থাকলে অফিস থেকেই লোন পেয়ে যাব। সুরভি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তা আপনি রেটটা ফাইনালি কী করছেন?

—লজ্জা দিচ্ছেন কেন বউদি? সুব্রতর মুখে এবার বিনীত হাসি,—আপনারা পাড়ার লোক, আপনাদের সঙ্গে রেট নিয়ে কী কচকচ করব! এখানে মার্কেট রেট যাচ্ছে এখন নশো, ওটা তো আমি আপনাদের কাছে চাইতে পারব না। বলেই গলা নামিয়েছে,—আপনাদের জন্য সাড়ে আটশো। শুধু আপনাদের জন্যে।

মন্দার আর সুরভি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রেটটা যেন সত্যিই একটু কম মনে হচ্ছে।

সুব্রত ফের বলল,—আমার ওপর আস্থা রাখুন বউদি। আমি যতটা পারি ততটাই কমে করার চেষ্টা করব। আফটারঅল দিস ইজ আ সোশাল সারভিস্। আপনাদের সামান্যতম উপকারেও যদি আসতে পারি...

—কবে নাগাদ বুক করতে হবে?

—যেদিন আপনাদের খুশি। তবে বোঝেনই তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। ওই তিনতলার ফ্ল্যাটটা কিন্তু সত্যিই অ্যাট্রাকটিভ, যদি পছন্দ করে বুক করে রাখেন তো আপনারাও নিশ্চিন্ত। আর ক্যাশও যতটা দিয়ে দিতে পারবেন, ততটাই আপনারা এগিয়ে রইলেন।

মন্দার আর সুরভি উঠেই পড়ছিল, হঠাৎ অফিসঘরের দরজার মাথায় চোখ আটকে গেল মন্দারের। ঢাউস একখানা রামকৃষ্ণদেবের ছবি, পাশে কার্ল মার্কস্ও

বিরাজমান। কী অপূর্ব সহাবস্থান।

মন্দারের থমকে যাওয়াটা নজরে পড়েছে সুব্রতর। হেসে বলল, কী দেখছেন?

মন্দার তাড়াতাড়ি বলল, রামকৃষ্ণদেবের ছবিটা খুব জ্যান্ত তো!

—ওটা একটা রেয়ার ছবি। বরানগরের এক ঠাকুরের ভক্তর কাছে পেয়েছিলাম বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে সুব্রত। ছবির তলায় এসে দু'হাত কপালে ঠেকাল,—এই মানুষটাকে আমি খুব মানি মশাই।

—অনেকেই মানে। আমরাও মানি।

—আমি একটু বেশি করে মানি। উনিই তো আমাদের লাইনের আসলি কথাটা বলে গেছেন।

মন্দারের চোখ বিস্ময়ে গোল গোল।

—বুঝলেন না? টাকা মাটি, মাটি টাকা। কতকাল আগে কথাটা উনি বুঝেছিলেন বলুন?

বাইরে এসে মন্দার আর সুরভি জোর একচোট হাসল। কী কথার কী অর্থ করে নিয়েছে সুব্রত নন্দী!

রবিবারের সকাল ছুটির আলস্য মেখে গা এলিয়ে বসে আছে। মোড়ের চা দোকানে জটলা বেঁধে আড্ডা দিচ্ছে ছেলেরা, পথচারীদের গতি মন্থর। সবে সাড়ে দশটা বাজে, এর মধ্যেই রোদ্দুর যথেষ্ট চড়া। মন্দার আর সুরভি দ্রুত পা চালাচ্ছিল। বাড়িতে সব কাজ পড়ে আছে।

হঠাৎ মন্দার বলল,—এই, স্পটটা একবার দেখে যাবে নাকি?

সুরভি অবাক,—তুমি চেনো নাকি জায়গাটা?

—অফকোর্স চিনি। চন্দনপুকুর পার্কটার পাশেই তো।

—সে তো বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে।

—কত আর! মিনিট পাঁচ-সাত। চলোই না।

—সংসারের কাজগুলোর কী হবে?

—বললাম তো, সেদ্ধভাত খাব আজকে। চলো, দেখেই যাই।

সুরভি আর আপত্তি করল না। এমন একটা শুভ দিনে মন্দারের কথায় আপত্তি করা বুঝি শোভাও পায় না।

সুব্রত নন্দীর অফিস থেকে বেরিয়ে খানিক হাঁটলে রিক্সাস্ট্যান্ড, সেখান থেকে একটা সরু রাস্তা ভেতরে ঢুকে গেছে। রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা পার্ক। বাচ্চাদের জন্য। এখানেই একসময়ে একখানা ছোট পুকুর ছিল, পুকুর বুজিয়ে অনেকদিন আগেই বেশ কয়েকটা বাড়ি উঠে গেছে।

পার্ক আর বাড়িগুলোর মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মন্দার। আঙুল তুলে

দেখাল—ওই যে ওইটা। ওই বাড়িটা। ওটাই ভেঙে...

অদূরে এক ভাঙাচোরা প্রাচীন একতলা বাড়ি। কলিবিহীন বাড়িটার গায়ে সময়ের ঘন কালো শ্যাওলা।

সুরভির চোখ বড় বড়,—ও বাবা, এ যে একদম ভূতুড়ে বাড়ি গো।

—ভূতুড়েই তো। মালকিন এক থুরথুরে বিধবা। বুড়ি অবশ্য একা থাকে না, সঙ্গে এক ভাইঝি আছে। মাঝবয়সী। আনম্যারেড।

—তুমি এত জানলে কী করে?

—শুনেছি। পাড়াতেই। সুব্রত নন্দীর সঙ্গে বুড়ির একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। ওরাও নাকি একটা ফ্ল্যাট পাবে। সঙ্গে কিছু ক্যাশও।

—এত খবর জানো, কই আমায় বলোনি তো?

—হুঁ হুঁ বাবা, আমার মাথাতেও একটা ফ্ল্যাটের প্ল্যান চলছিল, সব খোঁজই রাখছিলাম। মন্দার হাসল,—আমায় যতটা ক্যালাস্ ভাবো, আমি ততটা নই।

সুরভি হাসতে গিয়েও হাসল না। কী যেন ভাবছে। জিজ্ঞেস করল,—ভদ্রমহিলা নিজের বাড়ি ভাঙতে দিচ্ছেন?

—আরে, বুড়ির তো লাভই লাভ। ওই হানাবাড়ি ওর কোন কম্মে লাগছে? বরং ঝকঝকে ফ্ল্যাট পেয়ে গেল, সঙ্গে ক্যাশ। বুড়ি মরলে মেয়েটারও একটা গতি হলো।

সুরভি তবু যেন ঠিক মানতে পারছে না। ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল,—যাই বলো বাপু, নিজের বাড়ির একটা আলাদা দাম আছে। কত স্মৃতি আছে ও বাড়িতে, কত সুখ দুঃখ... আমি হলে কখনই ভাঙতে দিতাম না।

—এ তো অদ্ভুত কথা! কেউ না দিলে আমাদের মতো ভূমিহীনরা জায়গা পাবে কোথ্থেকে? তোমার আমার শখের ফ্ল্যাটই বা তৈরি হবে কোথায়? শূন্যে?

সুরভির তবু মন খুঁতখুঁত,—আচ্ছা, বাড়িটা ভাঙা হলে মহিলারা যাবেন কোথায়? বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট উঠতে তো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

—তুমি ওদের নিয়ে ব্যস্ত হলে কেন বলো তো? সে ভাবনা তো প্রোমোটারের। মন্দার অসহিষ্ণু হলো,—তুমি আগে ভাবো তুমি কী করবে? আই মিন, আমরা কী করব? ফ্ল্যাটের জন্য লড়ে যাব, কি যাব না?

—নাহ্, চেষ্টা তো করতেই হবে। ক'দিন আর অন্যের বাড়িতে দয়াপ্রার্থী হয়ে বাস করব! যেখানেই একটু পুঁরনো হব, বাড়িঅলা বাঁকা চোখে তাকাতে শুরু করবে।... হালদার বাবুদেরও তো দেখলাম, কেমন চোখের সামনে বদলে গেল!... আর ভাল্লাগে না।

মন্দার মাথা দোলালো,—গুড। ভেরি গুড।

তিন

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে মনে মনে হিসেব কষছিল মন্দার। সাতশো কুড়ি স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাট, মানে ধরা যাক সওয়া সাতশো। অর্থাৎ দাম পড়বে সওয়া সাতশো ইনটু আটশো পঞ্চাশ... ছ'লাখ পনেরো প্লাস। মোটামুটি ছ'লাখ কুড়ি। এর সঙ্গে আছে রেজিস্ট্রেশান ফি, আছে টুকটাক আনুষঙ্গিক। ফিটিং-টিটিং তো নিজের পয়সাতেই করতে হবে, প্রোমোটার তো সবটা করেও দেবে না। সেখানেও না হোক বিশ পঁচিশ হাজার যাবে। রেজিস্ট্রেশান ফি এখন সাত পারসেন্ট, দেবদত্ত বলছিল। তার মানে আরও হাজার পঁয়তাল্লিশ। উঁহু, অত মনে হয় লাগবে না। সুব্রত নন্দী থোড়াই পুরো টাকা সাদায় নেবে! কোনও প্রোমোটারই নেয় না। যদি সিক্সটি পারসেন্ট হোয়াইটে নেয়, দাম এসে দাঁড়াবে চার লাখের নিচে। হেসে খেলে তখন বেঁচে যাবে হাজার পনেরো। অবশ্য ছ'লাখ সাড়ে ছ'লাখ থেকে পনেরো হাজার কমলে কী-ই বা এমন সুসার হবে।

দাম কম দেখানোরও সমস্যা আছে। অন্তত মন্দারদের। তারা দুজনেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, সাদা ছাড়া কালো টাকা তাদের আছে কোথায়! দাম কম হলে উল্টে বাঁশ। লোন কম মিলবে। ব্যাংকগুলো এখন ধার দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের লিমিট তো এইট্টিফাইভ পারসেন্ট। অর্থাৎ মন্দারদের জুটবে মেরে কেটে সাড়ে তিন লাখ। বাকি লাখ আড়াই তিন কি আকাশ থেকে পড়বে?

সমস্যা আরও আছে। সাড়ে তিন লাখ দেনা করলে মাস মাস শোধ দেওয়ার ব্যাপারও তো আছে। মাসিক কত করে পড়তে পারে? চার-পাঁচ হাজার? কম নয়। প্রায় সাধ্যের বাইরেই। একদিন-দু'দিনের কথা তো নয়, টানা পনেরোটা বছর টানতে হবে। পারবে তো? নতুন করে আর সঞ্চয় হবে না এটা একেবারে নিশ্চিত।

এখনই বা কতটুকু সঞ্চয় হয়? দুজনে মিলিয়ে রোজগার প্রায় সতেরো হাজার, কিন্তু খরচাও তো আছে। ঝিমলির স্কুলের মাইনেই তো ছশো। স্কুলবাস-টুলবাস মিলিয়ে মেয়ের জন্যই তো হাজার ধরে রাখতে হয়। সেভেনে উঠল ঝিমলি, ওর অঙ্কটঙ্কগুলো ক্রমশ জটিল হচ্ছে, একজন অঙ্কের টিউটার রাখা খুব জরুরি। ইংরিজিতেও ঝিমলির একটু দুর্বলতা আছে...। এই সেভেন এইটেই মেয়ের ভিত শক্ত না করে দিলে পরে আর ঝিমলি সামাল দিতে পারবে না। দুটো ভাল টিচার মানে অন্তত হাজার, এই খরচটাও ভাবতে হবে। সুরভি তার বাবা মার একমাত্র

সন্তান। বাবা মারা যাওয়ার পর সামান্য কটা ফ্যামিলি পেনশানের টাকায় সুরভির মার চলে না, নিয়ম করে প্রতি মাসে তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে আসে সুরভি। মার দেখাশুনোর জন্য সুরভি একটা রাতদিনের লোক রেখে দিয়েছে, তার মাইনেটাও সুরভিই দেয়। এই খরচটা কি কমানো যাবে? নাকি নিজের বাবা-মাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করবে মন্দার? ক্ষীরপাইতে দেশ মন্দারদের, সেখানেই দাদার সঙ্গে আছেন বাবা-মা। দূরে থাকে বলে মন্দার কি তার কর্তব্য কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে? গত বছরের আগের বছর মন্দারের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, চিকিৎসা করতে তাঁকে আনা হলো কলকাতায়। তখন ডাক্তার দেখানো, নার্সিংহোমে ভর্তি করা, গলব্লাডার অপারেশান, সব দায়িত্বই এসে পড়েছিল মন্দারের ঘাড়ে। মন্দার দায় বলে মনে করেনি, তবু তো দায়। নয় নয় করে চিকিৎসায় হাজার বিশেক টাকা গলে গিয়েছিল মন্দারের। দাদা বারোমাস বাবা মার দেখভাল করে, সে দায়িত্বও নেহাত কম নয়, কোন মুখে দাদাকে ওই খরচের ভাগ দিতে বলে মন্দার। দাদার সামর্থ্যই বা কতটুকু! প্রাইমারি স্কুলটিচারের মাইনেই বা ক'টাকা! মা ষষ্ঠীর কৃপায় সংসারটিও তো নেহাত ছোট নয় দাদার। তিন মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়েটা তো ঘাড়ের কাছে ফোঁস ফোঁস করছে, এবার তার বিয়ে দিলেই হয়।

ভাইঝির কথা মনে পড়তেই ঝিমলি ফের ঢুকে পড়ল মন্দারের ভাবনায়। পনেরো বছর ধরে লোন চলবে, পনেরো বছর পরে ঝিমলি হবে সাতাশ, এর মধ্যে তার বিয়ের কথাও তো চিন্তা করতে হবে। সে জন্যও তো কিছু সঞ্চয় চাই। কোথ্থেকে হবে? কী ভাবে হবে?

মন্দার ভেতরে ভেতরে সামান্য অস্থির বোধ করল। সুরভি ওপাশের খাটে পিছন ফিরে শুয়ে। সুরভির ওপারে জানলার দিকে ঝিমলি। নাইটল্যাম্পের মৃদু আলোয় বউ-মেয়েকে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিল মন্দার। কেমন যেন মায়াবী। ছায়া ছায়া।

মন্দার নিচু স্বরে ডাকল,—শুনছ?

ছোট্ট উত্তর এল,—উঁ?

—জেগে আছ?

—কেন?

—একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—অনেক টাকার ধাক্কা গো। দুম করে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে?

সুরভি এদিকে ফিরল, মুখোমুখি হলো মন্দারের। মাঝে প্রায় হাত চারেক

ব্যবধান। মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর খাটে আর ধরে না তিনজনকে, আলমারি আর ড্রেসিং টেবিলের মাঝখানে ফোল্ডিং খাট পেতে নেয় মন্দার। সদ্য সদ্য পাকা ড্রেন তৈরি হয়েছে বাড়ির সামনে, ইদানীং তাই মশার দাপট খানিকটা কম। ফুলস্পিডে পাখা চালালে রাত্রে আর মশারি টাঙানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। মন্দার তবুও সুরভির মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না।

সুরভি ঈষৎ গলা ওঠাল,—এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? টাকা তো কিছু আছে ব্যাংকে, তাই দিয়ে আপাতত বুক করে দাও।

—কতই বা আর আছে!

—পঞ্চাশ-ষাট হাজার তো আছেই। ওটাই নয় দিয়ে দাও।

—তার পর?

—কী তারপর?

—মানুষের আপদ-বিপদও তো আছে। ব্যাংক একেবারে ফর্সা করে দেব?

—আবার জমবে।

—হুঁহ্, জমবে! লোন নিলে কত করে কাটবে আন্দাজ আছে?

—সে যা কাটার কাটবে। তার মধ্যেই বাঁচতে হবে।

—পারবে? ঝিমলির বিয়ের ভাবনাও আছে কিন্তু।

—দ্যাখো, অত ভাবলে চলে না। কবে ঝিমলি বড় হবে, কবে তার বিয়ে হবে, রাধা কবে নাচবে, ন' মণ তেল পুড়বে...। সুরভির গলা সামান্য নামল। ঘাড় ফিরিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে একটু দেখেও নিল যেন,—আমার তো মনে হয় ঝিমলি বড় হচ্ছে বলেই এসব আরও বেশি করে ভাবা দরকার। ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদের নিজস্ব কিছু কিছু প্রাইভেসি লাগে। আলাদা একটা ঘর... পড়াশুনোর জায়গা...

মন্দার চুপ করে রইল। প্রাইভেসি কি শুধু ঝিমলিরই চাই? এই যে এখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে চার হাতের একটা ফাঁকা জায়গা... হাত বাড়ালেও সুরভিকে ছুঁতে পারে না মন্দার, কোনও কোনও দিন গভীর রাতে দুজনকে চোরের মতো উঠে যেতে হয় ড্রয়িংরুমে, হাজার সংকোচ আর সাবধানতায় শব্দহীন মিলন...! উপায়ই বা কী? এই ওয়ানরুম ড্রয়িং-ডাইনিং-এর ভাড়াই তো সতেরোশো! নামেই ড্রয়িং ডাইনিং, প্রকৃতপক্ষে কতটুকুই বা জায়গা সেখানে? শুধু সোফাসেট, সেন্টার টেবিল আর টিভি টেপ রাখার ক্যাবিনেটেই তো বসার জায়গাটুকু জবরজং। ডাইনিং-এর জায়গায় চার জনের খাবার টেবিল, ফ্রিজ আর ওয়াটার ফিল্টার রাখার পর নড়াচড়া করার রাস্তাই নেই। এই ফ্ল্যাটই মন্দাররা ছেড়ে দিলে কম করে তিন হাজারী হবে। হবেই। বাসস্ট্যান্ডে সুপারমার্কেট গড়ে ওঠার

পর হু হু করে দর বেড়েছে এ অঞ্চলের, এখানে ভাড়া নিয়ে টিকে থাকতে হলে ওসব প্রাইভেসি টাইভেসির কথা মাথায় আনলে চলবে না।

মন্দার চিত হয়ে শুয়ে ছিল। সুরভি আবার বলল,—এখানে এখন ফ্ল্যাটের কত করে রেট যাচ্ছে জানো? এই তো বাজারের পাশে যেটা উঠছে, মিসেস রায়রা বুক করেছেন, সাড়ে নশো টাকা স্কোয়্যার ফিট। সেই জায়গায় তুমি পাচ্ছ সাড়ে আটশোয়। ওটা ছাড়ার কথা ভাবা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—হম্, তা বটে। মন্দার চুলে আঙুল চালাল। দশ আঙুল ডুবিয়ে আগা থেকে গোড়া অবধি ছুঁয়ে যাচ্ছে—নন্দী এত কমে দিচ্ছে কী করে এটাই তো রহস্য।

—নিশ্চয়ই ওই মহিলা আর মহিলার ভাইঝিকে ঠকাচ্ছে।

—সে সব প্রোমোটারই ঠকায়।... কিন্তু আমাদের সস্তায় দিচ্ছে কেন? মাল মেটিরিয়াল সব ঠিকঠাক দেবে তো? দু'দিন পরে হয়তো দেখলাম দরজার পাল্লা খুলে বেরিয়ে গেল, সিলিং ফেটে চাবড়া ঝুলছে..

—তোমার আবার বেশি বেশি। সব সময়ে শুধু নেগেটিভ চিন্তা।.... তুমিই তো বলছিলে ওই সুব্রত নাকি একসময়ে পার্টি-ফার্টি করত?

—ওই জন্যই তো আরও বেশি ভয়।

—উল্টোও তো হতে পারে। একেবারে ফেরেববাজ বনতে হয়তো এদের বিবেকে বাধবে।

—ভাল হলেই ভাল।

—দোনামোনা কোরো না। ডিসিশান যখন নিয়েই ফেলেছি। পরে যা হবে দেখা যাবে। আমাদের থেকেও কত হার্ড সিচুয়েশনে থেকে সব লড়ে-টড়ে বাড়ি করে ফেলছে...। আমাদের অফিসের হীরেনবাবু... তাঁর তো একার রোজগার.. দিব্যি সোনারপুরে জমি কিনে টুকটুক করে বাড়ি করে ফেললেন। আমরা তো বাড়ির ঝামেলাতেও যাচ্ছি না, এটুকু রিস্ক না নিলে চলে? তোমার অফিসের দেবদত্তও তো...।

সুরভি উঠে বসল। মাথার কাছে বেঁটে টুলে জল রাখা আছে, গলায় ঢালল একটু। পাখার নিচেও ঘামছে বোধহয়, ঘাড়-গলা মুছছে আঁচলে। বালিশ থেকে মাথা সরে গেছে ঝিমলির, ঠিক করে দিল সন্তর্পণে।

ছোট্ট একটা হাই তুলে বলল,—তবে হ্যাঁ, এখন থেকে আমাদের একটু সমঝে বুঝে চলতে হবে। তোমার বাবুয়ানি আর চলবে না।

—আমার? আমি কী বিলাসিতা করি?

—খাওয়ার বিলাসিতা নেই তোমার? কথায় কথায় ভেটকি চিংড়ি পাবদা মাটন...! টাকা অ্যাডভান্স করার পর একদম বাজেট করে চলতে হবে। সপ্তাহে

তিনদিন মাছ, একদিন ডিম, একদিন মুরগি, বাকি দু'দিন প্লেন নিরামিষ।

—ঝিমলির নিরামিষ রুচবে?

—বাবার রুচলেই মেয়ের রুচবে।...ঝিমলি মোটেই অবুঝ নয়, ওকে বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝবে।

—পেটে কিল মেরে ফ্ল্যাট?

—ওভাবেই করতে হয়। সবাই তাই করে।...হীরেনবাবুকে আমি কখনও মুড়ি বাদাম ছাড়া টিফিন করতে দেখিনি।

—বেশ তো, তোমার শখশৌখিনতাগুলোও কমিয়ো তাহলে। পনেরো দিন বম্বে গোয়া ট্যুর, চোদ্দ দিন কুলু মানালি, এবারে আরাকু তো ওবারে পেলিং, সমস্ত এখন শিকেয় তুলে রাখতে হবে।

—রাখব। আমি সব পারি। তুমি এখন শুধু জয়দুর্গা বলে বুকিংটা করে ফেলো।

—বলছ?

—ওফ্, এখনও দ্বিধা? তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।

সুরভি উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে যাবে। যাওয়ার সময়ে বেশ কয়েকদিন পর আলগোছে একটু আদর করল মন্দারকে।

মন্দারও হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, ঝিমলি নড়েচড়ে উঠেছে বিছানায়। মন্দার চোখ বুজে ফেলল।

চার

কুড়িয়ে কাঁচিয়ে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সুব্রত নন্দীকে দিয়ে দিল মন্দার। দিন সাতেকের মধ্যেই। সুব্রত চাইছিল পঁচাত্তর, তবে পঁয়ষট্টি পেয়েও সে খুব অখুশি নয়। এক ধাক্কায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ব্যাংক প্রায় শূন্য। তা হোক মন্দার আর এই নিয়ে ভাববে না। সে এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় তো হচ্ছে।

ফ্ল্যাট বুক করেই মন্দারের হাঁটা-চলা বদলে গেছে যেন। একটা অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তিত্ব এসেছে তার মধ্যে। আগে মিনিবাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে মন্দার বড় জোর তার দিকে কটমট করে তাকাত, এখন মন্দার তার চোখে চোখ রেখে, ঝগড়া করতে পারে। অফিসে ইদানীং এক কাঁচাখেকো জি-এম এসেছে শিলিগুড়ি থেকে, তার দাবড়ানির দাপটে সকলেই থরহরি কম্পমান। মন্দারও তার চেম্বারে ঢুকতে এতটুকু স্বচ্ছন্দ বোধ করত না, অথচ এখন সে দিব্যি মাথা তুলে বসের সঙ্গে কথা বলতে পারে। ছুটির পর রিক্রিয়েশান রুমে ব্রিজ খেলার একটা আড্ডা

বসে রোজ, মন্দারেরও অল্পস্বল্প নেশা আছে তাসের, প্রায়ই দীপক সান্যালের পার্টনার হয় মন্দার। হ্যান্ডপ্লেটা ভাল আসে না মন্দারের, আর ভুল খেললেই হলো, দীপক সান্যাল চিল্লানো শুরু করবে। দীপকদার মুখকে মন্দার খুব ডরায়। থুড়ি, ডরাত। কিন্তু সেদিন সাফ সাফ মুখের ওপর বলে দিল, আপনিই তো কলে ভুল করেছেন, ওই সময়ে এস্ আস্‌কিং হয়? বারো পয়েন্ট হাতে নিয়ে আপনি বিড ওপেন করেছিলেন কেন? পাল্টা দাবড়ানিতে দীপক সান্যাল কেঁচো, মিউ মিউ করছে।

এই বদলটা মন্দার নিজেও অনুভব করছে বেশ। কিন্তু কারণটা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। ভাড়াবাড়িতে বাস করতে করতে কি তার মধ্যে হীনম্মন্যতা জন্মে গিয়েছিল? সুব্রত নন্দীকে অগ্রিম ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি ভাবতে শুরু করেছে সে একখানা আস্ত ফ্ল্যাটের মালিক? ভাড়াবাড়িতে বাস শেষ হওয়ার আগেই কি এমনটা ঘটা সম্ভব? নাকি বাড়িওয়ালাদের চোখরাঙানি থেকে মুক্তি পেতে চলেছে এই ভাবনাটাই তার মধ্যে এক ধরনের জোর তৈরি করে দিয়েছে?

একেই কি আত্মবিশ্বাস বলে?

এই তো পরশুদিন দুম করে দিব্যেন্দুর অফিসে চলে গেল মন্দার। বহুকাল পর। দিব্যেন্দু মন্দারের একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু, এক গ্রামেই থাকত। কিন্তু ইদানীং দিব্যেন্দুকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত মন্দার। দিব্যেন্দু এখন মস্ত অফিসার, আর সে আধা সরকারি অফিসের ঊর্ধ্বতন কেরানি—ফ্ল্যাট গাড়ি সুন্দরী স্ত্রী শোভিত দিব্যেন্দুর কাছে যেতে মন্দার রীতিমতো সংকোচ বোধ করত।

দিব্যেন্দুর ঝাঁ-চকচক চেম্বারে ঢুকে অবলীলায় সস্তা দামের সিগারেট ধরিয়েছিল মন্দার। কায়দা করে বলেছিল,—কী রে, আছিস কেমন?

দিব্যেন্দু কি অতশত খেয়াল করেছিল? মনে হয় না। বন্ধুকে দেখে সে যথেষ্ট উত্তেজিত। বলেছিল—আয় আয়, অ্যাদ্দিন ডুব মেরেছিল কোথায়?

মন্দার কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল,—খুব চাপে থাকি রে। সময় করতে পারি না।

—কেন, অফিস খুব যাঁতা দিচ্ছে বুঝি?

—দূর, অফিস তো অফিসের মতোই চলে। বলেই রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল মন্দার,—একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেললাম। ওই নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন।

—ইজ ইট? বাহ্ বাহ্, দারুণ খবর। পুরোন বন্ধুরা থিতু হয়েছে দেখলে আমার যা ভাল লাগে না! দিব্যেন্দুর মুখে অবিমিশ্র খুশির ঝলক,—কোথায় বুক করলি?

সেলিমপুরের ভেতরে—বলতে গিয়েও বলল না মন্দার। কায়দা করে বলল,—যোধপুর পার্কের কাছেই।

—যোধপুর পার্ক? সে তো বেশ রইস জায়গা রে।

—গিন্নির ওদিকটাই পছন্দ।

—সাইজ কি রকম?

—আমি তো তোর মতন রিচ ম্যান নই। এবারও একটু ছলনার আশ্রয় নিল মন্দার,—হাজারের নিচে, তবে মোটামুটি খারাপ নয়। আমাদের তো ছোট ফ্যামিলি, খুব বেশি বড় নিয়ে কীই বা করব বল্?

—বটেই তো।

কেন যে সঠিক মাপটা মুখে আনতে পারল না মন্দার? এই বা কোন ধরনের হীনম্মন্যতা?

পরে বেরিয়ে মন্দারের একটু খারাপই লেগেছিল। দিব্যেন্দু যদি কখনও তার ফ্ল্যাটে যায়, মনে মনে নিশ্চয়ই হাসবে। এক অসফল বন্ধু সামান্য একটা পায়রার খোপ কিনেই তার সমকক্ষ হওয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছে, এমনও তো ভাবতে পারে দিব্যেন্দু।

তবে এক জায়গায় রঙ চড়িয়ে বলে মন্দার সত্যিই মানসিক তৃপ্তি পেয়েছে।

ইদানীং ঝিমলির হাত দিয়ে খামে করে বাড়িওয়ালাকে ভাড়াটা পাঠিয়ে দিত মন্দার। এবার মাসপয়লায় সে নিজেই গিয়েছিল। টাকাটা অবিনাশ হালদারের হাতে দিয়ে মেজাজে জিজ্ঞেস করেছিল,—আপনার বাড়ি ছাড়ার আগে ক'মাসের নোটিস দিতে হবে অবিনাশবাবু?

অবিনাশ চমকে ছিল সামান্য। পরমুহূর্তেই ভুরু কুঁচকে জবাব,—সে তো এগ্রিমেন্টেই লেখা আছে।

—পুরো টাকাটা কিন্তু আপনি কাটাননি। পাঁচ হাজার সিকিউরিটি ডিপোজিট রেখে দিয়েছেন। আশা করি নোটিস দিলে এক মাসের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাব।

অবিনাশগিন্নি কৌতূহল চাপতে পারেনি। পাশ থেকে বলে উঠেছিল,—সত্যি সত্যি আপনারা চলে যাচ্ছেন?

—আর পোষাচ্ছে না।

—কোথায় বাড়ি পেলেন?

—বাড়ি নয়। ফ্ল্যাট। কিনছি।

—তাই নাকি? অবিনাশগিন্নির চোখ জ্বলজ্বল,—খুব ভাল। খুব ভাল।

—ভাল-মন্দ জানি না। আর ভাড়াবাড়িতে থাকতে হবে না, এটাই সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট।

কথার ঠেসটা বেমালুম হজম করে নিল স্বামী-স্ত্রী। অবিনাশ হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল,—কোথায় কিনলেন?

—খুব দূরে নয়, চন্দনপুকুর পার্কের পাশে।

—কী রকম পড়ল?

—অ্যারাউন্ড নাইন। সব মিলিয়ে দশ লাখ পড়ে যাবে।

—এত? বড় ফ্ল্যাট কিনছেন?

—চিরকালই কি ঘুপচি ঘরে থাকব? এবার একটু আরাম করে থাকা যাবে। পূর্ব দক্ষিণ খোলা তিনতলার ফ্ল্যাট, বুঝতেই পারছেন...

অবিনাশ হালদারের ভুরু আরও জড়ো হচ্ছিল। যেন তার বাড়িতে সতেরোশো টাকা ভাড়া দিয়ে বসবাস করা কোনও ভাড়াটের দশ লাখে ফ্ল্যাট কিনে ফেলা বেশ গর্হিত কাজ। যেন দামী ফ্ল্যাট কেনার জন্যই তাকে কম ভাড়া দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমিয়েছে ভাড়াটে! হয়তো বা মানেও লাগছিল। নিজের বাড়িকে ঘুপচি শুনতে কোন বাড়িওয়ালা ভালবাসে?

অবিনাশকে আরও একটু তাতানোর জন্য মন্দার ইচ্ছে করে বলল,—গৃহপ্রবেশের দিন আপনারাও যাবেন। অ্যাডভান্স নেমন্তন্ন রইল।

অবিনাশ ভাবলেশহীন গলায় জিজ্ঞেস করেছিল,—কবে যাচ্ছেন?

—ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেলেই যাব।

—মানে? রেডি ফ্ল্যাট নয়?

—না। আন্ডার কন্সট্রাকশান। বুকিংটা সেরেই আপনাদের জানিয়ে দিলাম। ভাবলাম, আপনারা নিশ্চয়ই শুনে আহ্লাদিত হবেন।

টিপ্পনীটা যেন গায়ে বিঁধল না অবিনাশের। মনে হয় বেশ হতাশ হয়েছে। হোক গে, মন্দার পাত্তা দেয়নি।

অবিনাশ হালদার চটল, কি ব্যথিত হলো তাতে ভারী বয়েই গেল মন্দারের। শালা অবিনাশ নির্ঘাৎ মনে মনে হিসেব শুরু করে দিয়েছে মন্দাররা উঠলে এবার কত ভাড়া হাঁকা যায়। সঙ্গে কত মোটা অ্যাডভান্স।

ভাবুক, ভাবতেই থাকুক। তবে লোকটা এখন কিছুদিন আর ঘাঁটাবে না মন্দার-সুরভিকে। ফ্ল্যাট বুক করার এটাও তো একটা প্লাস পয়েন্ট।

পাঁচ

—বাবা, দেখেছ মার কাণ্ড?

—কী হয়েছে?

—মা আবার পড়াশুনো শুরু করেছে। হিহি।

মন্দার অফিস থেকে ফিরে শার্ট ছাড়ছিল, অবাক চোখে দেখল সুরভিকে।

সত্যিই তো, বিছানায় বসে কাগজ-ডটপেন নিয়ে কী করছে সুরভি?

চোখ ঘুরিয়ে মন্দার জিজ্ঞেস করল,—কী করছ তুমি?

সুরভির আগে ঝিমলির জবাব,—ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান।

—মানে?

—তুমি তো ক'দিন ধরে দেরি করে ফিরছ, তাই দ্যাখোনি... মা এখন রোজ অফিস থেকে এসেই নক্‌শা আঁকতে বসে যায়।

—কিসের নক্‌শা?

—ফ্ল্যাটের। মানে আমাদের ফ্ল্যাটের কোন ঘরে কী থাকবে, লিভিংরুম কেমন ভাবে সাজানো হবে...। ঝিমলি ঝপ করে একখানা কাগজ টেনে মন্দারকে বাড়িয়ে দিল,—এই দ্যাখো, কত ভাবে ফ্ল্যাটটাকে ডেকরেট করছে মা।

সুরভি একটু অপ্রস্তুত যেন। হাসল লাজুক মুখে,—খারাপটা কী করছি? যেখানে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে, সেটাকে একটু সাজানো গোছানোর কথা ভাবব না?

মন্দার কাগজটা দেখছিল। কত রকম ভাবে যে ছবি এঁকেছে সুরভি। কোথাও শুধুই আলাদা ভাবে মাস্টার বেডরুমখানা, কোথাও বা আলাদা করে শুধুই দুটো বেডরুম। ড্রয়িং-কাম ডাইনিং স্পেসটাকে ভাগ করেছে নানান সাইজে। খাটের মাপ ফেলেছে কোনও নক্‌শায়, কোথাও বা চৌকো চৌকো করে আলমারি ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিং টেবিল আঁকা। ক্যাবিনেট, সোফাসেট, ডাইনিংটেবিল, ফ্রিজ, রুমির পড়ার টেবিল, সবই সাজিয়ে ফেলেছে কালির আঁচড়ে।

মন্দার হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। দেখতে দেখতে সেও কেমন যেন নক্‌শার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। কাগজটা হাতে নিয়েই বসল বিছানায়। সিরিয়াস মুখে বলল,—ড্রয়িংরুমের জন্য একটু বেশি জায়গা ছাড়া হয়ে গেল না?

—উপায় নেই। আমি অনেক হিসেব করে দেখেছি... সদর দরজার জন্য তিন ফুট বাদ গেলে বসার জায়গার চওড়াটা হয় মাত্র ছ'ফুট। ধরো লম্বাটা রইল দশ ফুট, মানে শোওয়ার ঘরের দরজার আগে পর্যন্ত বসার জায়গার জন্য আমরা পাচ্ছি দশ বাই ছয়। এইটুকু জায়গায় তুমি কোথায় কী রাখবে বলো? ক্যাবিনেট নিশ্চয়ই তুমি বেডরুমে নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে না?

—কিন্তু এদিকটা বেশি রাখলে তোমার খাওয়ার জায়গা তো ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—খুব ছোট হবে না। মোটামুটি নয় বাই নয় মতো পাব।

—কিন্তু মা, ওদিকেও তো খানিকটা জায়গা তোমায় বাদ দিতে হবে।

—কেন?

—বা রে, হাঁটাচলার জন্য জায়গা ছাড়তে হবে না? মন্দার কাগজটায় ঝুঁকল

আর একটু,—তারপর দ্যাখো, তোমার ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাও পড়ছে ডাইনিং-এর দিকে, সেখানেও খানিকটা জায়গা খাবে।

—তাতে কী আছে? ওর মধ্যেই ধরে যাবে!

—অসম্ভব। ধরতেই পারে না। তোমার ডাইনিং টেবিলের সাইজ কী আছে একবার ভাবো।

—ও আমার ভাবা হয়ে গেছে। ওটা আমি একটা কায়দা করব।

—কী রকম?

ঝিমলি মুচকি হাসল,—ওই ডাইনিং টেবিলটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে বাবা। মা বলছিল পার্ক স্ট্রিটের কোন্ অকশন শপে ডিম সেপের টেবিল দেখে এসেছে, চেপে চেপে বসলে স্বচ্ছন্দে সেখানে ছ'জন বসতে পারবে।

সুরভির ঠোঁটে গর্বিত হাসি,—এটা সিম্পল্ ম্যাথমেটিক্স মশাই। রেক্টাংগ্‌লের থেকে ইলিপ্‌টিকাল শেপের টেবিল হলে ঘরদোরের জায়গা অনেক কম নষ্ট হয়।

—হুম্।—মন্দার রসিকতা জুড়ল,—অঙ্কে তোমার এত মাথা জানা ছিল না তো!

—তুমি আমার কতটুকু জানো? সুরভি হাঁটু মুড়ে গুছিয়ে বসেছে,—এ ক'দিনে ক'টা নিলামঘরে ঘুরেছি সে খবর রাখো? নতুন সোফা দেখেছি, দারুণ স্লিক। আমাদের ওই পুরোন ঢাউসটা আর রাখব না।

—ওটা আমারও প্ল্যান।... তবে সোফা আর না কিনে অন্য কোনও কায়দা করা যায় না? আজকাল তো বেশ সুন্দর সুন্দর বেঁটে বেঁটে বেতের চেয়ার বেরিয়েছে। আর মাঝখানটায় ধরো কাচ বসানো ছোটখাটো সেন্টারটেবিল। ওতে বসার জায়গাটা বেশ ছিমছাম লাগবে।

ঘরের সাজসজ্জার ব্যাপারে মন্দারের সঙ্গে সুরভির ঘোর অমিল। তবে এই প্রস্তাবটা সুরভি এক কথায় উড়িয়ে দিল না। চোখ কুঁচকে ভাবল একটু। তারপর বলল,—সেটা অবশ্য করা যায়, তবে একটু ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে।

ঝিমলি বলল,—দেওয়ালের ধারে ছোট একটা ডিভান রেখে কুশন দিয়ে সাজিয়ে দাও, তাহলে আর....। দেবমিতাদের বাড়িতে দেখেছি। দারুণ কালারফুল লাগে।

মন্দার বলল,—তার মানে আবার একটা ডিভান কিনতে হবে বলছিস?

—অনেক কিছুই কিনতে হবে। সুরভি ঘাড় দোলাল,—কাল একটা বিউটিফুল স্ট্যান্ডল্যাম্প দেখেছি। কাঠের। ঠিক ওই প্যাটার্নের একটা আমি বাইরের ঘরে রাখবই। কিচেনটাকেও সুন্দর করে ফারনিশ করতে হবে। কাবার্ড বানাব, একটা-

দুটো ওয়ালফিটিং থাকবে, ভাল বাসনকোসনের জন্য গ্লাসের হ্যাংগিং শোকেস....

মন্দারের এতক্ষণে ঘোর কেটেছে। হেসে ফেলল,—লিস্ট তো তোমার বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। এত যে কিনবে প্ল্যান করছ, তার টাকা আসবে কোথ্থেকে? ওটি কিন্তু আসমান থেকে ঝরবে না।

—সব হয়ে যাবে। তুমি কেঁদো না তো। লাখ লাখ টাকা খরচা করে বাড়ি কিনতে পারছি, আর কটা টাকা যোগাড় করে মনের মতো ফার্নিচার আনতে পারব না? বলতে বলতে সুরভি ফের আঁকায় ঝুঁকেছে। ডটপেন নেড়ে বলল,—এদিকে তাকাও, দ্যাখো এই কাগজটায় আমি কীভাবে সব সেট করেছি। ক্যাম্পখাট ঝিমলির ঘরে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ড্রেসিংটেবিলটাও। কিম্বা একটা সিঙ্গল খাট কিনে দেব ঝিমলিকে, ক্যাম্পখাট অতিথি-টতিথিদের জন্য তোলা থাকবে। বড় আলমারি যাবে আমাদের ঘরের বাঁ দিকের দেওয়ালে, ছোট আলমারি থাকবে ঝিমলির টেবিলের পাশে। ...আমাদের ঘরের জন্য ওয়ালফিটিং ড্রেসিংটেবিল বানিয়ে নেব। একটা আয়না দুটো র‍্যাক...

মন্দার আলতো চোখ বোলাল সুরভির অন্য নক্‌শায়। তালিকা যেভাবে লম্বা হচ্ছে... মানে আরও লাখ খানেকের ধাক্কা। তবে এই মুহূর্তে ওই চিন্তায় নতুন করে পীড়িত করতে চাইল না সুরভিকে। হয়তো বা নিজেকেও। এমন সময়ে মানুষ সব কিছুই ঈশ্বরের ভরসায় ছেড়ে দেয়।

হাসিটাকে মুখে ধরে রেখেই মন্দার বলল,—এখন কি তোমার শুধু ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানই চলবে? নাকি একটু চা-ফা পাব?

—হচ্ছে!... তুমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

—শুধু চা দিও না কিন্তু।

—আবার কী খাবে এখন? পৌনে আটটা বাজে, একটু পরেই তো...।

—পেট চুঁইচুঁই করছে। সেই কখন টিফিন করেছি।

—চিঁড়েভাজা দেব? সঙ্গে বাদাম?

—যাহ্ বাবা! অফিসেও চিঁড়ে-বাদাম, বাড়িতেও চিঁড়ে বাদাম...! মন্দার মুখে একটা ছদ্ম করুণ ভাব আনল,—তোমার ফ্ল্যাটের জন্য এখন থেকেই এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে?

—ওফ্, প্যাখনা আছে বটে ষোল আনার ওপর আঠেরো আনা। সুরভি ভ্রূভঙ্গি করল। বিরক্তির নয়, বাচ্চাদের ছেলেমানুষি দেখে বড়রা যেমন করে, অনেকটা যেন সেই রকম। খাটে ছড়িয়ে রাখা খণ্ড খণ্ড ফ্ল্যাটগুলোকে গুছিয়ে তুলছে। টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে স্মিত মুখে বলল,—ডিম ভাজা চলবে?

—দৌড়বে।

ঝিমলি বিছানায় উপুড় হয়েছে। বই উল্টোতে উল্টোতে বলল,—আমিও কিন্তু একটা ওমলেট খাব মা।

—উউম্, ওমনি বাপের পোঁ ধরল! সুরভি চোখ ঘোরাল,—এমন করলে কিন্তু ফ্ল্যাট ট্ল্যাট আর হচ্ছে না।

—যাহ্ বাবা, মাত্র একটা ওমলেটের জন্য আস্ত ফ্ল্যাট বাতিল? খাস না রে ঝিমলি।

একসঙ্গে হেসে উঠল তিনজনে। হাসিটাকে নিয়েই রান্নাঘরে চলে গেল সুরভি। মেয়ের সঙ্গে একটু খুনসুটি করে, মন্দারও বাথরুমে।

আজ মন্দারের সন্ধেটা সত্যিই ভাল। বাথরুমে অঢেল জল। পাছে না থাকে সেই ভয়ে প্লাস্টিকের বালতিগুলোও ভরে রেখে গেছে সুবালার মা। অবশ্য মন্দারের আজ স্নানের স্পৃহা নেই। বর্ষা এসে গেছে, আষাঢ়ের গোড়ায় ক'দিন বৃষ্টিতে ভিজে মন্দারের সর্দিকাশি হয়েছিল জোর, তারপর থেকে সে একটু সাবধানে সাবধানে থাকছে। নিয়মিত সান্ধ্য অবগাহন আপাতত স্থগিত।

ভাল করে মুখে চোখে জল ছোটাচ্ছিল মন্দার। আপন মনে, শিস দিতে দিতে। হঠাৎই কানে এল রান্নাঘরে গান গাইছে সুরভি। মন্দার হেসে ফেলল। বাড়ির পরিবেশটা যেন বেশ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। অনেককাল পর বাড়িতে সুরভির গানও শোনা গেল। কী চমৎকার গলা সুরভির, কেন যে গায় না!

ছোট ছোট স্মৃতি মনে পড়ছিল মন্দারের। সুরভির সঙ্গে প্রথম আলাপ, একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হওয়া...। চাকরিতে যোগ দেওয়ার বছরখানেক পর দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বকখালি। মূলত অফিস কলিগরাই ছিল গ্রুপে, অনেকে ফ্যামিলিও নিয়ে গিয়েছিল। সহকর্মী সোমেশের বোনের বান্ধবী ছিল সুরভি, সেও ছিল সেবার। যাওয়ার পথে বাসেই পরিচয়, সমুদ্রতীরে জানাজানিটা একটু গাঢ় হয়েছিল। ফেরার পরেও সুতোটা ছেঁড়েনি, বরং তারা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে দিনে দিনে। তখন এম-এ পড়ছিল সুরভি, প্রায় রোজই ইউনিভার্সিটি পালিয়ে চলে আসত ডালহাউসিতে, সেখান থেকে দুজনে মিলে সোজা গঙ্গার ধার। জাজেস্ ঘাটের আগে একটা বেদি তো প্রায় তাদের জন্য সংরক্ষিতই হয়ে গিয়েছিল সে সময়ে। আঁধার নামলেই একটার পর একটা গান শোনাত সুরভি। নিচু গলায়, গুন গুন করে। ছোট ছোট ঢেউ তুলে নদী বয়ে চলেছে সামনে দিয়ে, নদীর ওপারে ঝলমল করছে আলোকমালা, বাতাস বইছে, সঙ্গে সুরভির গান.... কেমন যেন অপার্থিব হয়ে উঠত সন্ধেগুলো।

বিয়ের পরেও তো কত রাত সুরভি গান শুনিয়েছে মন্দারকে। কী মধুর যে ছিল সেই দিনগুলো। কবে থেকে গান বন্ধ হয়ে গেল সুরভির? চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই কি? সংসারের চাপে পড়ে?

চাকরি করার তেমন ইচ্ছে ছিল না সুরভির। খানিকটা বাধ্য হয়েই শুরু করেছিল। অফিস থেকে রিটায়ার করার আগেই দুম করে একদিন গত হলেন সুরভির বাবা। তিনি ছিলেন একটু ভালমানুষ, নির্বিরোধী ধরনের। দারুণ রগুড়ে, মজার মজার গল্প বলতেন, যে কোনও আসর মাতিয়ে রাখতেন একাই। মেয়ের সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন এই দাবি তুলে। কিন্তু তিনি সংসারী হিসেবে একদমই গোছানো স্বভাবের ছিলেন না। বাবার মৃত্যুর পর সুরভি আবিষ্কার করল তাঁর একটা এল-আই-সি পর্যন্ত নেই। চাকরি করতেন বেসরকারি দপ্তরে, তাঁর মৃত্যুর পর সুরভির মার কপালে বিশেষ কিছুই জুটল না, বলতে গেলে প্রায় অকূল পাথারে পড়লেন সুরভির মা। প্রথম প্রথম মন্দার-সুরভি তাঁকে নিজেদের কাছে এনে রেখেছিল। কিন্তু সুপ্রভার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর, সংস্কারেও বাধা ছিল, মেয়ে জামাই-এর সংসারে তিনি কিছুতেই থাকবেন না। এমনকি জামাই-এর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতেও তিনি রাজী নন। উপায়ান্তর না দেখে সুরভি তখনই ট্রাভেল এজেন্সির চাকরিটা জোটাল। সুরভির টাকা নিতেও কি সহজে সম্মত হয়েছিলেন সুপ্রভা? মোটেই না। কত বুঝিয়ে-বাঝিয়ে, চেঁচামেচি রাগারাগি করে তবে যে সুরভি তাঁকে বাগে এনেছে।

ওরকম একটা আতান্তরে পড়েই কি সুরভির গলা থেকে গান হারিয়ে গেল? নাহ্, ঠিক তাও নয়। সংসারের অবিরাম চাপ, সারাদিনের অক্লান্ত খাটুনি, তার পরেও টুকটাক ছোটখাটো সাংসারিক ঝামেলা, সবার ওপরে কোথাও একটা পাকাপাকি থিতু হতে না পারার চোরা উদ্বেগ সুরভিকে ক্রমশ নীরস করে দিচ্ছিল। শুধু একটুখানি আশার আলো দেখেই কী ভীষণ খুশি এখন মন্দারের বউটা। মনমেজাজই কত অন্যরকম হয়ে গেছে।

সুরভি রোজগারপাতি করতে বেরোক এটা মন্দারও চায়নি প্রথমে। বউ মানে তার কাছে ছিল একেবারেই একটা ঘরোয়া কিছু। যে রাঁধবে বাড়বে, বাচ্চা মানুষ করবে, সন্ধেবেলা স্বামী ঘরে ফিরলে মুখে হাসি নিয়ে দরজাটি খুলে দেবে, একান্ত ভাবে নির্ভর করবে স্বামীর ওপর।

এমনটা শেষ পর্যন্ত হলো না বলে মন্দারের মনে কি ক্ষোভ আছে খুব? না। অন্তত এখন তো আর নেইই। আজকে যে এই ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবছে, সুরভির চাকরিটা না থাকলে ইচ্ছেটাকে কি সেভাবে প্রশ্রয় দিতে পারত মন্দার? তাছাড়া চাকরি করতে বেরিয়ে সুরভির বহু পরিবর্তনও হয়েছে, এবং তার বেশির ভাগটাই ভালর দিকে। আগে সুরভি বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ ছিল, সংসারের জটিল মারপ্যাঁচ ততটা বুঝত না। এখনও স্বপ্ন স্বপ্ন ভাবটা যায়নি যদিও, তবে বাস্তববোধ অনেক বেড়েছে। হিসেবীও হয়েছে যথেষ্ট। যে কোনও কাজেই এখন সুরভির

মতামতের ওপর বেশ আস্থা রাখতে পারে মন্দার। বুঝি বা খানিকটা নির্ভরও করে।

এই তো, গত বুধবার অফিস থেকে ফিরে মন্দার বলেছিল,—এই জানো, আজ ব্যাংকে গিয়েছিলাম। আলোচনা করলাম ম্যানেজারের সঙ্গে।

সুরভি তখন রাতের আটা মাখছিল। সুবালার মা রান্নাটা করে রেখে যায়, সুরভি ফিরে রাতের ভাত রুটিটা করে। ভাত-রুটি গরম গরম না হলে মন্দার-ঝিমলি খেতে পারে না।

কাজ থামিয়ে উদগ্রীব প্রশ্ন করেছিল সুরভি,—ম্যানেজার কী বললেন? লোন পাওয়া যাবে তো?

—বললেন তো হয়ে যাবে। কিন্তু...

—কী কিন্তু?

—ওরা দেয় টেক-হোম পে'র ছত্রিশ গুণ। আমার তো কেটেকুটে হয় সওয়া নয়..... তার মানে তিন লাখ দশ বিশ হাজার মতো পাব। মন্দার চিন্তামাখা মুখে বলেছিল,—বুঝতেই পারছ, কিছুটা ডেফিসিট হয়ে যাবে।

—তোমার আমার মিলিয়ে জয়েন্ট লোন হয় না?

—বলেছিলাম। গাঁইগুঁই করছে। ...তোমার অফিসটা তো একেবারেই প্রাইভেট... বলছে আরও কিছু সিকিউরিটি লাগবে।

—তা ব্যাংক ছাড়া অন্য কোথাও থেকে চেষ্টা করা যায় না? এল আই সি টেল আই সি?

—ওদের তো আবার পলিসি করতে হবে।

—আমাদের তো আছে পলিসি।

—সে তো মাত্র আশি হাজারের। তার এগেন্‌স্টে কি সাড়ে তিন লাখ দেবে? এমনিই তো ব্যাংক বলছিল যে পলিসিটা আছে, সেটাও জমা রাখতে হবে।

—তাহলে?

—ভাবছি।...তিরিশ চল্লিশ হাজার শর্ট পড়ে যাওয়া কম কথা নয়।

—এক্ষুনি এক্ষুনি তো দিতে হচ্ছে না। এর মধ্যে যদি আরও কিছু জমাতে পারি...। সুরভি একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তেমন তাড়া থাকলে অন্য রাস্তাও আছে।

—কী রাস্তা?

—আমার গয়নাগুলো বেচে দেব। নয় নয় করে দশ বারো ভরি তো আছেই।

—যাহ্ তা হয় নাকি! মন্দার সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করতে চেয়েছিল,—ঝিমলির বিয়ে দিতে হবে না?

—আবার সেই ঝিমলির বিয়ের চিন্তা? সুরভি চোখ পাকিয়েছিল,—ঝিমলির বিয়ের না হোক এখনও এক যুগ দেরি। এর মধ্যে ঠিক আস্তে আস্তে সব গড়িয়ে ফেলব।

—পারবে? সওয়া তিন লাখ ধার নিলে মাসে মাসে কত কাটবে জানো? প্রায় সাড়ে তিন হাজার।

—কী এমন? ভাড়ার টাকাটা তো লাগবে না। বড় জোর হাজার দুয়েক খরচা বাড়বে। ওটা কোনও না কোনও ভাবে ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে, দেখো।

—তোমার নিজের বলতে কোনও গয়না কিন্তু আর থাকবে না।

—তো?... নয় পরব না গয়না। বিপদ আপদে কাজে না লাগলে গয়নার আর কী মূল্যটা আছে?

কী অবলীলায় যে কথাগুলো বলেছিল সুরভি। চিরকাল মন্দার শুনেছে মেয়েরা নাকি মরে গেলেও গয়না হাতছাড়া করতে চায় না। মন্দারের দিদির বিয়ের সময়ে জামাইবাবুদের বাড়ি থেকে সত্তর হাজার টাকা নগদ চেয়েছিল, খুবই সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন বাবা। শেষে ধারধোর করে বহু কষ্টে যোগাড় করেছিলেন টাকাটা। মা কিন্তু সে সময়ে নিজের গয়না বেচতে দেননি। দিদিকে যেটুকু দেওয়ার তা দিয়েছেন, বাকিটা সরিয়ে রেখেছিলেন আলাদা করে। মন্দারের বউদি বা সুরভিকেও গুনে গুনে দিয়েছেন গয়না। দাদা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে মাকে বলে, ওই গয়না নিয়ে তুমি স্বর্গে যেও...। মা শুনে হাসেন, আমি মরলে সবই তো তোদের। যতদিন আছি, ততদিন আমারটা আমার থাক।

মন্দারের মনে হয় মার কাছে গয়নাগুলো বুঝি এক ধরনের নিরাপত্তার প্রতীক। যদি স্বামী না থাকেন, যদি ছেলেরা না দেখে, ওই গয়নাই হয়তো তখন...। সুরভির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। নিজের একটা চাকরি আছে বলেই বুঝি অকাতরে সামান্য গয়না কটাকেও বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবতে পারে সুরভি। অথবা নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ার বাসনাটায় এমন একটা নেশা আছে যার কাছে গয়নাগাঁটি সব তুচ্ছ হয়ে যায়।

এই যে অফিস থেকে ফিরেই কাগজ কলম নিয়ে সুখী গৃহকোণের নক্শা আঁকতে বসে যাচ্ছে সুরভি, এটাও তো সেই নেশাই।

অন্যমনস্কভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে শার্ট-প্যান্ট বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল মন্দার। আনমনেই এসে বসল সোফায়। টিভি চালিয়েছে শব্দ কমিয়ে। সোফা থেকে ক্যাবিনেটের দূরত্ব খুবই কম, চোখে লাগে বলে বড় রঙিন টিভি কিনতে দেয়নি সুরভি, ছোট্ট চোদ্দ ইঞ্চি পর্দাটায় একের পর এক চ্যানেল ঘোরাচ্ছিল মন্দার। রিমোটে। একটা মজার হিন্দি সিরিয়ালে এসে থামল।

সুরভি চা ওমলেট এনেছে। টেবিলে কাপ প্লেটগুলো রেখে বসল পাশে। বলল,—কাল কিন্তু তোমায় একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। অফিসের পর আড্ডা মারতে যেও না।

মন্দার চামচে ওমলেট কাটল,—আমি বুঝি রোজ দেরি করে ফিরি? আজ তো সাতটার মধ্যে ইন্ করে গেলাম।

—কালও এসো। আমি একটু মার কাছে যাব।

—যেও।

—সুবলার মা কাল তাড়াতাড়ি চলে যাবে। তুমি না এলে ঝিমলি কিন্তু একা থাকবে।

—আহা, বললাম তো আসব।

সুরভি একটুক্ষণ চুপ। নিজের চা তুলে চুমুক দিচ্ছে। আলগা ভাবে বলল,—মাকে এবার একটা ভাল স্পেশালিস্ট দেখাতেই হবে।

—সেই হাঁটুর ব্যথার জন্যে?

—হাঁটু নয়। প্রায়ই বলে বুক ধড়ফড় করছে, রাতে নাকি ঘুম আসে না, সারাক্ষণ মাথা জ্বালা করে।

—প্রেশারটা চেক করাচ্ছেন নিয়মিত?

—বলে তো সপ্তাহে একদিন এসে দেখে যায়। কী করে কে জানে! মার নতুন কাজের মেয়েটাও তো ন্যাদোস টাইপ, নড়তে চড়তে পারে না। ওর ভরসায় মাকে ছেড়ে রাখতে যা টেনশান হয়।

—ছাড়িয়ে দাও। অন্য লোক রাখো।

—পেলে তো। একে যোগাড় করতেই আমার যা কালঘাম ছুটেছে। নিজের মতো করে দেখাশুনো করার লোক আজকাল আর পাওয়া যায় কোথায়?

—হুম্। মন্দার মাথা নাড়ল,—তোমার মা'ও কিন্তু যথেষ্ট অবুঝ। কিচ্ছু মানতে চান না।..... সেদিন তো আমি স্বচক্ষে দেখলাম, ভাতের পাতে কাঁচানুন খাচ্ছেন। আমি বোঝাতে গেলাম, আমাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন, কাজের লোক ওঁকে আর কী সামলাবে!

—সে কী আর করা যাবে। মা তো চিরদিনই এরকম। যা গোঁ ধরবে, তাই করবে। তার মধ্যে ধমকে-থমকে যতটা নিয়মে রাখা যায়...। কালও তো মাকে আমি ফোনে কত বকলাম।

—তা কোন স্পেশালিস্টকে দেখাবে? কার্ডিওলজিস্ট?

—দেখি। কাল সময় পেলে একবার ওপাড়ার ডক্টর দাসের সঙ্গে কথা বলে আসব। উনিই তো মাকে দেখেন... যদি উনিই কাউকে সাজেস্ট করে দ্যান।

মন্দার আর কিছু বলল না। চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে। হাসির সিরিয়ালটায় থেকে থেকে কোরাসে হাসির শব্দ বেজে উঠছে। অদৃশ্য হাসি। আর পর্দার কুশীলব অবিরাম ভাঁড়ামো করে চলেছে। লঘু মেজাজে সিরিয়ালে মন দিল মন্দার।

সুরভিরও চোখ রঙিন পরদায়। মজা গিলতে গিলতে জিজ্ঞেস করল,—এই তুমি লইয়ারের কাছে গেছিলে?

মন্দারের ঠিক মাথায় ঢুকল না প্রশ্নটা। পাল্টা জিজ্ঞেস করল,—কোন লইয়ার? কেন?

—বা রে, তুমিই তো বললে ব্যাংক ফ্ল্যাটের সাইট্‌টার সার্চ রিপোর্ট চায়? ব্যাংকেরই নাকি লইয়ারের প্যানেল আছে..!

—এখনই কী? সুব্রত নন্দী আগে পেপার টেপার দিক।

—দিয়ে দিলেই তো পারে। আমরা তো অ্যাডভান্স করেই দিয়েছি।

—দেবে। দেবে। আগে করপোরেশান থেকে প্ল্যান স্যাংশান করিয়ে আনুক। তারপর তো সার্চ... অ্যাসেসমেন্ট...। ওসবে বেশি সময় লাগে না, আমি খবর নিয়েছি। ভিতপুজোর আগে পেপারস্ পেলেই যথেষ্ট, ঝ্যাট ঝ্যাট সব প্যারাফারনেলিয়াগুলো সেরে ফেলব।

—কবে নাগাদ হবে বলো তো ভিতপুজো? আন্দাজ? পুজোর আগে হবে?

—কী করে বলব! পুজোর আগে হলে ভাল, নইলে পুজোর পরেই হবে। তাড়াহুড়ো করার কী আছে?

তাড়া আছে। সুরভি টানটান,—আজ অফিস যাওয়ার সময়ে দেখছিলাম অবিনাশবাবু তোমাদের ওই বিশু দালালের সঙ্গে কথা বলছে।

—তো?

—হঠাৎ বাড়ির দালালের সঙ্গে কথা বলবে কেন? নির্ঘাৎ কোনও মতলব ভাঁজছে। তুমি বড় মুখ করে বলে এসেছ বাড়ি ছাড়ছ, তাই হয়তো ভাড়াটে খোঁজা শুরু করে দিল।

—তুৎ, অন্য কোন কারণেও কথা বলতে পারে।

—কিন্তু যদি বলে...?

—বলুক। আমরা না ছাড়লে ভাড়াটে বসাবে কোথ্‌থেকে?

—কিচ্ছু বলা যায় না। লোক তো সুবিধের নয়, হয়তো আরও ডিসটার্ব করা শুরু করে দেবে। হয়তো যখন তখন লোক ডেকে এনে ঘর দেখাবে। বলবে, আপনারা তো চলেই যাচ্ছেন...

—ইল্লি রে। মামদোবাজি? অবিনাশ হালদার চাইলেই যাকে তাকে বাড়ি দেখতে দেব? ঘাড় ধরে বার করে দেব।

সুরভি তবু যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হলো না। ঈষৎ উদ্বিগ্ন গলায় বলল,—আমার একটা কথা শুনবে?

—কী কথা?

—সুব্রতবাবুকে বলে দিও, আমরা কিন্তু বাড়ি পুরো কম্‌প্লিট হওয়া অব্দি অপেক্ষা করতে পারব না। ঘরগুলো মোটামুটি তৈরি হয়ে গেলেই পজেশান নিয়ে নেব। টুকটাক কাজ যা বাকি থাকবে তা নয় পরেই হবে। ধীরে সুস্থে।

এটা তো মন্দারেরও মনের কথা। অবিনাশ হালদারের মতো একটা বিশ্রী আপদকে মাথায় নিয়ে কোন ভদ্রলোক আর বাস করতে চায়! তাছাড়া বাড়িভাড়া আর লোনের টাকা, একসঙ্গে ডবল্ খরচ মন্দার গুনবেই বা কেন!

ছয়

বর্ষাকাল এবার বেশ অনেকদিন ধরে চলল। আষাঢ়-শ্রাবণ পার করে সেই প্রায় ভাদ্রমাসের শেষ পর্যন্ত। মেঘেরা যেন ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিল আকাশে। আশ্বিনেও বৃষ্টি হচ্ছিল খুচখাচ। এক-দু'দিন আকাশ দিব্যি পরিষ্কার থাকে, গাঢ় নীলের মাঝে সাবানের ফেনা ভেসে বেড়ায় অলস মনে, তারপর হঠাৎই ফের ঝমঝম ঝমাঝম। একটা ছোটখাটো সাইক্লোনও হানা দিল আশ্বিনে। মাইথন ম্যাসাঞ্জোর পাঞ্চেৎ জলাধারের টইটুম্বুর দশা, ডি-ভি-সি জল প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। গোটা রাজ্য জুড়ে বেশ একটা 'বন্যা হয় বন্যা হয়' ভাব।

তা সেরকম কিছু হলো না অবশ্য। মোটামুটি নিরুপদ্রবেই কাটল পুজোটা। হাসি আনন্দে আলোয় প্যান্ডেলে, প্রতিমার বাহারে শহর জমজমাট। প্রতি বছরের মতোই জনস্রোতে ভাসল কলকাতা।

ত্রয়োদশীর দিন বউ-বাচ্চা নিয়ে ক্ষীরপাই গেল মন্দার। বিজয়া করতে। তাদের বাড়ি ঠিক ক্ষীরপাইতে নয়, ক্ষীরপাই থেকে মাইল চারেক ভেতরে। গ্রামটার নাম সোনামুড়ি, তবে লোকজনকে দেশের নাম বলার সময়ে ক্ষীরপাই বলাটাই মন্দারের অভ্যাস। প্রতি বছর পুজোর পর মন্দাররা একবার এখানে আসেই। যদি শারদভ্রমণে দূরে কোথাও যায় তো ফেরার পর, নইলে রওনা হওয়ার আগে। এ বছর বেড়ানো বাতিল, টাকা বাঁচানো চলছে, অতএব সোনামুড়িতেই রয়ে গেল সপ্তাহ খানেক। ঝিমলির ছুটির কটা দিন এবার নয় দেশগাঁয়েই কাটল।

সোনামুড়িতে কয়েকটা দিন কাটানোর বাসনাও মূলত ঝিমলির। তার চোখে কুলু মানালি বা কন্যাকুমারিকা কোডাইকানালের সঙ্গে সাংঘাতিক কিছু প্রভেদ নেই সোনামুড়ির। হোক না গ্রাম, বেড়ানোর জায়গা হিসেবে সোনামুড়ি মন্দ

কি! একটা সরু নদী আছে, ধানক্ষেত আছে, আমবাগান আছে, ছুটোছুটি করার মতো মাঠ তো আছেই। সবচেয়ে বড় কথা, জ্যাঠার তিন মেয়ের সঙ্গে তার পটে খুব। বিশেষ করে ছোট দুজন তো তাকে রীতিমতো সমীহই করে। ঝিমলির হাঁটাচলা, কথা বলার কায়দা, চুল কাটার স্টাইল, সবেতেই তারা একটা সিনেমা সিনেমা গন্ধ পায়। ঝিমলি তাদের চোখে মিনি হিরোইন, সর্বক্ষণ ঝিমলির গায়ে লেপটে থাকে দুই বোন। এত খাতির ঝিমলি আর কোথায় পাবে!

সুরভিও এখানে মোটামুটি মানিয়ে নিতে পারে। অদ্ভুত মানিয়ে নেওয়ার ভানটাতে সে খুব দড়। বড় জায়ের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে থাকছে, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে মাথায় আলগা কাপড় তুলছে, ভাসুরের প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি দেখাচ্ছে যথেষ্ট। মন্দারদের বাড়িটা দোতলা, কিন্তু মাটির। এই মাটকোঠার দালানেও সে একটা ইলাস্টিক হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে ঠোঁটে। আগে আগে স্যানিটারি পায়খানা ছিল না বলে সোনামুড়িতে তার একটু অসুবিধে হতো, ইদানীং সে সমস্যাও নেই। তাছাড়া নিজের পছন্দ অপছন্দর ধ্বজা উড়িয়ে কখনও শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিব্রত করতে চায় না সুরভি। সোনামুড়িতে বসবাসের কালটুকুকে সে'ও বেড়ানোর মতো করেই ভেবে নেয়।

যে সোনামুড়িতে একদমই টিকতে পারে না, সে হলো মন্দার। এখানে তার কত অজস্র শৈশবস্মৃতি, পুরোন বন্ধুবান্ধবও কম নেই, তবু এ গ্রাম্য জীবন তার কাছে এখন একেবারেই অসহনীয়। কলেজে পড়ার সময়ে সে গ্রাম ছেড়েছে, পড়ত কলকাতায়, থাকত বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেলে, শহর এখন তার শিরায়-উপশিরায় ঢুকে গেছে। কখনও কখনও মনে হয় সে সুরভির চেয়েও বেশি শহুরে। এখানে ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে ডাংগুলি, ফুটবল খেলত, কিম্বা যারা তার সহপাঠী ছিল, তাদের সঙ্গে দেখা হলে কথা খুঁজে পায় না মন্দার। মনে হয় এরা আর কেউ যেন তার স্তরে নেই। কেউ মুদিখানায় বসছে, কেউ বা ক্ষীরপাই-এ গিয়ে কাজ করছে কাঠের গোলায়, কেউ বা এখন পুরোদস্তুর চাষী। অবশ্য স্কুলমাস্টারি, সরকারি চাকরি করা বন্ধু এখানে আছে মন্দারের। ঘাটাল রাধানগরের কোল্ড স্টোরেজেও কাজ করে কেউ কেউ। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গই যেন আর উপভোগ করতে পারে না মন্দার। কী সব একঘেয়ে আলোচনা। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। কোথায় কোন পঞ্চায়েত প্রধান চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে, কোন গাঁয়ে কোন পার্টি কার ধোপা নাপিত বন্ধ করে দিল, সামনের লোকসভা নির্বাচনে এবার এ অঞ্চল থেকে কে জিতছে, এই সব। দীর্ঘকাল এখানে বাস না করার জন্য এদের সমস্যাগুলো মন্দার ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারে না। বরং গ্রামের তরুণদের তাও একটু চিনতে পারে। শচীন সৌরভ নিয়ে তাদের

তর্কাতর্কি শুনতে পায় চা-দোকানে। তবে এদের সঙ্গেও মন্দারের দূরত্ব অনেক। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের সঙ্গে ঢোকেই বা কী করে!

দিব্যেন্দু নাকি এখানে মাঝে মাঝে আসে গাড়ি নিয়ে। দিব্যেন্দুরা অবশ্য যথেষ্ট বড়লোক, গ্রামে পাকা দোতলা বাড়ি আছে। তবু মন্দারের ভাবতে অবাক লাগে, দিব্যেন্দু এখানে এসে থাকে কী করে? কলকাতায় যার অত বড় ফ্ল্যাট, কথায় কথায় কলকাতার এ ক্লাব ও ক্লাব ঘুরে বেড়ায়, বাড়িতে তিনখানা বিদেশী কুকুর পুষেছে, সে এখানে এসে কী সুখ পায়? এও কি দিব্যেন্দুর এক ধরনের বিলাসিতা?

ফ্ল্যাট কেনার কথাটা এখানে এসে বাবা-মাকে জানায়নি মন্দার। দাদা বউদিকেও না। কেন জানায়নি বলা কঠিন। দেশে সে আর ফিরবে না, সবাই জানে। এই মাটকোঠার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই, এও সকলের জানা। কলকাতায় একটা পাকাপাকি কিছু করে থিতু হওয়াটাই যে তার নিয়তি এটাও নিশ্চয়ই তারা অনুমান করতে পারে। মন্দার বাড়ি থেকে কোনও টাকাপয়সাও চাইবে না। চাইলে দিচ্ছেই বা কে? তবু সে বলতে পারেনি তার পিছনে বোধহয় অন্য একটা কারণ রয়ে গেছে। শহরের মানুষ পুরুষানুক্রমে ভাড়াবাড়িতে কাটায়, একসময়ে সেই মানুষদের কাছে বাড়িটা খাঁচার চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ওঠে, এখনকার অণু পরমাণু হয়ে ছিটকে ছিটকে যাওয়া সংসারে একটা একান্ত নিজস্ব আশ্রয়ের জন্য তীব্র আর্তি অনুভব করে তারা। কলকাতার বহু বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই আর্তিটা দেখেছে মন্দার। দেখতে দেখতে এই হাহাকারটা কখন যেন তার নিজের মজ্জাতেও ঢুকে পড়েছে, অজান্তেই। তার এই নাগরিক ছন্দটা বাবা মা দাদার চোখে ধরা পড়ে যাবে, বুঝি এই অস্বস্তিতেই ভুগছে মন্দার। সে এখন আর সোনামুড়ির মানুষ নয়, সে এখন একটা শহরের মানুষের চেয়েও বেশি শহুরে, এই উপলব্ধিটাও যেন তাকে অসহজ করে তুলেছে।

তবু কথাটা গোপন রইল না। ফাঁস করে দিল ঝিমলিই। সচেতন ভাবে নয়, কথায় কথায়।

অবশ্য তাকে গোপন রাখতে কেউ বলেওনি। না মন্দার, না সুরভি। মন্দার ভেবেছিল নিষেধ করলে তো ঝিমলি হাজার প্রশ্ন জুড়বে। কেন বলব না, বললে কী হয়, দাদু কি তোমার ওপর রাগ করবে...। সব প্রশ্নের কি প্রকৃত উত্তর দিতে পারবে মন্দার? আর সুরভি হয়তো চেয়েছে, উপযাচক হয়ে সে কেন বলতে যাবে, বরং মেয়ের মুখ দিয়ে যদি বেরিয়ে যায় সেটাই তো ভাল।

সোনামুড়িতে আসার পর থেকেই মুখে খই ফুটছিল ঝিমলির। আসার পরদিনই বিকেলে দিদিদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল ঝিমলি, বকম বকম করে শোনাচ্ছিল কলকাতার পুজোর গল্প।

—জানো তো, এবার আমি কতগুলো ঠাকুর দেখেছি? একশো সতেরোটা।

—এ-একশো সতেরো?

—হ্যাঁ গো। আরও বেশি দেখতে পারতাম। নবমীর দিন মা তো ঘুরতে ঘুরতে হাঁপিয়ে গেল।

—কোন ঠাকুরটা তোর সবচেয়ে ভাল লেগেছে রে? কাগজে দেখলাম একটা ভাঁড়ের প্যান্ডেল হয়েছে, ওই ঠাকুরটা?

—ওটাও ভাল। আরও অনেকগুলো ভাল ছিল। ঝিমলি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনাচ্ছিল, আমাদের বাড়ির কাছেই তো একটা প্রতিমা করেছিল। পুঁতি দিয়ে।

—কোন ক্লাবের ঠাকুর? টিভিতে দেখিয়েছিল?

—হ্যাঁ। চন্দনপুকুর। পার্ক আছে, ওইখানটায়।... জানো, সামনের বছর থেকে খুব মজা হবে। আমরা ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে ওদের পুজো দেখতে পাব।

টুলু বুলু কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। প্রশ্ন করেছিল,—সামনের বছর থেকে কেন?

—আমরা তো চন্দনপুকুর পার্কের ধারেই ফ্ল্যাট কিনছি। তিনতলায়। ঐ তিনতলা থেকে ঠাকুর দেখব।

ব্যস্, সংবাদ পৌঁছে গেল যথাস্থানে। রাত্রে খেতে বসে সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন ছোট ছেলেকে,—হ্যাঁ রে মণ্টু, তুই নাকি ফ্ল্যাট কিনছিস?

মন্দার সামান্য অপ্রতিভ,—হ্যাঁ... মানে... কত আর ভাড়া গুনি বলো? তাই ভাবলাম একটা কিছু করি...

—ভাল ভাল, খুব ভাল। তা ফ্ল্যাট-ট্ল্যাটে গেলি কেন, জমি কিনে বাড়ি করে ফেলতে পারতিস।

কৈলাশই ভায়ের হয়ে জবাব দিল,—না, না, মণ্টু ঠিকই করছে। ওরা দুজনেই চাকরি করে, বাড়ি করার হ্যাঙ্গামা কে পোয়াবে? বলেই ভায়ের দিকে ফিরেছে,—কীরকম সাইজ হচ্ছে তোদের ফ্ল্যাটের?

—খুব বড় নয়। ওই যেমন আজকাল হয় আর কি।

—কত? আটশো-নশো স্কোয়্যার ফিট?

—অত নয়। বেশি বড় কেনার পয়সা কোথায়?

—কত পড়ছে?

—তা পড়ছে। ভালই পড়ছে।

—কত? তিন চার লাখ?

—হ্যাঁ... মানে...। এবারও মন্দারের ভাসা ভাসা উত্তর,—ওই কাছাকাছি। ব্যাংক থেকে লোন করছি।

কৈলাশ যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ভায়ের অস্বাচ্ছন্দ্য সে টের পেয়ে গেছে। আর প্রশ্ন করল না, মন দিয়েছে খাওয়ায়।

মন্দারের একটু খারাপই লাগল। দাদা কি ভাবছে বাবা মাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে লাখ লাখ টাকা জমিয়ে ফেলেছে মন্দার? তাকে কি স্বার্থপর ভাবছে দাদা?

নিজেকে বোঝানোর মতো করে মন্দার বলল,—অনেকদিন ধরে চিন্তাটা মাথায় ঘুরছিল, জানিস। ভাড়াবাড়িতে থাকি, জায়গা নেই, তোরা গেলে কটা দিন থাকতে বলতে পারি না, বাবা মাকেও নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি না বেশিদিন... ওই তো একখানা ঘর, কোথায় কাকে শুতে দেব, বেশি লোক এসে গেলে বাড়িঅলাও জল-টল নিয়ে ঝামেলা করবে....

সুরভি লুফে নিয়েছে কথাটা। বলে উঠল,—এবার আমাদের দুখানা ঘর। খুব বড় না হলেও একটা হল আছে। আপনারা এবার গিয়ে আরাম করে থাকতে পারবেন।

সুরভির আশ্বাসবাণীগুলো তো সে নিজেই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল। তবু কথাগুলো এমন ফাঁপা ঠেকল কেন? দাদা বাবার কথা না ভেবে শুধু নিজেদের জন্য ভাবনাটা কি একটু স্বার্থপরতা হয়ে গেছে?

ধুস্, কী ভাবে কী করছে সে তো মন্দারই জানে। ওইটুকু আত্মচিন্তা না করলে তারও যে অস্বস্তি বিপন্ন হয়ে যায়।

নাহ্, এ কথাটা কাউকে বোঝানো যায় না। কোনও কোনও মুহূর্তে নিজেকেও নয়।

সাত

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে একটা ধাক্কা খেল মন্দার। আচমকাই।

সেদিন মন্দার একটু দেরি করে বিছানা ছেড়েছে। আগের দিন অনেক রাত অবধি জেগে ক্রিকেটম্যাচ দেখেছিল টিভিতে, ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়েছে একটু। অফিসের দিন, হুটোপুটি করে বাথরুমে ছুটল, বেরিয়েই বাজার যাবে, তখনই সুরভির চিৎকার,—এই এই দ্যাখো, কাগজে কী বেরিয়েছে।

—কী বেরিয়েছে? দাঁত মাজতে মাজতে গলা ওঠাল মন্দার।

—কী একটা মামলা হয়েছে!.....এসো না দ্যাখো না।

ডাকটায় কেমন যেন বিপদের গন্ধ পেল মন্দার। মুখে ব্রাশ নিয়ে হুমড়ি খেল কাগজে। হ্যাঁ সত্যি তো, খবরটা তো বিটকেল। কাগজের তৃতীয় পাতার বাঁ দিকের কলমে ছোট হেডিং-এর নিউজ—করপোরেশানে জমা পড়া প্ল্যানে হাইকোর্টের

ইনজাংশান! বিশদ সংবাদ নেই তেমন, শুধু লিখেছে হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি নামের এক প্রোমোটার করপোরেশানের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছিল, তারই প্রার্থনা মতো অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে হাইকোর্ট। ওই আদেশের বলে করপোরেশানে জমা পড়া সমস্ত বাড়ির প্ল্যানই আপাতত আটকা হয়ে থাকবে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দুজনে।

—কী হলো ব্যাপারটা?

আমিও তো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ চোখে পড়ল। এমন হয় নাকি? যারা কেসের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের প্ল্যান আটকে থাকবে কেন?

—বটেই তো। ঠিক তো।

—যাও না, এক্ষুণি একবার সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসো। ব্যাপারটা বুঝে এসো ভাল করে।

বাজার অফিস ডকে উঠল। পড়িমরি করে ছুটেছে মন্দার।

সুব্রত নন্দীর অফিস তখনও খোলেনি। কাছেই সুব্রতর বাড়ি, ঈষৎ দোনামোনা করে মন্দার সেখানেই গেল।

সুব্রতর বাড়িটার চেকনাই আছে খুব। দোতলা, ছোট্ট, কিন্তু ভারী দেখনবাহার। কারুকাজ করা থাম, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, শ্বেতপাথরের মেঝে, বাহারী দরজা জানলা, প্রায় সব ঘরেই এসি মেশিন বসানো। এই বাড়িতেই একটা সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরে সুব্রতকে টাকা দিয়ে গিয়েছিল মন্দার। ভুরভুরে গন্ধঅলা কফি খাইয়েছিল সুব্রত, স্বাদটা মন্দারের জিভে লেগে আছে।

গেটের বাইরে মন্দার থমকে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। ঢেউতোলা গেটে তামার প্লেটে—বিওয়্যার অফ ডগ্‌স। আগের দিন কেন যেন মন্দারের চোখে পড়েনি লেখাটা। তখন একটা সুখের উত্তেজনায় ছিল বলে কি?

মন্দার বুকের ধুকপুকুনিটা সইয়ে নিচ্ছিল। তখনই চোখে পড়ল আর একজন মধ্যবয়সী এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। মন্দারের চেয়ে কিছুটা বড় হবে, বয়স বছর পঞ্চাশ। বেঁটে, মাথায় টাক, পরনে লুঙ্গি পাঞ্জাবি। মুখটা চেনা চেনা। বাজারে টাজারে দেখেছে মনে হয়।

গলা ঝেড়ে মন্দার প্রশ্ন করল,—আপনিও কি নন্দীবাবুর কাছে?

—হ্যাঁ। কাগজে একটা খবর দেখলাম...

—প্ল্যানের ব্যাপারে?

লোকটা ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

সামান্য স্বস্তি বোধ করল মন্দার। যাক, সে একা নয়। তার মতো উদ্বিগ্ন লোক

পৃথিবীতে আরও আছে।

গেটের পরেই ছোট্ট একটু বাগান। গাঁদা ফুটে আছে। চন্দ্রমল্লিকাও ফুটব ফুটব। বাগান পেরিয়ে কলিংবেল টিপতেই অন্দর থেকে গর্জন ঝাপটে এল, ঘ্রাঁউ! ঘ্রাঁউ!

দুজনেই পিছিয়ে এল কয়েক পা। পরক্ষণেই সুব্রত দরজা খুলেছে। সামান্য ফাঁক করে দেখে নিল আগন্তুকদের, তারপর বেরিয়ে এসে টেনে দিয়েছে দরজাটা। পরনে ছাইরঙা নাইটসুট, চোখ মুখ ফোলা ফোলা। সবে বোধহয় ঘুম থেকে উঠেছে।

চোয়াল ছড়িয়ে হাসল সুব্রত,—আরে, কী খবর? সক্কাল সক্কাল আপনারা...?

ভদ্রলোক হাত কচলাল,—একটা নিউজ পড়লাম কাগজে...

—কী বলুন তো?

মন্দার বলল,—করপোরেশানে সব প্ল্যানের ফাইল নাকি...?

—ও কিছু নয়। ছোট্ট হাই তুলল সুব্রত,—মিটে যাবে।

সমস্যাটাকে সুব্রত পাত্তা দিল না বলে খুশিই হলো মন্দার। তার মানে সত্যি তেমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। তবু আরও নিশ্চিন্ত হতে জিজ্ঞেস করল,—কেসটা ঠিক কী নিয়ে হয়েছে বলুন তো?

—বললাম তো কিছু না। ডোন্ট্ ওরি। জানেন তো করপোরেশানের হাল,—ব্যাটারা সব সময়ে আমাদের হ্যারাস করার চেষ্টা করে। ... ওই ভদ্রলোক, মানে হরেনদা প্রকাণ্ড একটা প্রোজেক্ট করছে বাইপাস কানেক্টারে। আটখানা বিল্ডিং, কমিউনিটি হল, চিলড্রেনস্ পার্ক... কোটি টাকার কাজ। করপোরেশান হরেনদার প্ল্যানটাকে নিয়ে নকড়া ছকড়া করছিল, দিয়েছেন হরেনদা মামলা ঠুকে। নে, এবার বোঝ ঠেলা, দ্যাখ্ কার সঙ্গে লাগতে এসেছিস!

ভদ্রলোক পাশ থেকে মিনমিন করে বলল,—কিন্তু আমাদের কাজগুলোও পিছিয়ে গেল তো?

—যাক না। তবু একটা ফয়সালা তো হোক। করপোরেশানের এই অত্যাচারগুলো তো বন্ধ হওয়া দরকার, তাই না?... হরেনদা কেসটা জিতলে আপনাদেরও অনেক লাভ হবে। এখন করপোরেশানের নিয়মে আমাদের প্রায় অর্ধেকটা জমি ছেড়ে দিতে হচ্ছে, সেই বাদ দেওয়া জমির দামটাও তো আপনাদের ঘাড়েই চেপে যাচ্ছে। আমরা যদি এফ-এ-আর বেশি পাই, আপনাদের ফ্ল্যাটগুলোও বড় হবে, দামও কম পড়বে।

—তাই নাকি? তাহলে তো ভালই হয়। মেঘ কেটে গিয়ে মন্দারের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে,—তার মানে আমরাও তাহলে এফেক্টটা পাচ্ছি।

—ফয়সালা ফেভারে এলে নিশ্চয়ই পাবেন। করপোরেশানকে আইন অ্যামেন্ড

করতে হবে। সুব্রত বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাসল,—যান যান, নিশ্চিন্তে বাড়িতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন। মামলা মিটলেই আপনাদের কাজ স্টার্ট করে দেব।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল,—পয়লা বৈশাখের মধ্যে হবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, না হওয়ার কী আছে। সুব্রতর হাসিতে ধূর্ততা এসেছে এবার। চোখ টিপে বলল,—প্ল্যান আটকে থাকলে তো করপোরেশানেরই লস্। বাবুদের পেটে হাত পড়ে যাবে না?... আমাদেরও ইন্টারেস্ট আছে। এই তো; আমারই কতগুলো কাজ আটকে গেল। ভেবেছিলাম আপনাদেরটা শেষ করেই লেক গার্ডেন্সের প্রোজেক্টে হাত দেব। ওদিকে গড়িয়াতেও একটা কথা চলছে... দেরি হলে তো আমাদেরও ব্যবসা চৌপাট।

চিন্তামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল মন্দার। সব শুনে সুরভির মুখেও হাসি ফুটেছে,—একদিক দিয়ে ভালই হলো, বলো? আমরাও এর মধ্যে আরও কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পারব।

সুব্রত বলল,—হ্যাঁ, তুমিও আরও সময় পেলে। এখন আরও কিছুদিন প্রাণ ভরে ফ্ল্যাটের ছবি আঁকো।

আট

শীত গিয়ে বসন্ত এল। চলেও গেল। একে একে পেরিয়ে গেল গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ। মন্দার আর সুরভির ফ্ল্যাটের প্ল্যান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে। এখনও মামলার কোনও মীমাংসা হলো না।

রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলেই প্রথমে আইন আদালতের পাতা দেখে মন্দার সুরভি। আশ্চর্য, প্রতিদিন কত মামলার রায় বেরোয়, ধর্ষণের, খুনের, ডাকাতির, বধূনির্যাতনের... কিন্তু বাড়ির মামলার রায় কোথ্থাও নেই। এই পৃথিবীর কোন এক কোণে, কোন অকিঞ্চিৎকর সুরভি-মন্দারের একটা স্বপ্ন থমকে গেছে তা নিয়ে কারুরই মাথাব্যথা নেই দুনিয়ায়।

আজকাল প্রায় প্রতি রবিবারেই সুব্রত নন্দীর অফিসে ছোটে মন্দার। এটাও এখন মন্দারের একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাভ কিছুই হয় না, শুধু গিয়ে শুকনো মুখে বসে থাকা। সুব্রত নন্দীরও আগের হাসিটা আর নেই, ইদানীং তাকেও বড্ড গম্ভীর দেখায়। মন্দার তাকে বেশি প্রশ্ন করার সাহস পায় না। মন্দারের যদি টাকা আটকে থাকে হাজারে, তো সুব্রতর আছে লাখে। বিপন্ন মানুষকে আরও বিব্রত করা কি মন্দারের মতো ভদ্রলোকের শোভা পায়?

মন্দার অফিসে অনেক আলোচনা করেছে মামলাটা নিয়ে। একেক জন একেক

মন্তব্য করে, শুনে যায় মন্দার। একদিন বীরেন সরকার বলল, বাড়ি-টাড়ি করতে পারার সঙ্গে ভাগ্যের নাকি একটা যোগাযোগ থাকে, প্রোমোটারকে টাকা দেওয়ার আগে মন্দারের তিথি-নক্ষত্র বিচার করে নেওয়া উচিত ছিল। জয়ন্ত ব্যানার্জি একদিন পরামর্শ দিল গোমেদ বা পোখরাজ ধারণ করতে,—ওতে নাকি গৃহসমস্যার চটজলদি সমাধান হয়ে যায়। পাথরচাপা কপাল নাকি পাথরেই খুলবে! সুভাষ মিত্রর মন্তব্য, এ মামলা হলো গিয়ে করপোরেশান আর প্রোমোটারদের দর কষাকষির মামলা, দেনাপাওনার একটা মনোমতো ব্যবস্থা হলেই এ মামলার নাকি আপোসে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে। তেমন কিছু হলেও হয়ে যাক না, হচ্ছে কই?

মাঝখান থেকে মন্দারদের দিনগুলো একেবারে ফালতু ফালতু চলে গেল। সুরভি ভেবেছিল এই সময়টায় কিছু টাকা জমে যাবে। হা হতোস্মি, একটি পয়সাও জমানো গেল না, উল্টে বেরিয়ে গেল হাত থেকে।

কতদিক থেকে যে খরচ বাড়ে সংসারের। শীতের শেষে দুম করে একদিন বাথরুমে আছাড় খেয়ে পড়লেন সুরভির মা। বেশ খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলেন, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুরভি। সেরিব্রাল অ্যাটাক? ভাল নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলো সুপ্রভাকে, স্ক্যান-ট্যান হলো জলদি জলদি। খারাপ কিছু পাওয়া গেল না বটে, তবে জলের মতো টাকা তো বেরিয়ে গেল।

আরও আছে। হঠাৎ করে শ্রাবণে বিয়ের ঠিক হলো মিলুর। মন্দারের বড় ভাইঝির। ফ্ল্যাট বুক করেছি, টাকা জমাতে হবে, এই অজুহাতে তো হাত উল্টে দেওয়া যায় না। আবার নেই বলারও মুখ নেই। বড় মুখ করে ফ্ল্যাট কিনছি বলে আসার পর হাত উল্টোনো শোভাও পায় না। সঞ্চয়ের ভাঁড়ার শূন্য বললেও লোকে অন্য মানে করতে পারে। অতএব, উপায় প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে লোন। মন্দারের মাইনে থেকে এখন মাসে মাসে ছশো টাকা করে কাটা চলছে। ঝিমলি এইটে ওঠার পর দুটো টিউটর রাখতেই হলো। তারাও প্রতি মাসে নিয়ে যাচ্ছে হাজার মতো। নিজেদের ঘর বানাতে গিয়ে মেয়ের ভবিষ্যতটাকে তো আর অন্ধকার করে দেওয়া যায় না।

সুরভি মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে,—আমাদের কপালটাই খারাপ। সাধ আর সাধ্যের ফারাক সামলাতে সামলাতেই জীবনটা কাটল।

মন্দার বলে,—যা বলেছ। ভাবি এক, হয় আর এক। অ্যাদ্দিনে তো নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে যাওয়ার কথা। তা নয়, এখনও সেই ভাড়াবাড়িতে পচছি।

—অবিনাশগিন্নি তো খুব হাসাহাসি করছে। পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে আমরা নাকি ফ্ল্যাট ট্ল্যাট কিছুই বুক করিনি। সব ভাঁওতা। আমরা নাকি চাল মেরেছি।

—উপায় কী। হাতি যখন পাঁকে পড়েছে, চামচিকের লাথি খেতেই হবে।

—মাঝখান থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা লোকটার গব্বায় ঢুকে বসে রইল। কত কষ্টের টাকা।... আমাদের অফিসের রিনাদি তো বলে, দ্যাখ ও বাড়ি হয়তো আর হবেই না। তোরা বরং ও টাকা তুলে নিয়ে অন্য কোথাও চেষ্টা কর।

—বলছ? নেব তুলে?

—থাক। আর ক'দিন দেখি।

তা এই ক'দিন করেই গড়িয়ে যায় সময়। একই ভাবে। ওঠানামা নেই। নিস্তরঙ্গ। একমাত্র যা বেড়ে চলে, তা হলো মন্দার-সুরভির দুশ্চিন্তা। মন্দারের ঘুম পাতলা হয়ে গেছে, সারা রাত ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখে মন্দার। স্বপ্নও নয়, এলোমেলো কিছু ছবি। হতাশার। তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে টের পায় সুরভিও। এপাশ-ওপাশ করছে চার হাত দূরের বিছানায়।

অফিস থেকে ফেরার পথে মন্দার এক একদিন চন্দনপুকুর পার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে জীর্ণ বাড়িটার দিকে, নেশাচ্ছন্নের মতো। চতুর্দিকে প্রচুর ফ্ল্যাট উঠেছে, রঙচঙে সব বাড়িগুলোর মাঝে ভাঙাচোরা প্রাচীন ওই বাড়িখানা কী বিশ্রী রকমের বেমানান। ন্যুব্জ, ভিখিরির মতো দশা। তবু কখনও কখনও বড় দাম্ভিক মনে হয় বাড়িটাকে।

মন্দারকে দেখে বাড়িটা যেন হেসে ওঠে খলখল। দাঁত বার করা মুখে ভেংচি কাটে,—শখের বলিহারি যাই! ভাঙবি আমায়, অ্যাঁ? দখল নিবি?

রাগে গা পিত্তি জ্বলে যায় মন্দারের। ফস করে সিগারেট ধরায় প্রবীণার মুখের ওপর। চোয়াল শক্ত করে বলে,—নেবই তো। মামলায় জিতে গেলেই নেব। রায় বেরোলেই নেব। ওটা এখন আমার জায়গা।

নিজের কানেই কেমন শূন্যগর্ভ শোনায় কথাগুলো।

নয়

অবশেষে রায় বেরোল।

মন্দার নয়, সুরভিও নয়, ঝিমলির চোখে পড়েছে খবরটা।

শীতের সকাল। মন্দার বাজার থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছিল। লেপ ছেড়ে উঠতে দেরি হয়েছে আজ, পৌনে নটা বেজে গেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে অফিস বেরোতে না পারলে লাল ট্যাঁড়া পড়ে যাবে। সুরভিরও একই হাল। চুল না ভিজিয়ে কোনোক্রমে গায়ে গরম জল ঢেলে এসে মেয়ের টিফিন গুছিয়ে দিচ্ছিল চটপট।

তখনই ঝিমলির ডাক। বাবা-মার দেখাদেখি তারও আজকাল আইন-আদালতে চোখ বোলানোর অভ্যেস হয়েছে। মন্দার-সুরভির উদ্বেগ বুঝি চারিয়েছে তার মধ্যেও। খবরের কাগজের তৃতীয় পাতায় চোখ রেখে স্কুল ইউনিফর্ম পরা ঝিমলি চেঁচিয়ে উঠল,—বাবা... বাবা... দেখে যাও, তোমাদের সেই কেসটার নিউজ বেরিয়েছে!

একসঙ্গে ঝেঁপে এল স্বামী-স্ত্রী। একবার পড়ে মন্দারের বিশ্বাস হলো না। আবার পড়ল, আবার পড়ল, বার বার পড়ছে। তাই তো! তাই তো! এ খবর কী করে চোখ থেকে এড়িয়ে গেল?

সুরভি কেড়ে নিয়েছে কাগজটা। চোখ কুঁচকে পড়ছে ভাল করে। বলল,—অ্যাই, কী সব লিখেছে গো? বলছে, নিয়মকানুন সব বদলে গেছে?

—দেখছি তো তাই। আবার মনে হয় নতুন করে প্ল্যান জমা দিতে হবে প্রোমোটারদের।

—তার মানে আবার দেরি?

—তুৎ, আর দেরি হবে না। প্ল্যান বানাতে আর ক'দিন। সুব্রত নন্দীর ভাল হোল্ড আছে, ঝটপট পাস করিয়ে আনবে।

—তার মানে আর আগের মতো থাকবে না?

—না থাকলেই বা কী? একটা তো হবে। নতুন ধরনের হবে। হয়তো দেখলে এ প্ল্যানটা আরও বেটার হলো।

ঝিমলি বাবা-মার খুশি লক্ষ্য করছিল। ফিক করে হেসে বলল,—ভালই তো মা। তুমি নতুন করে আরও অনেক ছবি আঁকতে পারবে।

মন্দারও ঠোঁট টিপল,—কাগজ আছে বাড়িতে আর? না এনে দেব?

—ঠাট্টা রাখো। অফিস যাওয়ার পথে একবার সুব্রতবাবুর অফিস ঘুরে যেও।

—এখন কী করে হবে? বিকেলে যাব। ফেরার পথে।

খুশিটাকে সঙ্গে নিয়েই তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। হুটোপুটি করে। ঝিমলি এখন অনেক সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাকে আর স্কুলে পৌঁছে দিতে হয় না, সে নাচতে নাচতে নিজের রাস্তায় চলে গেল। মন্দার-সুরভিও সোজা বাসস্ট্যান্ড।

অফিসে আজ তিনটা ভারী মধুর কাটল মন্দারের। জনে জনে শোনাচ্ছে আজকের সমাচারটা। আলোচনা করছে। দুঃখের খবর তাও নিজের মধ্যে চেপে রাখা যায়, সুসংবাদ একা একা উপভোগ করা বেজায় কঠিন কাজ।

অফিসের কেউ কেউ নজর করেছে খবরটা। বীরেন সরকার তো নিজের চেয়ারে বসার আগেই মন্দারের টেবিল ঘুরে গেল,—যাক, ফাঁড়া তাহলে কাটল!

—হুম্।

—কালীঘাটে আজই একটা পুজো চড়িয়ে দেবেন মশাই।

তথাগত এসে বলে গেল,—এবার কিন্তু তোকে খুব ছুটোছুটি করতে হবে। পারলে কালই ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে আবার কথা বলে আয়।

মন্দার হেসে বলল,—দাঁড়া, আগে কাগজপত্র সব হাতে পাই।

—আরে দূর, বড় গিঁটটা তো খুলে গেছে, তোর আর ভাবনা কী!

—তা ঠিক। তবু প্রমোটারের সঙ্গে আগে গিয়ে একবার কথা তো বলি।

—আজই চলে যা। দেরি করিস না।

দেরি করতে কি মন্দারও চাইছে? অফিস ছুটির পর কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল আজ। আগেও বেরোতে পারত, তবে সন্ধে না হলে সুব্রতকে কি অফিসে পাওয়া যাবে? তেমন হলে নয় বাড়িতেই যাবে মন্দার।

শীতের বেলা। বিকেল ফুরোলেই ঝুপ করে আঁধার নেমে আসে। খুচরো-খাচরা জ্যাম পেরিয়ে মন্দার যখন পাড়ায় পৌঁছল, সন্ধে তখন রীতিমতো গাঢ়।

সুব্রত অফিসেই ছিল। একাই। পুরোপুরি একা নয়, সঙ্গে দুই অ্যালসেশিয়ান পাশে রয়েছে। অফিসে এলে বাড়ি থেকে কুকুর দুটোকে নিয়ে আসে সুব্রত।

মন্দারকে দেখেই সুব্রত সহাস্য আপ্যায়ন,—আরে, আসুন আসুন। এত দেরি যে? সব্বাই তো সকালে ঘুরে গেল।

—না... মানে... সকালেই তাড়াহুড়োয় ছিলাম..। মন্দার লজ্জা লজ্জা মুখে হাসল।

—এই তো, মুখের রঙ পাল্টেছে। আরে মশাই, আমিও কি চাই আপনাদের দেরি হোক। বলতে বলতে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সুব্রত,—নিন, আজ আমার ব্র্যান্ড খান।

মন্দার সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তৃপ্ত মুখে বলল,—কাজ শুরু হতে তাহলে আর কত দিন?

—ম্যাক্সিমাম এক দেড় মাস। আজই তো আর্কিটেক্টকে ধরিয়ে দিয়েছি। সুব্রত লম্বা টান দিল সিগারেটে,—তবে এফ-এ-আর তেমন বাড়ল না মশাই। হরেদরে প্রায় একই রইল।

—তাই?

—হ্যাঁ। পেছনের দশ ফুট সেই ছাড়তেই হবে। দু'দিকে চার চার, সামনে ছয়।

—ও।

—দু'একটা মাইনর অ্যাডভান্টেজ দিয়েছে, তবে সে বলার মতো কিছু নয়।

—তার মানে আমাদের ফ্ল্যাট একই সাইজ রইল?

—অল মোস্ট। ওই বড় জোর পাঁচ দশ স্কোয়ার ফিটের হেরফের হতে পারে।

সুব্রত হেলান দিল ঘুরনচেয়ারে,—ওফ্, যা খেঁচাকলটা যে গেল। বিজনেস বসে গেছে, পারমানেন্ট স্টাফদের শুধু মুখ দেখে মাইনে দিতে হচ্ছে...

মন্দার বলল,—আমারও তো মশাই খুব বুরা হাল। বাড়িঅলা তো লাইফ হেল্ করে দিচ্ছে। ভাড়াবাড়িতে মানুষকে এমন মাথা নিচু করে থাকতে হয়।

—বাড়িঅলারাই বা কী করবে বলুন? সুব্রতর স্বরে হঠাৎ বিশ্বজ্ঞানী ভাব,—যা দিনকাল পড়ল। জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই দেখুন না, দেড় বছরে ইঁট লোহার দাম কোথ্থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। হাজারে প্রায় ছশো টাকা দাম বেড়েছে ইঁটের। সিমেন্ট বস্তা পিছু আঠেরো টাকা।

—হুঁ। মন্দার মাথা দোলাল,—টোমাটোর দামই এ বছর দশ টাকার নিচে নামল না।

—তাহলেই বুঝুন। চেপে চেপে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাচ্ছে সুব্রত,—একে এই দেড় বছরের লস, তার ওপর ওই ইন্ফ্লেশানের প্রেশার... আমিও কি আর আপনাদের আগের দামে ফ্ল্যাট দিতে পারব?

মন্দার কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বলল,—মানে?

—মানে... সামান্য কিছু এস্ক্যালেশান তো করতেই হবে মশাই। হাজারের নিচে আর পারব বলে মনে হয় না।

—হাজার টাকা স্কোয়্যার ফিট?

—বেশি বলিনি। বিশ্বাস না হয়, খবর নিয়ে দেখুন এখন এ অঞ্চলে কী রেট চলছে। তবে হ্যাঁ, আপনাদের কথা আলাদা। আপনারা অ্যাদ্দিন ধরে আমায় অ্যাডভান্স দিয়ে রেখেছেন, তাছাড়া বউদিকেও আমি কথা দিয়েছিলাম... শুধু বউদির জন্যই নয় আপনাদের রেট পঁচিশ টাকা কম থাকবে।

অর্থাৎ নশো পঁচাত্তর করে! স্কোয়্যার ফিটে একশো পঁচিশ টাকা বাড়বে? তার মানে মোট বাড়বে প্রায় এক লাখ। ব্যাংক থেকে তো কিছুতেই সাড়ে তিনের বেশি পাওয়া যাবে না, বাকি চার লাখ আসবে কোথ্থেকে? না না, তিন লাখ পঁয়ত্রিশ। পঁয়ষট্টি তো দেওয়া আছে। তবু অত টাকা...?

সুব্রত কাগজে-কলমে কী যেন হিসেব করছে দ্রুত। কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—মোটামুটি ভাবে আপনার পড়বে সাত লাখ প্লাস। আপনাদের জন্য আমি আরও কম করব। পুরো সাত লাখই দেবেন।

মন্দারের গলা শুকিয়ে আসছিল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—এরপর তো রেজিস্ট্রেশান ফি আছে।

—ওটা আর কত পড়বে? আপনার সঙ্গে তো কথাই হয়েছিল সিক্সটি ফরটিতে কাজ করব। সিক্সটি হোয়াইট, ফরটি ব্ল্যাক। তার মানে রেজিস্ট্রেশানে পড়বে

আপনার মাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ওই ধরুন, সব মিলিয়ে সাড়ে সাত লাখ।

হ্যাঁ, কথা ওইরকমই খানিকটা হয়েছিল বটে। ছ'লাখ দশ পনেরো মতন দাম পড়ার কথা ছিল। বলেছিল সাদায় দাম দেখাবে তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার। রেজিস্ট্রি মিলিয়ে সাড়ে ছয়ের মধ্যে তখন অবশ্যই কুলিয়ে যেত। ব্যাংক থেকে সাড়ে তিন, বাকি তিন মন্দার-সুরভি ভাগাভাগি করে। পঁয়ষট্টি তো দেওয়াই আছে, বাকি ছিল দুই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। সুরভির গয়না বেচে হাজার তিরিশ-পঁয়ত্রিশ, সুরভি অফিসে পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্সের কথা বলে রেখেছিল, বাকি টাকা কিছু যোগাড় করত, ফেজে ফেজে টাকা দেওয়ার সময়ে কিছুটা জমে যেত, দরকার হলে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার নিয়ে নিত—এভাবেই মোটামুটি হিসেবটাকে ছকে রেখেছিল মন্দার। কিন্তু এ তো কিচ্ছু মিলছে না এখন! ওই টাকাটা জোটাতেই কালঘাম ছুটে যেত, তার ওপর আরও এক লাখ...?

মন্দার প্রায় আর্তনাদ করে উঠল,—পারব না মশাই।

—কী পারবেন না?

—এত টাকা কোথায় পাব?

—কত শর্ট পড়ছে?

—অনেক। অনেক। অন্তত লাখ খানেক।

—কেন, ব্যাংক লোন নিচ্ছেন না?

—আরে মশাই, সব হিসেব করেই বলছি তো!

—অ। সুব্রত ডানদিকের অ্যালসেশিয়ানটার মাথায় আলগা হাত বুলিয়ে নিল,—তা এক লাখ আর কী এমন? আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। ইন্টারেস্ট বেশি নেব না। এমনিতে আমার রেট মাস্থলি আড়াই পারসেন্ট, একেবারে সাহেবদের রেট, ওই ক্রেডিট কার্ড ফার্ডে যা চলে আর কি। তবে আপনার আর বউদির জন্য আমার কনসেশনাল রেট। টু পারসেন্ট পার মান্থ।

অর্থাৎ মাসে দু'হাজার। সঙ্গে মূল শোধ করাও আছে। তার ওপর ব্যাংক লোন, পি এফ লোন, এবং সুরভির ধার। মন্দারকে তো উলঙ্গ হয়ে ঘুরতে হবে রাস্তায়। সুরভিকে বেরিয়ে পড়তে হবে বাটি নিয়ে।

মন্দার কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো এরকম কথা ছিল না সুব্রতবাবু। আপনি বলেছিলেন, আপনি অন্য প্রোমোটারদের মতো নন, এস্কালেশান করবেন না।

—আরে মশাই, কথা তো অনেক কিছুই ছিল না। সুব্রত নির্বিকার,—এই যে আমার প্রোজেক্টটা দেড় বছর পিছিয়ে গেল, ফর নাথিং...

—তার জন্য কে দায়ী? আমরা?

—কেউই দায়ী নন মন্দারবাবু। দায়ী আমাদের কপাল। আমার আপনার...।

সুব্রত মুচকি মুচকি হাসছে,—আজই তো সকাল থেকে কতজন এসে ঘুরে গেল। আপনাদের ওই তিনতলার ফ্ল্যাটটার জন্য কী ঝুলোঝুলি, টাকার থলি নিয়ে ঘুরছে, হাজার করে দেবে বলে পা বাড়িয়ে আছে। স্রেফ আপনার আর বউদির কথা ভেবেই আমি রাজী হইনি। আমি তো আমার প্রোপোজাল দিয়ে দিলাম, এবার আপনারা ভাবুন আপনারা কী করবেন।

—দেখি। ভাবি।

—দেরি করবেন না। সুব্রতর হাসি চওড়া হলো,—শুভস্য শীঘ্রম। অশুভস্য কালহরণং। হা হা হা। জয় মা বলে নেমে পড়ুন, আমি তো পাশে আছি।

হাসিটা দেখে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল মন্দারের। ইচ্ছে করছে লোকটার মুখে টেনে একটা ঘুষি চালিয়ে দিতে। কলার চেপে ধরতে লোকটার। আগাম টাকা হজম করে এখন মামদোবাজি।

কিছুই করতে পারল না মন্দার। অবসন্ন পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নিস্তেজ গলায় বলল,—চলি।

দশ

সুরভি পুরোপুরি গুম মেরে গেছে। বাড়িও এখন অস্বাভাবিক রকমের থমথমে। ঝিমলি পর্যন্ত কোনও শব্দ করছে না, বই মুখে খাটে বসে আছে চুপচাপ। দেখেই বোঝা যায়, পড়ছে না ঝিমলি, তার বিষণ্ণ চোখ স্থির হয়ে আছে অক্ষরে। মন্দার সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে। হাতের পিঠে ঢেকে রেখেছে চোখ।

নীরবে রাতের রুটি বানাল সুরভি। নীরবে নৈশভোজ সারল তিনজনে। খেতে বসেছে, ঝিমলির একটা ফোন এল। বান্ধবীর। অন্য দিন ফোন এলে ঝিমলি ছাড়তেই চায় না, ধমকে ফোনালাপ বন্ধ করতে হয় মেয়ের। আজ দু'চারটে কথা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল ঝিমলি। রুটিন করে রোজ রাত্রে একবার সুপ্রভার খবর নেয় সুরভি, আজ যেন ভুলেই গেল। খেয়ে উঠে যন্ত্রের মতো শোওয়ার ঘরে দুটো মশারি টাঙিয়ে দিল, ঝিমলিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মা মেয়ে লেপের তলায় ঢুকে আরও গাঢ় করে দিল নৈঃশব্দ্যকে।

রাত বাড়ছিল। মন্দারের শুতে ইচ্ছে করছিল না। শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, কিন্তু ঘুম যেন উবে গেছে চোখ থেকে। শীত করছে খুব, চাদর মুড়ি দিয়ে কুঁকড়েমুকড়ে সোফাতেই বসে আছে মন্দার। বসেই আছে।

সুব্রত নন্দীর অফিস থেকে প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছিল মন্দার। গোটা পৃথিবীটা ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল। বুকে কী অসহ্য চাপ তখন, মনে হচ্ছিল স্ট্রোকটোক না হয়ে যায়। সুরভিকে গিয়ে কি করে যে বলবে কথাগুলো।

সব শুনে প্রথমটা রাগে ফেটে পড়েছিল সুরভি,—বদমাইশি। স্রেফ লোকটার বদমাইশি। এই ক'দিনে একশো পঁচিশ টাকা বেড়ে যাবে স্কোয়্যার ফিটে?

—বলছে তো বেড়েছে।

—বলল, আর তুমি শুনে গেলে? বলতে পারলে না, এতদিন ধরে আমাদের টাকাটা তাহলে আটকে রেখেছে কেন? হাজার বার তো দেখা হয়েছে, তখন কেন বলেনি দাম বাড়িয়ে দেবে?

মন্দার হেরে যাওয়া মুখে বলেছিল,—ওসব কথা তুলে এখন কি আর কোনও লাভ আছে সুরভি? আমরাও তো ফেরত চাইনি টাকাটা। আমরাও তো লোভে লোভে ছিলাম।

—লোভ আবার কি? তার কথামতো টাকা দিয়েছি। দাম বাড়াবে জানলে আমরা অনেক আগেই টাকা তুলে নিতে পারতাম।

—যা হয়নি, তা হয়নি। আমরাও তো আশায় আশায় ছিলাম, এটা তো ঠিক?

—আমরা কী জানতাম, তোমার ওই সুব্রত পরে এরকম চিটিং করবে?

—এখন তো জানলে, এখনই বা আমরা কী করতে পারি? ঝগড়া? মারামারি? সে ক্ষমতাও কি আমাদের আছে? মন্দার অসহায় স্বরে বলেছিল,—বুঝছ না কেন, আমরা পারি না। আমরা কোন প্রতিবাদই করতে পারি না।

সুরভি হিসহিস করে উঠেছিল,—আমি লোকটাকে ছাড়ছি না।

—কী করবে?

—সুদে আসলে সব টাকা আদায় করব। বলব, দেড় বছরের ইন্টারেস্ট আগে গুনে দিন।

—ধরো যদি না দেয়? সুদ কেন আসলটাই যদি না দেয় তুমি কী করবে?

সুরভি পলকের জন্য থমকেছিল। পরমুহূর্তে আরও জোরে বিস্ফোরিত হয়েছে,—বললেই হলো দেবে না? আমাদের কাছে রিসিট আছে। রীতিমতো রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করা রসিদ।

—তো? যদি না দেয় তুমি কী করতে পারো? মামলা করবে? করো গিয়ে। বছর দশেক কোর্টে ঘুরে মরো। তদ্দিনে দেখবে চন্দন পার্কের পাশের তিনতলাটা বুড়ো হয়ে গেছে।

—তার মানে কোনও প্রতিকার নেই?

—কী আছে বলো? তুমিই বলো?

—আমি চিৎকার করে করে পাড়ায় বলব, সুব্রত একটা ফেরেববাজ, সুব্রত একটা শয়তান। ওর হাসি-হাসি মুখের মুখোশ আমি খুলে দেব।

—তাতে সুব্রতর কাঁচকলা। বেশি উত্যক্ত বোধ করলে কোনও দিন এসে ঘাড় ধরে আমাদের পাড়া থেকে বের করে দেবে। তোমার অবিনাশ হালদারও তখন ক্যানেস্তারা পেটাবে। এবং এও শুনে রাখো, পুলিশও তোমায় রক্ষা করতে আসবে না।

—কেন?

—কেন আবার কী। পুলিশ জনগণের ভৃত্য, আর সুব্রত জনগণের সেবক। সেবক আর ভৃত্য তো ভাই ভাই।....ভুলে যেও না, সুব্রতর পার্টি সোর্সও আছে।

এরপরই সম্পূর্ণ ঝিম মেরে গিয়েছিল সুরভি। যেন হঠাৎই কেউ তার বাক্‌রোধ করে দিল। গলা টিপে ধরল।

সন্ধেবেলার ব্যথাটা আবার ফিরে আসছিল মন্দারের বুকে। এর চরম অসহায়তার অনুভূতি যেন অবশ করে দিচ্ছে তাকে। সুস্থভাবে কিছু ভাবতে পারছে না, ভার হয়ে আছে মাথাটা। টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে, হাত বাড়িয়ে তুলতেও ইচ্ছে করছে না। কী কীটের জীবন! উঁহু, কীটও নয়। পোকামাকড়ও তো মনের মত আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে, মন্দারের সেই সামর্থ্যও নেই।

সুব্রতর ওপরেও এই মুহূর্তে আর তত রাগ হচ্ছিল না মন্দারের। সে যেমন একটা বাসস্থানের জন্য মরিয়া, সুব্রত-নন্দীও তেমনই টাকার জন্যে। দুজনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বন্দ্ব বাধলে যে বেশি শক্তিশালী সেই তো জিতবে। এটাই তো নিয়ম। সুব্রত ব্যবসা করে খায়, মন্দারদের ওপর দয়া দেখালে তার চলবে কেন? এই একটি ব্যাপার ছাড়া সুব্রত তো এমনি মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। সদালাপী, অমায়িক, পাড়াপড়শির অল্পস্বল্প উপকার করে বলেও শুনেছে মন্দার, বছরে দু'বার করে পাড়ায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করে সুব্রত। শুধু তার সঙ্গে পটলো না বলেই সুব্রত মন্দ হয়ে গেল? হয়তো কারুর কারুর কাছে এই সুব্রতই ভাল লোক! এই যুগের বিচারে কর্মবীর!

মন্দার কি একটু বেশি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যাচ্ছে? দার্শনিক? নাকি এমন করে ভাবতে পারলে কষ্টটা একটু কমে?

সুরভি বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালিয়েছে ঘরের। বাথরুমে গেল। বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে রাখা জগ থেকে জল খেল একটু। গায়ে শাল নেই, আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বলল,—শোবে না?

সুরভির স্বর শান্ত। শীতল।

মন্দার মৃদু ভাবে বলল,—যাই।

সুরভি ধীর পায়ে কাছে এল। বসেছে পাশে। বলল,—কি ভাবছ?

—আর কী ভাবব। ভেবে তো কুল পাওয়া যাবে না।

—কী করবে এখন? এ বাড়িতেই থাকবে?

—না। আর একটা বাড়ি দেখে উঠে যাব।

—তারপর?

—সেখান থেকে দিন ফুরোলে আবার একটা বাড়ি।

—তারপর?

—আবার আর একটা। এভাবেই ঘুরে ঘুরে কেটে যাক না।

—কাল থেকে তাহলে বাড়ি দ্যাখো। সুরভির স্বর যেন সামান্য দুলে গেল,—এবার কিন্তু আমার দুটো ক্লিয়ার বেডরুম চাই। এই অঞ্চলেই। অন্তত যদ্দিন না ঝিমলির স্কুলটা শেষ হচ্ছে।

—ভাড়া কত পড়বে জানো?

—কত? আড়াই হাজার? তিন হাজার? সাড়ে তিন? আজ থেকে আর একটা পয়সাও জমাব না। সর্বস্ব ভাড়ায় ঢেলে দেব।

মন্দার চমকে তাকাল। দেখছিল সুরভিকে। সুরভির দু'গালে শুকনো জলের রেখা।

মন্দারের কান্না পাচ্ছিল।

এগারো

লোডশেডিং চলছে। বাস থেকে নেমে প্রথমটায় অন্যমনস্কভাবে পুরোন রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল মন্দার, সম্বিৎ ফিরতেই ঘুরে ফের বড় রাস্তায় এল। কালই তারা বাড়ি বদলেছে, এখনও নতুন বাড়ির পথ সড়গড় হয়নি।

এবারকার বাড়িটা একটু পিছন দিকে। বাসস্ট্যান্ড থেকে মিনিট তিনেক বেশি হাঁটতে হবে। হোক, ক'দিন পরেই অভ্যেস হয়ে যাবে।

ছায়া ছায়া নাগরিক অন্ধকার পেরিয়ে মন্দার পৌঁছে গেল নতুন ঠিকানায়। সুরভি আজও অফিস যায়নি, মা আর মেয়ে মিলে আজ সারাদিন ধরে গোছগাছ করবে সব।

এবার বাড়িটা বেশ ভালই পাওয়া গেছে। সুরভির তো খুবই পছন্দ। ঢুকেই একটা বড়সড় সাইজের হলঘর। ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেস। বাঁ পাশে দুখানা বিশাল বিশাল মাপের শোওয়ার ঘর। একটা পনেরো বাই তেরো, একটা পনেরো

দশ। হলের ডানদিক ধরে আধুনিক কেতার রান্নাঘর, বাথরুম, ছোট স্টোররুমও আছে পাশে। কাপড় মেলার অসুবিধে নেই, পিছনে ফালি মতন উঠোনও আছে। নিজস্ব। সবচেয়ে বড় কথা জলের জন্য আলাদা ট্যাংক, ইচ্ছেমতো নিজেরাই পাম্প চালিয়ে নিতে পারবে। একশো বার চালালেও অশান্তির আশঙ্কা নেই, মন্দারদের পাম্পের মিটারও আলাদা। বাড়িওয়ালা চেয়েছিল চার হাজার, সুরভি বলে কয়ে সাড়ে তিনে রাজি করিয়েছি। অ্যাডভান্সটাই কমানো যায়নি, ওটি পুরো চল্লিশ হাজার।

টাকাটা দিতে অবশ্য মন্দার-সুরভির খুব অসুবিধে হয়নি। সুব্রত নন্দী এক কথায় পঞ্চাশ হাজার ফেরত দিয়ে দিয়েছে, বাকিটা বলেছে এক মাস পরে দেবে। তা দিক, মন্দারদের এখন আর কিসের তাড়া! সুদ না জুটুক, আসল এত সহজে মিলে গেল, এই না কত!

বাড়ির কাছাকাছি এসে মন্দার দেখল, সুরভি আর ঝিমলি দরজা-জানলায় পরদা টাঙিয়ে ফেলেছে। পুরোন বাড়ির গেরুয়া বরন পরদা এখন দুলছে নতুন বাড়ির গায়ে।

মন্দার দরজায় টোকা দিল। প্রথমে একটু আস্তে। তারপর জোরে জোরে।

সুরভি দরজা খুলেছে। হাতে মিনি সাইজের লণ্ঠন। মুখ-চোখ বেশ খুশি খুশি। ঝলমল করছে।

স্মিত মুখে ঢুকল মন্দার। লঘু গলায় বলল,—গোছগাছ সব কমপ্লিট?

—না তো কি তোমার মতো অকম্মার ঢেঁকির জন্য কাজ ফেলে রাখব? আর আমি ছুটি নষ্ট করছি না।

—ঝিমলি কোথায়?

—এই তো পুরোন পাড়ার দিকে গেল একটু। কোন বন্ধুর সঙ্গে নাকি দেখা করবে।

—দোতলা তিনতলার সঙ্গে আলাপ হলো?

—দোতলার ভদ্রমহিলা এসেছিলেন।.....জানো তো, ওঁরা প্রায় ছ'বছর আছেন। ওঁদের ভাড়াটা আমাদের থেকে কম। আড়াই হাজার।

—আগে এসেছে বলেই কম। এটা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমাদের চেয়েও বেশি দিতে হবে।

—তিনতলাতেও শুনলাম বেশ কম ভাড়া।

—বাহ্, সব খবর নেওয়া হয়ে গেছে!

সুরভি হেসে বলল,—এরকম তো আগে কখনও থাকিনি। মাথার ওপর বাড়িওলা নেই, দোতলা তিনতলা সবই ভাড়াটে.....

—অত নিশ্চিন্ত থেকো না। মন্দার একটা টুসকি দিল সুরভির গালে,—তোমার এবারকার বাড়িওলাটি অনেক বেশি শাহেন্‌শা মাল, ভবানীপুর থেকে স্যাটেলাইটে নজর রাখবে।

বলেই মন্দার টুক করে ঢুকে গেছে বাথরুমে। জামাকাপড় বদলাল। বেসিনে জল আছে, শাওয়ারেও। স্নান করার প্রশ্নই নেই, এখনও যথেষ্ট শীত আছে। তবে একটুক্ষণ বেসিনের কলটা চালিয়ে রাখল মন্দার। এও যেন এক ধরনের পরিতৃপ্তি।

বেরিয়ে একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। সুরভি ডাইনিং টেবিলে চায়ের কাপ-প্লেট এনে রেখেছে। বাহারী টিপট্‌টা বের করেছে শো-কেস থেকে, তাতে চা ঢেলে কায়দা করে অপেক্ষা করছে মন্দারের জন্য।

মন্দার চেয়ার টেনে বসল। জিজ্ঞেস করল,—হঠাৎ এটা বেরোল যে?

—ইচ্ছে। ফালতু জমিয়ে রাখবই বা কেন!

—সুবলার মাকে মাজতে দিও না, দু'দিনই তাহলে অক্কা পাবে।

সুরভি ঠোঁট টিপে হাসল। একটু চুপ থেকে বলল,—জানো, আজ আবার একজন এসেছিল।

—কে?

—বলো তো কে?

—তোমার মাসতুতো ভাই?

—উঁহু।

—তোমার সেই দাঁতউঁচু বন্ধুটা?

—আজ্ঞে না স্যার। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার অবিনাশ হালদার আর অবিনাশগিন্নি।

—যাহ্‌।

—হ্যাঁ গো, এই তো বিকেলবেলা হঠাৎ হাজির। আমি তো দরজা খুলে হাঁ।

—কী করতে এসেছিল? দেখতে?

—আর কি। অবিনাশগিন্নির যা বেড়ালের মতো কৌতূহল। ঘুরে ঘুরে খুঁত খুঁজছিল বাড়িটার। পায়নি। সুরভি চায়ে চুমুক দিল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—আর একটা জব্বর খবর দিল অবিনাশবাবু।

—কী?

—বলছিল, আমরা নাকি ফ্ল্যাটের টাকাটা তুলে নিয়ে ভালই করেছি। সুব্রত নন্দী নাকি ওই পুরোন বাড়িটা এখন ভাঙতে পারছে না। আগের এগ্রিমেন্ট নাকি

মানছে না বুড়ি আর বুড়ির ভাইঝি। তারা সুব্রতর কাছ থেকে আরও বেশি টাকা চায়।

—তাই নাকি? অবিনাশ হালদার জানল কোথ্থেকে?

—পাড়ায় শুনেছে বোধহয়।

মন্দার বিজ্ঞের মতো হাসল,—একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

—যা বলেছ। আমাদের সুদটা বুড়িই উশুল করুক। হি হি।

মন্দারও হাসছে। হাসছে সুরভিও। একে অন্যের হাসিটুকু মেখে নিচ্ছে মুখে।

হঠাৎ সুরভি বলল,—জানো, আজ জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার একগাদা কাগজ বেরোল।

—তোমার কাগজ? কী কাগজ?

—হাবিজাবি। ওইসব আমি যা আঁকতাম আর কি।

—ও। তোমার সেই ফ্ল্যাটের নক্শা!

—উঁহু। বলো পাগলামি। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছি। সুরভি একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল,—যাই বলো, এই বাড়িটা কিন্তু এই ফ্ল্যাটের থেকে অনেক ভাল হয়েছে। কত বেশি ফ্লোর-এরিয়া, বড় বড় ঘর, কতটা ওপেন স্পেস... ওই ফ্ল্যাট কিনলেও আমাদের ওখানে ধরত না।

লণ্ঠন রাখা আছে জানালায়। মৃদু আলোতেও মন্দার স্পষ্ট দেখতে পেল সুরভির চোখ চিকচিক করছে। কেন করছে? মন্দার ঠিক বুঝতে পারল না। মানুষের চোখ কখন চিকচিক করে? আশায়? না হতাশায়? দুঃখে? না সুখে?

মন্দারের বলতে ইচ্ছে করল, আমাদের কি আদৌ কোথাও ধরে সুরভি?

মন্দারের গলায় স্বর ফুটল না। আধো আঁধারে নতুন রঙ করা দেওয়ালের গায়ে নিজের ছায়া দেখছিল মন্দার। সুরভিরও।

কাঁপছিল ছায়া দুটো। কাঁপছে।

———

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম মামার বাড়ি ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬ (১০ জানুয়ারি ১৯৫০)।

পিত্রালয় ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। এখন তিনি দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা। কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু। আবার কলেজে পড়তে পড়তেই চাকরিজীবনে প্রবেশ। বহু ধরনের বিচিত্র চাকরির পর এখন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক।

সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন ছোটবেলা থেকেই। তবে লেখালেখি শুরু করেছেন সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে। নারীদের একজন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের কথা, যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির আলেখ্যই লিখতে ভালবাসেন। তাঁর লেখাতে বারবারই ঘুরে ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের দিক, নানা জটিলতার ছবি। লেখিকা নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'দহন' উপন্যাসের জন্য কর্ণাটকের শাশ্বতী সংস্থা থেকে পেয়েছেন 'নন্‌জনাগুড়ু থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার ১৯৯৬'; অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে আছে 'কথা পুরস্কার ১৯৯৭' এবং 'ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ১৯৯৭'।

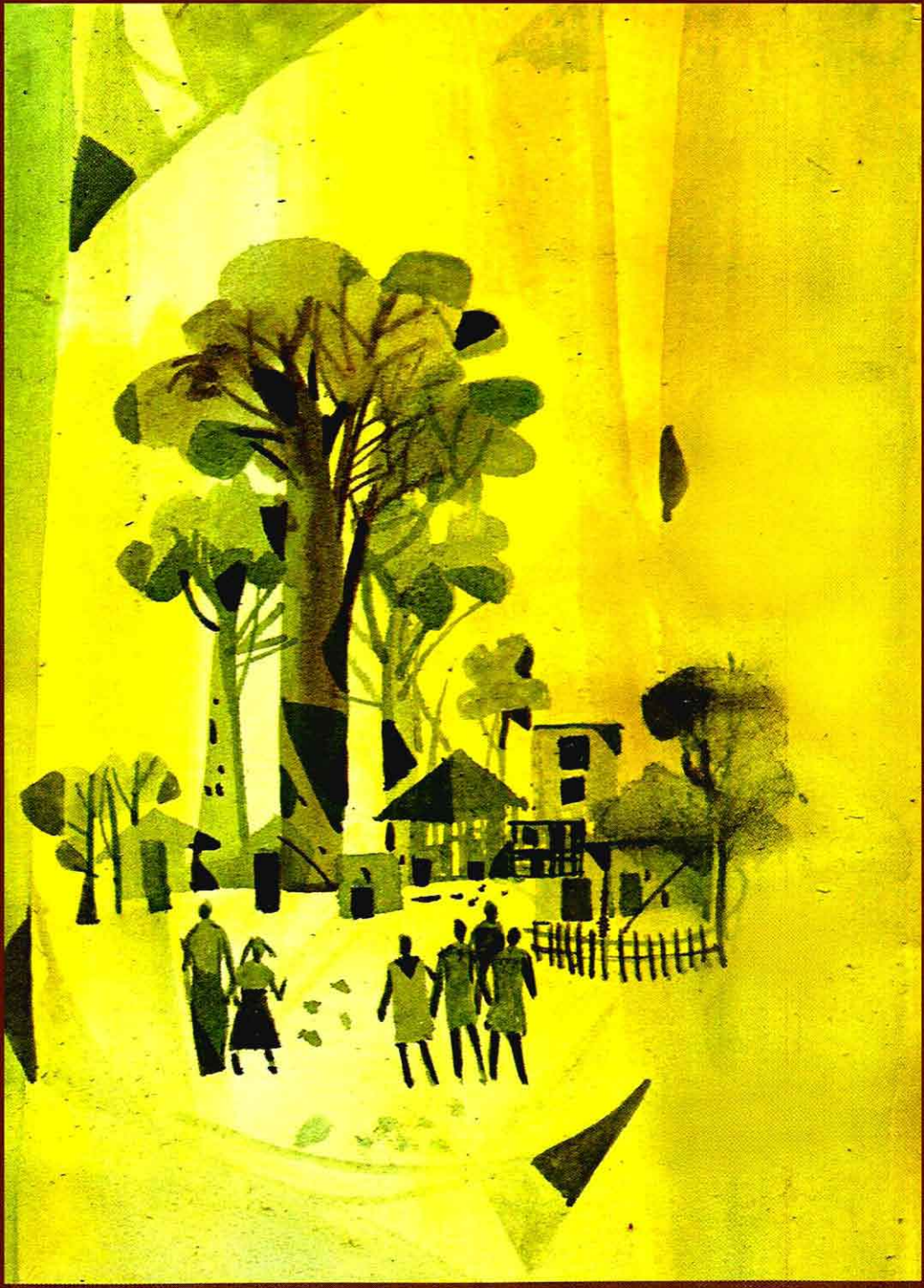

দীপ প্রকাশন